মহাপুরুষ শিবানন্দ

স্বামী অপূর্বানন্দ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সাড়ে তিন টাকা

মহাপুরুষ শিবানন্দ

স্বামী অপূর্বানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
বাগবাজার, কলিকাতা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সাড়ে তিন টাকা

নিবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ—মহাপুরুষ মহারাজ আজ প্রায় ষোল বৎসর স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দীপনাময় কথোপকথন ও পত্রাবলীর কিছু কিছু সংকলিত হইয়া কয়েকখানি গ্রন্থে প্রকাশিত হইলেও এই লোকোত্তর মহাপুরুষের একখানি ধারাবাহিক জীবনীর অভাব বহুদিন হইতেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান পুস্তক এই অভাব পূরণ করিবারই আংশিক প্রচেষ্টা মাত্র।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এমন বহু সাধু ও ভক্তের স্মৃতিকথা হইতে এই গ্রন্থের আংশিক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বহু পত্র এবং কথাপ্রসঙ্গের উপর আমরা অনেক ক্ষেত্রে নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্ভর করিতে পারিয়াছি। 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত মহাপুরুষ মহারাজ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি হইতেও আমরা কম সাহায্য পাই নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সম্বন্ধে প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তক হইতেও কোন কোন বিবরণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই পুস্তকপ্রণয়নে অনেকের নিকট নানাভাবে সহায়তা পাইয়াছি; তাঁহাদের সকলকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। মহাপুরুষ মহারাজের অদ্ভুত জ্ঞান-বৈরাগ্যদীপ্ত তপস্যা ও কর্মময় উদার প্রেমোজ্জ্বল জীবনের কথঞ্চিৎ পরিচয়-লাভে তত্ত্বান্বেষী

পাঠক-পাঠিকা পরিতৃপ্তি লাভ করিলেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব।

বইখানির সমগ্র আয় বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবায় উৎসর্গীকৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি
১৩৫৬

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বরাহনগর মঠ

১৮৮৭

প্রস্তাবনা

দক্ষিণেশ্বরের হর্ম্যশীর্ষ হইতে ভাবোন্মাদ পূজারী ব্রাহ্মণ ব্যাকুল আবেগে ডাকিতেছিলেন—ওরে তোরা আয়, কে কোথায় আছিস্, আয়। যুগযুগান্তরের ডাক! বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন পরিবেশে কতবার এইরূপ আহ্বান শোনা গিয়াছে—সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে বানর, ঋক্ষ, চণ্ডাল; গোপ-গোপিনী, রাজপুত্র-রাজকন্যারা; মুণ্ডিতকেশ শ্রমণের দল; আবার নিঃস্ব জেলেমালা; দুর্ধর্ষ মরুবাসিবৃন্দ; তৃণাদপি সুনীচ হরিনামসম্বল অনাড়ম্বর বৈষ্ণবগণ। যিনি ডাকেন, সেই মূল-গায়েনের সহিত যাহারা সাড়া দিয়া আসে, সঙ্গে নাচে গায়, ইতিহাস তাহাদেরও চিনিয়া রাখে, কেননা নাটকের সুপরিসমাপ্তির জন্য এই সঙ্গী নটদের অবদান সামান্য নয়।

এবারকার ডাক শুনিয়া যাহাদের আসিবার কথা তাহারা আশে-পাশেই ছিল। কেহ রাজপথে খেলিয়া বেড়াইতেছিল, কেহ অভিজাত ধনিগৃহের স্বাচ্ছন্দ্যছায়ায় সুযত্নে বর্ধিত হইতেছিল, কেহ বা সর্বহারা বালকভৃত্য সাজিয়া গৃহকর্ত্রীর রন্ধনশালায় কার্যে রত ছিল; আবার কেহ কেহ বা কৈশোরের বিদ্যাভ্যাস, ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতিতে মাতিয়া কালের অপেক্ষা করিতেছিল। একজন আম-জাম-তাল-নারিকেল-খর্জুরবৃক্ষ-পরিশোভিত পল্লীছায়ায় উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া অলস মধ্যাহ্ন কাটাইতেছিল।

যথাসময়ে কিছু আগে-পিছে ইহাদের সকলের কাণে ডাক পৌঁছিল।

প্রাণে গিয়া বাজিতেই ত্রস্তপদে একে একে আসিয়া জড় হইল প্রধান নটুয়ার পাশে নাচগানের মহড়ায়। কেহ আনিল মৃদঙ্গ, কেহ করতাল; কাহাদের হাতে ছিল খঞ্জনী, একতারা, বাঁশী; কাহাদের বা পায়ে নূপুর, গলায় বনমালা; কেহ বা ডমরু বাজাইয়া আসিল; কাহারা বা বহিয়া আনিল করঙ্ক, কন্থা। বাউলের দলের সাজসরঞ্জাম যাহার যাহা ছিল লইয়া আসিল।

পল্লীছায়াবাসী সেই আনমনা গায়ক কি উপকরণ লইয়া নটগুরুর দরজায় উপস্থিত হইয়াছিল? শুধু নির্বাক মুগ্ধতা, হৃদয়াবরুদ্ধ উদ্বেল অশ্রুরাশি? মাত্র মিলনের নিরাকাঙ্ক্ষ পরিতৃপ্তি—মাতৃক্রোড়ে শিশুর নির্বিচার সহজ আত্মসমর্পণ? তাহার পর সুদীর্ঘ চুয়ান্ন বৎসর বহু হাটে, বহু বাটে, প্রথমে সাথীদের সঙ্গে, পরে একা একা কত নাচিতে হইল, কত গাহিতে হইল—মাতিয়া মাতাইতে হইল। ভাল হইল কি মন্দ হইল সে সন্ধান উদাসী কথনও লয় নাই, ভাবে নাই। উহা তো তাহার কাজ নয়। সে জানিত, তাহার কাজ তো কেবল অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা, শুধু কাঁদিয়া হৃদয়কে লঘু করা, পাওয়ার স্মৃতিটুকুকে জাগাইয়া রাখা, যন্ত্রীর ইচ্ছায় হাত-পা চালাইয়া যাওয়া।

যাহারা দেখিয়াছিল তাহাদের কিন্তু বিস্ময়ের অবধি ছিল না। ভাবিত, এমনটি কে শিখাইয়াছিল! জাঁকজমকহীন আত্মবিস্মৃত অভিনয় যে এত সুন্দর, এত হৃদয়স্পর্শী হয় তাহা তাহারা চোখে না দেখিলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিত না। অমোঘ আহ্বান, সার্থক সম্মিলন, দুর্নিবার অভিব্যক্তি, আশ্চর্য পরিসমাপ্তি। ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, ধন্য তাঁহার পরিমণ্ডলীস্থিত এই উদাসী আত্মভোলা নট তারকনাথ—শিবানন্দ—মহাপুরুষ মহারাজ!

প্রস্তাবনা

লীলাসঙ্গিগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাযোগসূত্রে সংগ্রথিত হইয়া এক; অথচ নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, লাটু, শরৎ, শশী প্রভৃতি প্রত্যেকেরই একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল—প্রত্যেকেই এক এক দিক দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের যুগব্রত-সংসাধনে বিপুল সহায়তা করিয়া গিয়াছেন; প্রত্যেকেরই অবদান ছিল অপরিহার্য। মহাপুরুষ মহারাজের জীবনেও এইরূপ স্বাতন্ত্র্য ছিল যেখানে তিনি অপরদের হইতে আলাদা—তাঁহার আশী বৎসরের সুদীর্ঘ জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্মমহাসঙ্ঘে অসামান্য প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে—যাহাকে আমরা সহজেই পৃথক করিয়া ধরিতে ও বুঝিতে পারি। তুলনার কোন কথা উঠে না। ঠাকুর যে তুলনা করিয়াছিলেন—জ্যোতির দৃষ্টান্তে, জলাশয় বা পুষ্পের দৃষ্টান্তে অন্তরঙ্গ ভক্তদের শক্তিনির্বচন করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ ছিল বোধ করি সম্পূর্ণ আলাদা; সে তুলনা আমাদের জন্য নয়, তিনিই করিতে পারিতেন—করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ দেখিতে অক্ষম, দুর্বল, অবিশ্বাসীদের মনে সাহস-বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য—যাহারা যুগচক্র চালাইবে তাহাদের হৃদয়ে উৎসাহ জাগাইবার জন্য—তখনকার কুহেলিকাচ্ছন্ন অস্পষ্ট ইঙ্গিত উত্তরকালে দিবালোকোদ্ভাসিত সুস্পষ্ট ঘটনার সহিত মিলাইয়া পরবর্তীরা তাঁহার অদ্ভুত যোগদৃষ্টিকে যথাযথ মর্যাদা দান করিতে পারিবে—সেইজন্য।

আজ আমাদের কাছে সকল জীবনগুলিই চোখ-ঝলসাইয়া-দেওয়া আলোক, অমৃত-বারির উৎস; বর্ণে, গন্ধে, সৌষ্ঠবে অনুপমমাধুরীযুক্ত নন্দনকুসুম। তুলনায় কাজ নাই—প্রয়োজনও নাই। একপাত্র সুরা-পানেই আমরা জ্ঞানহারা—পূর্ণকুম্ভের পরিমাপে কি সার্থকতা?

মহাপুরুষ মহারাজের আশী বৎসরের জীবনবর্ত্ম আমরা তাই অতি সহজ ভাবেই অনুসরণ করিব। সমালোচকের বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী

আমাদের নয়— দার্শনিক বিচারে ঘটনার অতিলৌকিক তত্ত্ব-নিরূপণও আমাদের লক্ষ্য হইবে না। আমরা শুধু দেখিয়া যাইব—শুনিয়া যাইব। চুপি চুপি দাঁড়াইয়া থাকিব সেই তাল-নারিকেল-আম-জাম-পনস-বীথির ছায়ায়, যেখানে তিনি তাঁহার মধুর শৈশব, অনাড়ম্বর কৈশোর সঙ্গোপনে কাটাইতেছিলেন—তাঁহারই সাথে সাথে তাঁহার তরুণ প্রাণের প্রচণ্ড সাংসারিক আঘাতগুলি সহিয়া বৈরাগ্যের প্রথম অরুণোদয় লক্ষ্য করিব—বাহির হইব গৃহ ছাড়িয়া দূর পশ্চিমে, জনপদে জনপদে, স্তব্ধ নিশীথে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে বসিয়া শুনিতে চেষ্টা করিব দূরদূরান্তর হইতে কে ডাকে—উড়িয়া উড়িয়া ক্লান্ত বিহঙ্গের সহিত আমরাও ফিরিয়া আসিব নীড়াভিমুখে। তাহার পর সেই চিরপ্রতীক্ষিত ভাস্বর মিলন-সন্ধ্যা। তাঁহার সাথে সাথে আমরাও অনুভব করিব উদগ্র আলোড়ন গভীরতম প্রাণে—আমাদের সমগ্র সত্তায়—সকল চেতনায়। চলিবে দক্ষিণেশ্বরের শিক্ষা-দীক্ষা, আনন্দ-কল্লোল—কাশীপুরের গুরুসেবা, ধ্যান, তপস্যা। আসিবে দুঃখের দিন—কুলিশগর্জন-প্রকম্পিত, তিমিরাচ্ছন্ন, কৃষ্ণা বিরহ-রাত্রি। শ্রাবণধারা-প্লাবিত সেই ঘোর যামিনীতে রোরুদ্যমান বিরহীর গলার সঙ্গে মিলাইয়া আমরাও গাহিব—

'হরি গেল মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল সখি, মালতীমালা॥'

অনন্তর তাঁহাকে অনুসরণ করিব বিশাল ভারতভূমির তীর্থে তীর্থে অগণ্য পথে—পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—লোকালয়ে, আবার বিজন অরণ্যে, দুর্গম গিরি-গহ্বরে, উত্তুঙ্গ পর্বত-শিখরে। অনেক সময়েই তাঁহার পদচিহ্ন আমরা খুঁজিয়া পাইব না—আমাদের দৃষ্টি হইতে তিনি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া যাইবেন। তপস্যা—তপস্যা—তপস্যা।

প্রস্তাবনা

সে কৃচ্ছ্রতা, সে তিতিক্ষা, সে অনুরাগ, সে আত্ম-সমাধান ভাষাহীন স্তব্ধ বিস্ময়ে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যাইতে হইবে। তাহার পর আমরা তাঁহাকে পাইব নায়ক বিবেকানন্দের পাশে—অপর গুরুভ্রাতাদের সহিত তৎপ্রবর্তিত মিশনের অন্যতম সহায়করূপে। কর্মী শিবানন্দকে নানা পরিবেশে দেখিবার আমাদের সুযোগ মিলিবে—তাঁহার চরিত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ন্যায় তাঁহার কর্মধারার স্বাতন্ত্র্যও সহজেই আমরা অনুভব করিতে পারিব। বিহ্বল বিরহের সুর কিন্তু বিরামহীন বাজিয়াই চলিয়াছে। উহা অহরহ জাগাইয়া রাখিয়াছে নিত্যবৃন্দাবনের স্বর্ণস্মৃতি। উহাই যেন শিবানন্দ-জীবনের সুস্থির পটভূমিকা। তাই যখন তিনি কর্মী, পরিচালক, সংগঠক—যখন তিনি নেতা, উপদেষ্টা, সঙ্ঘগুরু, তখনও তিনি সেই কান্তমিলনপিয়াসী রোরুদ্যমান যুবাটিই। কোথা প্রিয়, কোথা প্রিয়! পাইবার শেষ নাই, খুঁজিবারও শেষ নাই।

এই নিকট ও সুদূরের বিচিত্র সংমিশ্রণে তাঁহার শেষের জীবনকে আমরা দেখিতে পাইব অপূর্ব সৌন্দর্যে ভরপুর। প্রকাশ অথচ গোপন —সহজ অথচ গম্ভীর—মানব তথাপি অমানব। সহস্র সহস্র নর-নারীর সহিত আমরা গিয়া দাঁড়াইব দেখিতে শেষ অঙ্কের সেই অদ্ভুত রূপায়ণ। মণি হইয়াছে স্পর্শমণি, এক হৃদয় অনন্ত হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পার্থিব দেহে ভাগবত বিভূতি আসিয়া সঙ্গত হইয়াছে, এক প্রেম সমস্ত বিশ্বকে যেন ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

যবনিকা পড়িবে। শিথিল হস্তে আমরা ধীরে ধীরে নয়নের কোণ হইতে একবিন্দু অশ্রু মুছিয়া ফেলিব। রহিবে শুধু স্মৃতি—অমর, চিরন্তন স্মৃতি।

গৃহে

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ যে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন উঁহার পূর্ব বাসস্থান ছিল হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামে। ভূকৈলাসের প্রসিদ্ধ ঘোষাল রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত ইঁহাদেরও উপাধি ছিল ঘোষাল। প্রপিতামহ নিধিরাম ঘোষাল পর্যন্ত এই পরিবারের জীবন-ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে বলাগড়েই চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু নিধিরামের পুত্রদ্বয় রামকুমার ও রামকমল সম্ভবতঃ জীবিকার সৌকর্যের জন্যই প্রথমতঃ নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার মানপুরে উঠিয়া আসেন—পরে নিজেদের ধর্মপ্রাণতা, প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে কৃষ্ণনগরের রাজার দানস্বরূপ প্রায় ৫০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ২৪ পরগনার বারাসতের নিকট বড়া গ্রামে স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

রামকুমারের দুই পুত্র—মদনমোহন ও রামকানাই। রামকানাই মোক্তারী পড়িয়া বারাসতে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই উহাতে তিনি প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাংলা ও ফারসী ভাষায় রামকানাইর প্রখর ব্যুৎপত্তি ছিল; তিনি ইংরেজী জানিতেন না। কিছুকাল পরে তিনি স্বনামধন্যা রাণী রাসমণির মোক্তার নিযুক্ত হন; এই সূত্রেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাতায়াত ছিল বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে যশোহরগামী সদর রাস্তার উপর বারাসতে রাণীর

একটি ছোট কাছারী বাড়ী ছিল; রাণীর কাজে নিযুক্ত হইবার পর হইতে ঘোষাল মহাশয় ঐ বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন।

প্রথমা পত্নী নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গগতা হইলে রামকানাই নিমতাগ্রাম-নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা বামাসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার গর্ভে যথাসময়ে তাঁহার একটি কন্যা হইয়াছিল। ইষ্টদেবী ৺কালিকাকে স্মরণ করিয়া কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন চণ্ডী।

গভীর ধর্মভাব ঘোষাল মহাশয়ের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বাড়ীতে পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করিয়াছিলেন এবং একান্ত ব্যাকুলতার সহিত ঐ সাধনপীঠে তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী নিয়মিত দেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। অমাবস্যা প্রভৃতি প্রশস্ত তিথিতে সুসমারোহের সহিত বিশেষ পূজাদির অনুষ্ঠান হইত। বহুলোক ঐ পূজার আনন্দে যোগদান করিত এবং পরিতোষপূর্বক প্রসাদ পাইত। কখনও কখনও কামাখ্যা, বিক্রমপুর ও অন্যান্য স্থান হইতে তান্ত্রিক সাধকগণ আসিয়া ঘোষাল মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার সাধনপীঠে পূজা, পাঠ ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াদিতে কিছুকাল কাটাইয়া যাইতেন। ঘোষাল মহাশয় তখন উপার্জনও যেমন করিতেন প্রচুর, সদ্ব্যয়ও তেমনি করিতেন মুক্তহস্তে। সাধুভক্ত-সেবা এবং গরীব-দুঃখীদিগকে অকাতরে সাহায্য করিতে কখনও তাঁহার কুণ্ঠা ছিল না। এতদ্ব্যতীত বারাসত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন সেক্রেটারী এবং উক্ত স্কুলের পঁচিশ-ত্রিশ জন দরিদ্র ছাত্রকে বাড়ীতে রাখিয়া ভরণপোষণ করিতেন।

নানা সদ্‌গুণের অধিকারী দেবীভক্ত রামকানাইর ধনজনপূর্ণ সংসারে কোন সুখেরই অভাব ছিল না। কিন্তু পুত্রসন্তান না হওয়ায়

একটী গভীর মর্মবেদনা দম্পতিকে অহরহ পীড়িত করিত। উহার জন্য তাঁহাদের ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। তাঁহারা বহু শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, ব্রত-মানত প্রভৃতি করিয়াছিলেন; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইয়াছিল। অবশেষে উভয়ে স্থির করিলেন, আশুসিদ্ধিদাতা জাগ্রত শিব তারকেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া দেখিবেন তিনি মনস্কামনা পূর্ণ করেন কি-না। ৺বাবাকে স্মরণপূর্বক উভয়ে বৎসরাধিক কাল একান্ত ব্যাকুলতার সহিত পুরশ্চরণ, উপবাস ও প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন। এক রাত্রিতে বামাসুন্দরী স্বপ্নে দেখিলেন, তারকেশ্বর মহাদেব প্রসন্ন মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন—"তোমাদের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়াছি; আমার আশীর্বাদে তুমি সুপুত্রের জননী হইবে।"

দেবস্বপ্ন শীঘ্রই সফল হইল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ঘোষাল-ভবনকে আনন্দমুখরিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইল অতি কমনীয়কান্তি একটি শিশু—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী অন্যতম পার্ষদ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ। তারকেশ্বরের কৃপায় জন্ম বলিয়া পিতামাতা শিশুর নাম রাখিলেন তারকনাথ—আদরের ডাক নাম হইল ফুমু। ঘোষাল মহাশয় খ্যাতনামা জ্যোতিষীদের দ্বারা নবজাতকের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কোষ্ঠীর[১] ফল—বালক ২৫।২৬ বৎসর বয়সে সংসারত্যাগ করিবে; যদি একান্তই সংসারে থাকে তো রাজসম্মানের অধিকারী হইবে।

---

১ এই কোষ্ঠীখানি মহাপুরুষ মহারাজ নিজেই গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়াছিলেন। যথাস্থলে আমরা ঐ ঘটনার উল্লেখ করিব। কোষ্ঠীখানি নষ্ট হওয়াতে মহাপুরুষজীর জন্মসাল সঠিক নির্ণয় করিবার উপায় ছিল না। পূর্বোক্ত ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পরবর্তী কালে তাঁহার যে করকোষ্ঠী প্রস্তুত হইয়াছিল সেই কোষ্ঠীর গণনায় নিরূপিত।

হৃষ্টপুষ্ট প্রিয়দর্শন বালক তারকনাথ সকলেরই বিশেষ আকর্ষণ ও আদরের পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল বারাসত মিশনারী স্কুলে। তিনি ওখানে অল্পদিন পড়িয়া পরে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিলেন। তারকের ছেলেবেলার একটি মজার খেলা ছিল—টাকাকড়ি জলে ফেলিয়া দেওয়া। পিতার বাক্স হইতে টাকাপয়সা লইয়া জলাশয়ে ছুঁড়িয়া দিতেন এবং আনন্দে হাততালি দিয়া নাচিতেন। একমাত্র পুত্রের কোনপ্রকার আবদারেই ঘোষাল মহাশয় বাধা দিতেন না। ছেলেবেলায় তারক জিলাপী খাইতে খুব ভালবাসিতেন। ঘোষাল মহাশয় ফরমাশ দিয়া তাঁহার জন্য থালার মত জিলাপী করাইয়া আনিতেন। জীবজন্তুদের মধ্যে কুকুর ছিল বালকের খুব প্রিয়। এই প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন—"ছেলেবেলা থেকেই কুকুর আমার চাই-ই। বাড়ীতে বড় বড় লোমওয়ালা একটা প্রকাণ্ড কুকুর ছিল। তাকে নিয়ে খেলা করতাম। রাত্রেও শোবার সময় তাকে নিয়ে শুতাম। তার গায়ের উপর দু পা তুলে দিয়ে না শুলে ঘুমই হত না।"

প্রতিবাসী খেলুড়েদিগের সঙ্গে বাল্যকালে তারকনাথ নানাপ্রকার খেলায় মত্ত থাকিতেন। গাজনের সন্ন্যাসীদিগকে পরাস্ত করা তাঁহার অন্যতম খেলা ছিল। গাজনের ছড়া এবং 'উতোর' (উত্তর) ও 'চাপান' (প্রশ্ন-সমাধানের ভারার্পণ) তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ও তাঁহার

মহাপুরুষজী একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমার জ্যেঠা মশাই একজন বড় জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি আমার কোষ্ঠীগণনা করে বাবাকে বলেছিলেন, 'দেখ কানাই, ফুলুটা হয়তো রাজা হবে, নইলে সন্ন্যাসী হবে।' তা ঠাকুরের কৃপায় সন্ন্যাসী হয়ে গেছি। বেঁচে গেছি—রাজা হতে হয় নি।"

সমবয়সীরা খাতায় প্রশ্ন লিখিয়া রাখিতেন এবং গাজনের সন্ন্যাসীরা আসিতেছে দেখিলেই তাঁহারা রাস্তায় গিয়া দাগ কাটিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। উত্তর না দিয়া গণ্ডী অতিক্রম করিতে নাই বলিয়া সন্ন্যাসীরা উত্তর দিতে অসমর্থ হইলে তারকনাথের বাড়ীর পিছনের পথের দিকে ফিরিত। তখন তারকনাথ তাড়াতাড়ি সেদিকে গিয়া সেখানেও দাগ কাটিতেন ও প্রশ্ন করিতেন। এইরূপে বিপন্ন হইয়া সন্ন্যাসীরা কাকুতি-মিনতি করিলে তিনি দাগ মুছিয়া ফেলিতেন ও সন্ন্যাসীরা মুক্ত হইত।

তারক মেধাবী ছিলেন; কিন্তু পড়াশুনায় তেমন মনোযোগ দিতেন না। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার ভিতর একটা আনমনা ভাব লক্ষিত হইত। ইহাই যে উত্তরকালে পরম ভাবুকতা ও বৈরাগ্যে পরিণত হইয়া তাঁহাকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বালকের গলা বেশ মিষ্ট ছিল। তিনি শুনিয়া শুনিয়া অনেক ভজনগান শিখিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে উচ্চ ভাবোদ্দীপক শ্যামাসঙ্গীতাদি শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত।

তারকনাথ পিতামাতাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন এবং ঐ শ্রদ্ধা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। [illegible] উন্নত চরিত্রের প্রভাব তাঁহার হৃদয়ে যে কতটা গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায় বৃদ্ধবয়সে তাঁহার একদিনকার কথাপ্রসঙ্গে—"গর্ভধারিণী মা, তাঁর নাম ছিল বামাসুন্দরী, খুবই ধর্ম্মপ্রাণা ও লক্ষ্মী ছিলেন। দেখতেও বেশ সুন্দরী ছিলেন। ছেলেবেলায় ধর্মভাব তাঁর কাছেই পেয়েছি। বাবাও ছিলেন খুব ধার্মিক ও গুণী। তাঁর আয়ও ছিল যথেষ্ট। পাঁচিশ-ত্রিশটি গরীব ছেলেকে বাবা নিজের বাড়ীতে রেখে খাওয়া-পরা দিতেন। বারাসত স্কুলে তারা সব পড়ত। আমিও তাদের সঙ্গেই থাকতাম।

মা নিজের হাতে সকলকে রান্না করে খাওয়াতেন। বাবা রাঁধবার জন্য বামুন রাখতে চাইলে মা রাখতে দিতেন না। তিনি বলতেন, ‘এ তো আমার মহাভাগ্য যে, এতগুলি ছেলেকে রান্না করে খাওয়াচ্ছি।’ আমি মার কাছে আদর-স্নেহ বড় একটা পাই নি। তিনি কাজকর্ম নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন—সেই পঁচিশ-ত্রিশটি ছেলের মধ্যে আমিও একজন। আমার জন্য আলাদা খাবার কিছু করতেন না—সকলের সঙ্গেই খেতাম। কেউ বলত, ‘ছেলেটিকে একটু আদরযত্ন করছে না।’ তাতে মা বলতেন, ‘তাঁর ছেলে, আমার নয়। তিনি দয়া করে দিয়েছেন, তিনিই ওকে দেখবেন।’ আমার বয়স যখন নয় বৎসর আন্দাজ তখন মা মারা যান। মার সম্বন্ধে বেশী কিছুই মনে নেই। মা-ই লক্ষ্মী ছিলেন। তিনি মারা যাবার সঙ্গেসঙ্গেই বাবার আয় কমে যেতে লাগল। তাঁর অনেক দান-ধ্যানাদি ছিল; কিন্তু আয় কমে যাওয়ায় আর আগের মত দানাদি করতে পারতেন না। আমি খুবই ভাগ্যবান যে, অমন বাপমায়ের ঘরে জন্মেছিলাম। বাবার ত্যাগ ছিল যথেষ্ট। অত টাকা রোজগার করেছিলেন, কিন্তু নিজের থাকবার জন্য একটি ভাল বাড়ীও করেন নি। সব টাকা গরীবদের সেবায় ব্যয় করে দিয়েছেন।

“বাবা খুব ভক্ত ছিলেন। রাত্রিতে ‘মা, এখনও কৃপা করলি না’ বলে ভেউ ভেউ করে কাঁদতেন। একবার তাঁর কাছে কামাখ্যা থেকে একজন সাধক ভট্টাচার্য মশাই এসেছিলেন। তাঁর কী চেহারা—বেঁটে লাল টুকটুকে! সারারাত দুজনে পূজাদি করতেন। একবার পূজার সময় ঘটস্থাপন করে তাতে ডাব-নারিকেল দেওয়া হয়েছিল। সেই ডাব থেকেই নাকি প্রকাণ্ড নারিকেলগাছ হয়ে গিয়েছিল, ছাদের সমান উঁচু।”

মহাপুরুষ শিবানন্দ

একটি তিন মাসের শিশু ভগ্নীকে রাখিয়া যখন তাঁহার স্নেহময়ী জননী পরলোক গমন করিলেন, তখন নবমবর্ষীয় বালক তারকনাথের কোমল প্রাণে কী দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মাতৃহীন বালকের হৃদয় মাতৃহীনা শিশু ভগ্নীর অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া সমবেদনায় খুবই ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন হইতে তিনি ঐ শিশু বোনটির রক্ষণাবেক্ষণে নিজেকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহাকে দেখাশুনা করা, গয়লাবাড়ী হইতে তাহার জন্য দুধ আনা এবং পাড়ার এক বাগ্দী মায়ের নিকট ভগ্নীটিকে লইয়া গিয়া বারংবার তাহার স্তন্যপান করান—তারকনাথের নিত্যকর্মে পরিণত হইল।

কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন এবং এখন হইতে বিমাতাই ঐ মাতৃহীনা ভগ্নীর পালনের ভার গ্রহণ করেন। তারকের বড়মামী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; সেজন্য ছুটির সময় তিনি তখন হইতে প্রায়ই মাতুলালয় নিমতাগ্রামে যাইতেন; আবার কখনও বা পৈত্রিক গ্রাম বড়াতে গিয়াও কিছুদিন কাটাইয়া আসিতেন। বড়া গ্রামটির প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অতি সুন্দর ছিল। চারিদিকে বিস্তৃত হরিৎ ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে কমল-কহ্লার-পরিপূর্ণ জলাশয় এবং আম্র নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষরাজির ফাঁকে ফাঁকে বাসগৃহ ও দেবালয় গ্রামটিকে মনোহর সৌন্দর্যে শোভিত করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবী মহাপুরুষের প্রাণের সুপ্ত দেবভাব-জাগরণের পক্ষে সম্যক্ অনুকূল আবহাওয়াই যেন ছিল বড়া গ্রামের এই অনাবিল সুষমাময়ী শান্ত প্রকৃতি। বালক তারকনাথ একান্তে দীঘির পারে বসিয়া থাকিতেন, আর অনন্ত আকাশের পানে তাকাইয়া আপনমনে গান গাহিয়া সময় কাটাইতেন।

বাংলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় বারাসতেও ম্যালেরিয়ার বিশেষ

প্রকোপ ছিল। তারকনাথের বয়স যখন চৌদ্দ-পনর বৎসর তখন তিনি একবার খুবই সাঙ্ঘাতিকভাবে ঐ জ্বরে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবনসম্বন্ধে একপ্রকার নিরাশ হইয়াছিলেন; কিন্তু দৈবকৃপায় তিনি ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিলেন। ঘোষাল মহাশয় তাঁহাকে বায়ুপরিবর্তনের জন্য এক আত্মীয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। তথায় প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল অবস্থানের ফলে তারকনাথ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং বারাসতে ফিরিয়া পুনরায় পড়াশুনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আনুমানিক ইহার বৎসরাধিক কালের মধ্যেই তাঁহার দিদি চণ্ডীদেবী দুইটী সন্তানের মাতা হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিতা হন এবং মধ্যমা ভগিনী ক্ষীরোদা দেবীও বালবিধবা হইয়া পিত্রালয়ে আগমন করেন। এই দুইটি পারিবারিক দুর্ঘটনা তারকনাথের কোমল প্রাণে খুবই ব্যথা দিয়াছিল। মহাপুরুষজী একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ক্ষীরোদাকে বিধবার বেশে দেখা আমার পক্ষে খুবই অসহ্য হয়ে উঠেছিল।" শৈশবে মাতৃবিয়োগ, পিতার পুনরায় দারপরিগ্রহ, লক্ষ্মীরূপিণী মাতৃদেবীর অন্তর্ধানের সঙ্গেসঙ্গেই সাংসারিক সচ্ছলতার দ্রুত অবনতি, স্নেহময়ী সহোদরাদ্বয়ের জীবনের শোচনীয় পরিণাম ইত্যাদি ঘটনাপরম্পরা তারকনাথের মানসপটে সংসারের বাস্তব স্বরূপ প্রতিবিম্বিত করিয়া তাঁহার প্রাণে সুপ্ত বৈরাগ্যকে তীব্রভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। এখন হইতে তাঁহার মন স্বতঃই প্রবৃত্ত হইল ভূমার সন্ধানে—হৃদয়-চাতক বুকফাটা আর্তনাদ আরম্ভ করিল অপার্থিব শান্তি-বারিপানের আকাঙ্ক্ষায়। তিনি নিভৃতে প্রাণের দেবতাকে হৃদয়ের বেদনা নীরবে জানাইতে লাগিলেন। সংসার-পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় বাধাহীন অসীমের মধ্যে বিচরণ করিবার

ইচ্ছা দিন দিন তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইতে লাগিল, অথচ সংসারের প্রতি কর্তব্যবোধও তাঁহাকে পীড়িত করিতে থাকিল। মন যখন এই প্রকার অন্তর্দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত তখন এন্ট্রান্স ক্লাশে পড়িতে পড়িতে একদিন তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং কিছুকাল তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া কাটাইলেন।

পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া রেলওয়েতে একটি চাকরি নিলেন, যাহাতে ছুটির সময় রেলওয়ের পাশ লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন। ঐ চাকরি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে কয়েক বৎসর পশ্চিমাঞ্চলে কাটাইতে হইয়াছিল—প্রথমটায় গাজীয়াবাদে, তাহার পরে মোগলসরাইয়ে। তাঁহার চাকরি-জীবনের এবং তৎকালীন মানসিক অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় একদিনকার কথাপ্রসঙ্গে—"ছেলেবেলা থেকেই সংসার ভাল লাগত না, প্রাণে ধর্মভাবও প্রবল ছিল; আর কখনও বিয়ে করে সংসারে বদ্ধ হব না এভাবও হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। দেশভ্রমণ করব, নানা তীর্থাদি দেখে বেড়াব—এই ইচ্ছাটাও বোধ হয় জন্মগত সংস্কার ছিল। রেলে চাকরি করতাম আর ভগবানকে ডাকতাম। তখন ব্রাহ্ম tendency টা (ঝোঁক) মনে প্রবল ছিল—ভগবানের নিরাকার ভাবই ভাল লাগত। জ্যোৎস্না রাতে বা অন্ধকার রাতে খুব নক্ষত্র জ্বলছে—সেদিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম—বিরাট স্তব্ধতার মধ্যে মিলিয়ে দিতাম নিজেকে। মনে হত এই যে মেঘ চলে যাচ্ছে—তার পেছনে নিশ্চয়ই সেই বিরাট পুরুষ আছেন। সেই দিকে তাকিয়ে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করতাম, 'প্রভু, তুমি আমার হৃদয়ে আনন্দরূপে প্রতিভাত হও।' এইভাবে প্রার্থনা করে খুব আনন্দ পেয়েছি। আমি যে একেবারে

গোঁড়া নিরাকারবাদী ছিলাম তা নয়। কালীমূর্তি বা অন্য সাকার ভাবের উপর কোনপ্রকার অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষবুদ্ধি আদৌ ছিল না; তবে আমি নিজে তাঁর নিরাকার বিরাট ভাবই বেশী পছন্দ করতাম। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি বাড়ীতে মা কালীর পূজায় যোগদান করতাম—প্রসাদাদিও শ্রদ্ধাসহকারে খেতাম; কিন্তু মনে হত, সেই বিরাট ভগবানের কি করে এতটুকু মূর্তির ভেতর বদ্ধ হয়ে থাকা সম্ভব? তিনি তো বিভু—তিনি তো বিরাট!”

গাজীয়াবাদে তিনি স্থানীয় এক উচ্চপদস্থ রেলকর্মচারীর সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাকিতেন এবং আপন ভাবে ধ্যান ও একতারা-সংযোগে ভজনগানে তন্ময় হইয়া যাইতেন। ঐ কর্মচারী হঠাৎ কঠিনরোগাক্রান্ত হইয়া মারা যান। নিকটস্থ নদীতীরে মৃতদেহের সংকারকার্যাদি-সমাপনান্তে তারকনাথ ফিরিয়া আসিয়া একতারা লইয়া গাহিতে লাগিলেন—

‘দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী;

সুখে দুঃখে সম বন্ধু এমন কে, শোক-তাপ-ভয়-হারী?’

—ইত্যাদি

গানটি গাহিতে গাহিতে তিনি একান্ত তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন হুঁশ হইল, দেখিলেন যে বাড়ী শূন্য—ঐ মৃত ভদ্রলোকের পরিবারবর্গ সকলেই ঐ বাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। উপরোক্ত ঘটনাটি তিনি একদিন গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন।

মোগলসরাইয়ে অবস্থানকালে ভগবদ্‌ধ্যানচিন্তনে তিনি আরও ডুবিয়া গিয়াছিলেন। অবসর পাইলেই তিনি নিকটস্থ বিস্তৃত মাঠে চলিয়া যাইতেন এবং অনেকক্ষণ নিভৃত চিন্তায় কাটাইয়া আসিতেন।

ঐ সময়ের স্বীয় মনোভাব সম্বন্ধে মহাপুরুষজী একদিন কথাপ্রসঙ্গে

বলিয়াছিলেন—"সেই সময় সমাধি জিনিষটা কি তা নিয়ে মনে খুব আন্দোলন হত। সমগ্র জগৎসংসার ভুলে কি করলে সমাধির আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকা যায়—এই আকাঙ্ক্ষার আগুন প্রাণে সর্বক্ষণ জ্বলত। শিবের ধ্যানমূর্তি, বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্তি—এসব খুব ভাল লাগত। মোট কথা, সমাধিলাভ করবার জন্য প্রাণ খুব ছট্‌ফট্ করত এবং যাতে সমাধিলাভ করতে পারি তার জন্য খুবই চেষ্টা করতাম। মাসের পর মাস গিয়েছে, রাত্রে ভাল ঘুম হত না, সর্বক্ষণ ঐ এক চিন্তা—কি করলে সমাধিলাভ হয়।"

মোগলসরাইয়ে তাঁর একজন সঙ্গী ছিলেন প্রসন্ন বাবু। তাঁহার হৃদয়েও ধর্মভাব খুব প্রবল ছিল। দুই জনে একই ঘরে থাকিতেন এবং ধর্মালোচনা ও সাধন-ভজন করিতেন। তারকনাথ ভাবের সহিত ব্রহ্ম-সঙ্গীতাদি গাহিতেন। তখন এই গানটি তাঁহার খুবই প্রিয় ছিল—

'প্রেমপিঞ্জরে রাখ হে নাথ, বন্দী করে চিরদিন।
পোষা পাখী হয়ে থাকি, আর ডাকি তোমায় অনুক্ষণ।'

—ইত্যাদি

প্রসন্ন বাবুর সহিত সমাধি সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথাবার্তা হইত। একদিন কথায় কথায় প্রসন্ন বাবু বলিয়াছিলেন যে, কলিকালে সমাধি কাহারও বড় একটা হয় না—সমাধিলাভ করা অসম্ভব ব্যাপার। একমাত্র লোক আছেন দক্ষিণেশ্বরে—পরমহংসদেব, যাঁহার ঠিক ঠিক সমাধি হয়। প্রসন্ন বাবুর নিকট পরমহংসদেবের নাম শোনা অবধি তারকনাথের মন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল প্রায় আড়াই বৎসর পরে, যখন তিনি কলিকাতায় আসেন।

এই সময়ে তারকনাথকে একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সংসারে একান্ত বীতস্পৃহ তাঁহার প্রাণ যখন অবিরাম ব্রহ্মনামগানে মত্ত—সমগ্র হৃদয়মন ব্রহ্মের নিরাকার ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া থাকিবার জন্য ব্যাকুল, এমন সময় তাঁহার পিতৃদেব বিবাহের জন্য তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিয়া চিঠি লিখিলেন। তারকনাথের জন্মপত্রিকায় লিখিত ছিল যে, তিনি সন্ন্যাসী হইবেন; সেইজন্য বহুপূর্ব হইতেই তাঁহাকে গার্হস্থ্য-জীবনে ব্রতী করিবার জন্য ঘোষাল মহাশয় নানাভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তারকনাথের নিকট হইতে পাইতেছিলেন একই জবাব—তিনি বিবাহ করিবেন না। কিন্তু এইবারকার পত্রে ঘোষাল মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, সর্বকনিষ্ঠা কন্যা নীরদার বিবাহের বয়স হইয়াছে, তাহাকে সৎপাত্রস্থা করিবার চেষ্টা আর্থিক সংস্থানের অভাবে এত দিন ফলবতী হয় নাই; সম্প্রতি একটী উচ্চবংশে এই সর্তে বিবাহ স্থির হইয়াছে যে, তারকনাথকেও তাঁহাদের একটি কন্যা বিবাহ করিতে হইবে—এইভাবে বদলীতে বিবাহ না হইলে নীরদার বিবাহ সম্ভব নহে, মাতৃহীনা সর্বকনিষ্ঠা ভগ্নীটির প্রতিও তো তাঁহার একটা কর্তব্য আছে। এই চিঠি পাইয়া তারকনাথ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। একদিকে নিজ জীবনের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ, অন্যদিকে মাতৃহীনা স্নেহের পুতলি ভগ্নীটির প্রতি তাঁহার দায়িত্ব-জ্ঞান। ঐ ভগ্নীটিকে তিন মাসের ফেলিয়া মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের পর হইতে তিনি তাহাকে কোলেপিঠে করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় তারকনাথ অন্তর্দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত হইতে লাগিলেন এবং অনন্যোপায় হইয়া শ্রীভগবানের চরণে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার নির্দেশের জন্য ব্যাকুলপ্রাণে প্রার্থনায় ডুবিয়া গেলেন, "আমি

তখন ভগবানের কাছে খুব প্রার্থনা করতে লাগলাম—সরল আন্তরিক প্রার্থনা—'হে ভগবান, তুমি তো অন্তর্যামী, আমার হৃদয়ের সবই তুমি জান; ভোগবাসনা আমার মোটেই নাই—এই অবস্থায় আমায় বলে দাও আমি কি করব।' **For nearly two years I prayed and prayed** (প্রায় দু' বৎসর যাবৎ আমি ক্রমাগত প্রার্থনা করেছিলাম)। শেষে **I made up my mind** (সঙ্কল্প স্থির করে ফেললাম)। বিয়ে তো হয়ে গেল—বোনের বিয়েও হয়ে গেল।"

বারাসাত হইতে প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী মহেশ্বরপুর গ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় ৺পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য্য) মহাশয়ের সর্ব-সুলক্ষণা কন্যা নিত্যকালীর সহিত তারকনাথের এবং তাঁহারই পুত্র কালিদাসের সহিত নীরদবালা দেবীর পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছিল। তান্ত্রিকসাধকাগ্রণী ঘোষাল মহাশয় নিত্যকালীকে দেখিবামাত্রই নিজ আরাধ্যা ইষ্টদেবীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন এবং বিশেষ করিয়া সেই জন্যই দেবী-অংশ-সম্ভূতা কন্যাটিকে নিজ পুত্রবধূরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। নিত্য-কালী সর্বগুণভূষিতা বালিকা ছিলেন। তিনি নিজ দেবোপম স্বামীকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সাধুচরিত্রে নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে করিয়া তাঁহার সদুপদেশানুসারে নিজ ধর্মজীবন গঠন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। এদিকে তারকনাথের আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে কলিকাতায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী অফিসে একটি পদ খালি হওয়ায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া ঐ কাজে যোগদান করিলেন এবং কলিকাতায় এক আত্মীয়ের গৃহে রহিলেন। ঐ গৃহ ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের বাড়ী 'লিলি কটেজের' খুবই নিকটবর্তী ছিল। তারকনাথ নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত

ও সমাজের উপাসনাদিতে যোগদান করিতেন। ঐ সময় ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত সম্বন্ধে মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, "কেশব সেনের বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম, উপাসনাদিতেও যোগ দিতাম—বেশ ভাল উপাসনা হ'ত। কেশব বাবু খুব ভাবপ্রবণ লোক ছিলেন, উপাসনার সময় তিনি মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলতেন। উপাসনাকালে অনেক লোক তাঁকে ভিক্ষা দিত। তিনি মাঝে মাঝে নিজে রান্না করতেন—অন্যান্য সকলে সব যোগাড় করে দিত, তিনি নামিয়ে নিতেন। তারপর সকলে লম্বা বারান্দায় বসে একত্রে খেত—আমিও খেতাম। তখন অনেক লোক কেশব বাবুকে অবতার বলে মনে করত। খাওয়ার পরে তাঁর পাতের প্রসাদ নিয়ে একেবারে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত—ওসব আমার ভাল লাগত না। তাঁদের উপাসনাদি যদিও ভাল লাগত, তবুও একটা বিষয় বেশ মনে হত যে, তাঁদের যেন **depth** (গভীরতা) নেই, সবই ভাসাভাসা। আমার প্রাণের পিপাসা তাতে মিটত না। আমি বাসায় এসে গভীর রাতে খুব কাঁদতাম আর প্রার্থনা করতাম, "হে প্রভু, তোমার ভাবে আমায় একেবারে ডবিয়ে দাও ; আমায় ঠিক পথের সন্ধান জানিয়ে দাও ; কি করলে জগৎ-সংসার ভুলে মন সমাধিস্থ হয়ে যাবে তাই শিখিয়ে দাও।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তে

যে আত্মীয়দের সহিত তারকনাথ থাকিতেন তাঁহারা কিছু দিন পরে সিমলা পল্লীতে ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর নিকটেই উঠিয়া আসিলেন। ঐ পরিবারের সহিত রাম বাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও ছিল। অনুমান ১৮৮০ সালের[১] মে বা জুন মাসের একদিন বৈকাল বেলায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তপরিবৃত হইয়া রাম বাবুর গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রাম বাবু প্রতিবেশীদিগকেও তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। তারকনাথও এই খবর শুনিয়া সাগ্রহে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গেলেন—"গিয়ে দেখি একঘর লোক—বাইরেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁকে দেখছে আর তাঁর কথা শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে। ঐ ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখি যে, ঠাকুর তখনও ভাবাবস্থায়

---

১ শিলচর হইতে প্রকাশিত 'বিবেকানন্দ-রচিত' গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী শিখানন্দ লিখিয়াছেন—"১৮৭৯ বা ৮০ সালে আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণদর্শনলাভ হয় এবং তাঁহার দয়া প্রাপ্ত হই।" প্রথম দর্শন যে রাম বাবুর বাড়ীতেই হইয়াছিল তাহাও ঐ ভূমিকায় উল্লিখিত আছে।

এই সম্বন্ধে 'কথামৃতে'ও দেখিতে পাওয়া যায়—"রাম ও মনোমোহন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন। কেদার, সুরেন্দ্র তার পরে আসিলেন। চুনী, লাটু, নিত্যগোপাল, তারকও পরে আসিলেন।

১৮৮১র শেষভাগে ও ১৮৮২র প্রারম্ভে—এই সময়ে, মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগীন আসিয়া পড়িলেন।" (কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃষ্ঠা ৬)।

রয়েছেন—কথা বলতে পারছেন না। আড়ষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করছেন, 'আমি কোথায়?' একজন বললেন, 'রামের বাড়ীতে।'—'কোন্ রাম?'—'রাম ডাক্তার।'—'ও! ও!' আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে সমাধি সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। সমাধি কত রকমের—সমাধি-লাভ হলে কি রকম অবস্থা হয়—কোন্ সমাধির কি লক্ষণ ইত্যাদি অনেকক্ষণ ধরে বর্ণনা করতে লাগলেন। আমিতো শুনে অবাক হয়ে গেলাম। কি আশ্চর্য্য—যে জিনিষটা জানবার জন্য আমার মনে এতকাল ধরে মহা আন্দোলন চলছিল, কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, অথচ কেউ আমাকে সন্তোষজনক কিছু বলতে পারে নি—সেই সমাধি সম্বন্ধেই ঠাকুর সেই দিন কথাবার্তা বলছিলেন! তাঁর কথাগুলি যেন প্রাণের ভেতর গেঁথে যাচ্ছিল, আর প্রাণ আনন্দে নেচে উঠছিল। প্রথম দর্শনেই তাঁর দিকে মন আকৃষ্ট হয়ে গেল, আর মনে হতে লাগল—যিনি এমন সরলভাবে সমাধির কথা বলে যাচ্ছেন, নিশ্চয়ই তাঁর সমাধিলাভ হয়েছে। এইতো ঠিক ঠিক মহাপুরুষ, এঁর কৃপা কোনরকমে লাভ করতে পারলে আমিও সমাধিলাভে ধন্য হতে পারব। ঠাকুরের কথাবার্তা শেষ হবার পরে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে চলে আস্‌ছিলাম—তখন রাম বাবু এসে বল্লেন, 'এখানে খেয়ে যাবেন।' 'বাড়ীতে বলে আসি নি' বলায় তিনি তখনই খবর দেবার জন্য সেখানে লোক পাঠিয়ে দিলেন।"

রাম বাবুর গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করার পর হইতেই তাঁহার সেই ভাবঘন সমাধিমূর্তি তারকনাথের মানসপটে সর্বক্ষণ উদিত হইয়া তাঁহাকে বিহ্বল করিতেছিল। তিনি সেই দেবমানবের প্রতি প্রাণে এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। কেবলই মনে হইতে লাগিল, কবে পুনরায় তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত হইবেন। অচিরেই

শুভ সুযোগ উপস্থিত হইল। তারকনাথের অফিসের জনৈক সহকর্মীর বাড়ী ছিল দক্ষিণেশ্বর গ্রামে। তিনি ঐ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া এক শনিবারে দক্ষিণেশ্বর রওনা হইলেন।[১] অফিসের ছুটির পর বড়বাজার হইতে চলতি নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে নামিয়া তারকনাথ প্রথমে বন্ধুটীর বাড়ীতে গেলেন এবং তথা হইতে উভয়ে যখন কালীবাড়ীতে পৌছিলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা। ঠাকুরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলেন তিনি পশ্চিম দিকের গোল বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া যেন কাহারও প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। দূর হইতে ঠাকুরকে দেখিয়াই তারকনাথ যেন আবিষ্টের ন্যায় তাঁহার সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আগে কোথাও আমায় দেখেছিলে কি ?" তারকনাথ কয়েকদিন পূর্বে রাম বাবুর বাড়ীতে তাঁহাকে দর্শন করিবার বিষয় বলিলেন। শুনিয়া ঠাকুরের খুবই আনন্দ হইল। রাম বাবুর কুশল-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি দুই-এক কথার পর তিনি যেন কেমন আনমনা হইয়া গেলেন এবং তারকনাথকে সঙ্গে করিয়া নিজের ঘরে গিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন। তখন তারকনাথ প্রাণের আবেগে শ্রীরামকৃষ্ণের কোলে মাথা রাখিয়া তাঁহাকে পুনরায় প্রণাম করিলেন এবং তিনিও ধীরে ধীরে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তারকনাথের সমগ্র মনপ্রাণ এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল। ঠাকুরকে দেখিয়াই তারকনাথের মনে লইয়াছিল যেন 'মা'। তিনি পুরুষ কি স্ত্রী তাহা কিছুই তাঁহার মনে আসিল না—দেখিলেন, সাক্ষাৎ

১ বন্ধুটি বড়বাজার হইতে আম কিনিয়া লইয়াছিলেন—ইহাতে অনুমান হয় জুন জুলাই মাসে তারকনাথ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণচরণপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

স্নেহময়ী 'মা'—কত আপনার জন—তাঁহার চাহনিতে কত করুণা, কত স্নেহ![১]

ততক্ষণে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল—মন্দিরে মন্দিরে আরতির মধুর কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়া উঠিল—শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি তারকনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সাকার মান না নিরাকার?" তারকনাথ বলিলেন, "নিরাকারই আমার ভাল লাগে।" "শক্তি মানতে হয়"—এই কথা কয়টি বলিয়াই ঠাকুর টলিতে টলিতে কালীমন্দিরের দিকে চলিলেন—তারকনাথও যন্ত্রচালিতবৎ তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই ভাবে গদগদ হইয়া ঠাকুর মা কালীর সম্মুখে প্রণত হইলেন। তারকনাথের মনে প্রস্তরময়ী প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম করিতে দ্বিধা আসিল; কারণ তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত করেন, সমাজের শিক্ষা—'প্রতিমা প্রস্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে।' তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—চকিতে

১ ঠাকুরের সঙ্গে তারকনাথের ঐ মাতৃ-সম্বন্ধ কত গভীর ছিল তাহার আভাস পাওয়া যায় তাঁহার নিজের উক্তি হইতে—"ঠাকুরও আমাকে ছেলের মত দেখতেন। পরে যখন তাঁকে দর্শন করতে যেতাম, তখন সাধারণের মত দূর থেকে প্রণাম না করে তাঁর কোলে মাথা রেখে প্রণাম করতাম। তাঁর হৃদয়ও বাৎসল্যে ভরে উঠত। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কত আদর করতেন, ঠিক যেমন মা তাঁর শিশুসন্তানকে আদর করে। সে কী দিব্য অনুগ্রহ! এক দিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আমাকে তোর কেমন মনে হয়? আমি বললাম, "কেন, আপনি যে আমার চিন্ময়ী মা।' তখন স্বর্গীয় হাসিতে তাঁর মুখমণ্ডল ভরে উঠল।"

জনৈক জিজ্ঞাসু ভক্তকেও লিখিয়াছিলেন, "এই পর্যন্ত জানিয়া রাখ যে, তিনি আমাকে সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন—আর অধিক জানিবার দরকার নাই।"

বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় এক অভিনব জ্ঞানালোকে তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! মনে হইল, "এরূপ সঙ্কীর্ণতা কেন? ব্রহ্ম তো ভূমা, সর্বব্যাপী! এই প্রতিমাতেও তিনি রয়েছেন। সেই বিভুকে প্রস্তর-মূর্তিতে প্রণাম করতে আপত্তি কি?" এই ভাব মনে আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি মা কালীর সম্মুখে সশ্রদ্ধ প্রণাম করিলেন।

মন্দিরে প্রণামাদির পর ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তারকনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায়প্রার্থনা জানাইলে ঠাকুর তাঁহাকে সে রাত্রে তাঁহার কাছেই থাকিয়া যাইবার জন্য বলিলেন। কিন্তু তারকনাথ যখন বলিলেন যে, বন্ধুটিকে কথা দিয়াছেন তাহার বাড়ীতে রাত্রিতে থাকিবেন, তখন ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "কথা রাখতে হয়—সত্যকথা কলির তপস্যা।" খানিকক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা, কাল এস।"

সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই ভাবেরই বিকাশ দেখা যাইত। অন্তরঙ্গ পার্ষদদিগের সহিত তাঁহার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল পৃথক পৃথক। হইতে পারে তিনি মাতৃভাবেই তারকনাথের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। 'কথামৃতে' (৪র্থ ভাগ, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ) দেখিতে পাওয়া যায়—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর ঘর হইতে বহির্গত হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন রাম, মাষ্টার, কেদার, তারক প্রভৃতি ভক্তেরা সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর তারকের চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।" উপরোক্ত ঘটনা হইতে তারকের প্রতি শ্রীরাম-কৃষ্ণের দিব্য বাৎসল্য-ভাব কতটা গভীর ছিল তাহার একটু সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তে

সেই রাত্রিতে তারক শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে নিজ মনঃপ্রাণ নিবেদন করিয়া কেবলমাত্র শরীরটি লইয়া ফিরিলেন বন্ধুগৃহে এবং সারারাত্রি চোখের জলে ভাসিয়া ছটফট্ করিয়া কাটাইলেন। বন্ধুর বিশেষ আগ্রহে ও ভদ্রতার খাতিরে পরদিন দ্বিপ্রহরেও তাহারই বাড়ীতে আহারাদি করিবার জন্য তাঁহাকে থাকিতে হইল। তিনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সে দিন ঠাকুর তারকনাথের সহিত যেন কত কালের পরিচিত ও পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে সযত্নে তাঁহাকে মা কালীর প্রসাদী লুচি তরকারী প্রভৃতি খাওয়াইয়া সামনের দক্ষিণপার্শ্বের বারান্দায় শয়নের স্থান করিয়া দিলেন। ঐ রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে অন্য কোন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন না। কথা-প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন, "মনের আনন্দে সে রাত্রে আর ঘুম হয় নি। মাঝরাত্রে দেখি যে, ঠাকুর ভাবের ঘোরে নিজের ঘরে উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গ হয়ে পায়চারী করছেন, আর আপন মনে কি যেন বলছেন। খানিক পরে বারান্দায় এসে আড়ষ্টস্বরে বললেন, 'ওগো, ঘুমিয়েছ কি ?' আমি সঙ্গেসঙ্গেই উঠে বললাম, 'না তো, ঘুমুই নি।' 'একটু রামনাম শোনাও তো।' আমি অনেকক্ষণ রামনাম শোনালাম। ক্রমে তিনি যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হলেন। এই ভাবে একটা দিব্য আনন্দের আবেশে রাত কেটে গেল। সকালবেলা তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছি, তখন তিনি বল্লেন, 'আবার এসো—একলা'।"

কলিকাতায় ফিরিতে ফিরিতে তারকনাথের মনে যেন একটা প্রবল ঝড় বহিয়া যাইতেছিল; তিনি অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—এ অদ্ভুত মানুষটি কে ? কটিদেশে বসন কখনও আছে, কখনও বা সম্পূর্ণ দিগম্বর; মুখে মধুর হাস্যচ্ছটা, কথা বলিতে বলিতে যেন চতুর্দিকে

মধুবর্ষণ হয়! ভগবদ্ভাবে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব স্থির! পূর্বে না দেখিলেও মনে হয়, ইনি যেন কত জন্মের পরিচিত!

তারকনাথের পরবর্তী দর্শনসময়ে ঠাকুর তাঁহাকে কিভাবে কৃপা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণে পাওয়া যায়—"দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয় কি তৃতীয় বার দর্শনের সময় তিনি হঠাৎ তাঁহার পা আমার বুকে দিলেন। সে দিব্যস্পর্শে আমার বাহ্যিক সংজ্ঞালোপ হয়ে গেল। সে অবস্থায় যে কতক্ষণ ছিলাম তা জানি নে, কিন্তু পরে যখন চৈতন্য হল, দেখলাম ঠাকুর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলছেন—'মা, নেমে এস, নেমে এস।' ঐ রকম অবস্থায় অন্যের বেলায়ও তাঁকে এরকম করতে দেখেছি। এই স্পর্শের ফলে আমার হৃদয়ের দ্বার খুলে গেল; ঠিক ঠিক অনুভব হল যে, আমি শাশ্বত, চিরমুক্ত আত্মা, আর ঠাকুর সেই সনাতন আদিকারণ ঈশ্বর, জগতের কল্যাণের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমিও এসেছি তাঁর সেবার জন্য। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-মূলে আর একবারও তিনি আমাকে ঐ রকম কৃপা করেছিলেন।"

তারকনাথ আফিসে যান; কিন্তু মনটা পড়িয়া থাকে পরমহংসদেবের চরণপ্রান্তে। অফিসের কাজকর্ম্ম করা দিনের পর দিনই তাঁহার পক্ষে যেন অসম্ভব মনে হইতে লাগিল। অথচ বিবাহ হইয়াছে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য তিনিই ধর্মতঃ দায়ী। গুরু দায়িত্বজ্ঞান তাঁহাকে হঠাৎ চাকরি ছাড়িতে দিতেছিল না। সংসারে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন, ভাবিয়া গভীর মনস্তাপে তিনি পীড়িত হইতে লাগিলেন। প্রত্যহ গভীর নিশীতে ব্যাকুলপ্রাণে ভগবানের নিকট কাঁদিতেন, "প্রভু, আমার এ কি করলে!" অসহনীয় প্রাণের আবেগে অনেক সময় অশ্রুজলে অফিসের খাতাপত্র ভিজিয়া যাইত। গঙ্গায় যখন জোয়ার আসিত তখন

কাগজপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ফেলিয়াই কোন কোন দিন তারকনাথ ছুটিতেন বড়বাজারের দিকে এবং চল্‌তি নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতেন।

ঠাকুর জানিতেন, তারকনাথ 'হোমাপাখীর জাত, সংসারে কখনই লিপ্ত হইবে না। একটু চক্ষু ফুটিলেই মায়ের দিকে 'চোঁচা' ছুটিবে। সুতরাং প্রথম হইতেই তিনি তারকনাথকে সেই ভাবে শিক্ষাদি দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং দেবোদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই যে তাঁহার জীবন সেই বিষয়েও তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়া দিয়াছিলেন।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তারকনাথকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ্, এখানে কত লোক আসে, কিন্তু কার বাড়ী কোথায় বা কার ছেলে, এসব কাউকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নে, জান্‌তে ইচ্ছাও হয় না। তোকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছে, তুই এখানকার লোক, আর তোর বাড়ী কোথায়, বাপের নাম কি ইত্যাদি খবরও জান্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে কেন বল্‌তো?" ঠাকুর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তারকনাথ তাঁহার পিতৃপরিচয়াদি দিলেন। শুনিয়া ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "বটে! তুই কানাই ঘোষালের ছেলে? তাইতো বলি, মা কেন তোর বাড়ীর খবর নেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তোর বাবাকে যে খুব জানি। তিনি তো রাণী রাসমণির বাড়ীর মোক্তার। ভারি সাধক লোক। এখানে এসে গঙ্গাস্নান করে লাল চেলীর কাপড় পরে মায়ের মন্দিরে আসতেন। তখন মনে হত যেন সাক্ষাৎ ভৈরব। যেমন লম্বা-চওড়া চেহারা, তেমনি গৌরবর্ণ—বুকটা যেন সর্বদা লাল হয়েই থাকত। মায়ের মন্দিরে বসে খুব ধ্যান করতেন। তাঁর সঙ্গে একজন গায়ক থাকত; সে পেছনে বসে নানা দেহতত্ত্ব ও শ্যামাবিষয়ক গান গাইত,

আর তোর বাবা ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন—অবিরল অশ্রু ঝরত। যখন ধ্যান করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন সারা মুখ লাল হয়ে যেত—তাঁর সামনে আস্‌তে লোকের ভয় হত। আমার তো তখন খুব গাত্রদাহ—অসহ্য জ্বালা সর্বাঙ্গে। তাঁকে দেখে একদিন বল্লাম, 'হ্যাঁগা, তুমি তো মাকে ডাক, আমিও মাকে ডাকি—একটু ধ্যানও হয়। কিন্তু আমার যে এত গা জ্বালা করে, এর মানে কি বলতে পার? দেখ, (গা দেখিয়ে) এমন গাত্রদাহ যে, লোমগুলি সব পুড়ে গেছে। কখনও কখনও বড় অসহ্য হয়।' তখন তোর বাবা আমায় ইষ্টকবচ ধারণ করতে বললেন। আশ্চর্য! এই কবচধারণ করা অবধি গাত্রদাহ একেবারে কমে গেল। তাঁকে একবার আসতে বলিস্ তো?" তারকনাথ পিতাকে ঠাকুরের কথা বলায় তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং একবার আসিয়া দেখাও করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া খুব আনন্দিত হন এবং ভাবস্থ হইয়া একখানি পা তাঁহার ঘাড়ে তুলিয়া দেন। সেই অবস্থায় ঘোষাল মহাশয় পূর্বের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা করেন। ঠাকুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, "মার ইচ্ছা হলে তাই হবে।" ঠাকুর আর একদিন তারককে বলিয়াছিলেন, "তোর বাবার সাধন সকাম ছিল। সেই সাধনবলেই এত অর্থাগম হয় এবং এত সদ্‌ব্যয়ও করেছিলেন।"

এদিকে তারকনাথের অন্তর্বিপ্লব বাড়িয়াই চলিয়াছে। একদিন তিনি ঠাকুরকে নিজের মানসিক অবস্থা অকপটে সব নিবেদন করিলেন। ঠাকুর সস্নেহে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কিরে? আমি আছি। স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখাশুনা করতে হবে বৈকি? একটু ধৈর্য ধর্—মা সব ঠিক করে দেবেন। বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাবি, আর যেমন যেমন বলে দিচ্ছি, তেমনটি করিস্—তাঁর কৃপায় স্ত্রীর

সঙ্গে থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না।" এই বলিয়া ঠাকুর তারকনাথের মস্তকে ও বক্ষে হস্ত স্থাপনপূর্বক খুব আশীর্বাদ করিলেন।

এতদ্ব্যতীত সুযোগ বুঝিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অন্য সময়ে তারকনাথের মনে স্বীয় মাতৃভাবের গভীর দাগও অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের বাসকালে ঠাকুর একদিন তারকনাথকে বলিয়াছিলেন, "ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন আর এই নহবতের মা—অভেদ।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্বাসবাণীতে ও আদর্শে তারকনাথের অন্তর কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। তিনি নিজেকে সর্ববিষয়ে দেবরক্ষিত মনে করিয়া প্রাণে বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। 'ভয় কিরে? আমি আছি'—ঠাকুরের এই অভয়বাণী তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষাকবচের ন্যায় ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, সংসার তাঁহাকে বাঁধিতে পারিবে না; তাই তিনি অনাসক্তভাবে সংসারে লৌকিক কর্তব্যগুলি করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী বারাসতে থাকিতেন; স্ত্রীর অসুখের সংবাদাদি পাইলে তিনি কলিকাতা হইতে বাড়ীতে গিয়া তাঁহার রীতিমত সেবা-শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিতেন।

এতদিনে ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগেন, লাটু, শরৎ, শশী, কালী প্রভৃতি ভাবী ত্যাগী ভক্তগণের অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর এই সকল যুবক-ভক্তকে লইয়া সত্য, সংযম, বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারণপূর্বক যাঁহার যেমন ভাব তাঁহাকে সেই ভাবে শিক্ষাদান করিয়া প্রত্যেকটি জীবনকে নিখুঁতভাবে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

'জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।' শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তের ভিতরে শক্তি-

সংক্রামণের প্রণালী ছিল অতি বিচিত্র ও অভিনব। তিনি কাহারও বক্ষঃস্থল বা মস্তক স্পর্শ করিয়া আধ্যাত্মিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতেন; কোথাও বা সুপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিকে জাগরিত করিতেন শুধু নিজ কৃপাদৃষ্টি দ্বারা; আবার কখনও বা কোন শিষ্যের জিহ্বাতে নিজের নখাগ্র দ্বারা বীজমন্ত্র লিখিয়া বা কোন সাঙ্কেতিক যন্ত্র আঁকিয়া কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রতা করিয়া দিতেন। পক্ষিমাতা যেমন সময় বুঝিয়া নিজ চঞ্চুর আঘাতে ডিম ফুটাইয়া শাবক বাহির করে, ঠাকুরও তাঁহার অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি ও যোগদৃষ্টিবলে কোন্ সাধককে কখন কি ভাবে চালিত করিতে হইবে তাহা জানিতেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতেন।

ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টিতে ভক্তগণের অনেকেই ধ্যান-ভজনাদির সময় ভাবাবিষ্ট হইতে এবং বিভিন্ন দেবদেবীর দর্শনাদি পাইতে লাগিলেন। কিছুদিন যাতায়াতের পরে তারকনাথ একদিন ঠাকুরকে ভাবসমাধির জন্য ধরিয়া বসিলেন। ঠাকুর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সস্নেহে বলিয়াছিলেন, "হবে রে হবে—এত উতলা হচ্ছিস্ কেন? মা কৃপা করে সময়ে সব দেবেন। তবে তোর মূর্তিদর্শন এখন হবে না—পরে হবে। তোর ঘর আলাদা।"

একদিন ঠাকুর তারকনাথকে একান্তে পঞ্চবটীমূলে লইয়া গিয়া তাঁহাকে জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার জিহ্বায় কি যেন লিখিয়া দিলেন।[১] ঐ লেখার সঙ্গেসঙ্গেই তারকনাথ গভীর ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর-মনের জ্ঞান এককালে

১ খুব সম্ভব ইষ্টমন্ত্র—আর শাস্ত্রে ইহাই শাম্ভবী দীক্ষা বলিয়া অভিহিত। ১৯১৫ সালে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত আলমোড়ায় অবস্থানকালে মহাপুরুষজী

লোপ পাইল। অনেকক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিবার পরে ঠাকুর ধীরে ধীরে বুকে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন এবং নিজের ঘরে আনিয়া সস্নেহে মিষ্টান্নাদি খাইতে দিলেন ও সাধন-ভজন সম্বন্ধে অনেক গুহ্য উপদেশ প্রদান করিলেন। আধ্যাত্মিক শক্তিসংক্রামণ দ্বারা ঠাকুর তারকনাথকে যে আনন্দময় ভূমিতে আরূঢ় করাইয়াছিলেন, সেই আনন্দের নেশা তাঁহার দীর্ঘদিন স্থায়ী হইয়াছিল। শয়নে, জাগরণের সর্বাবস্থায় তিনি যেন এক অতীন্দ্রিয় আনন্দময় লোকে বিচরণ করিতেছিলেন। ঐ শক্তিসঞ্চার তাঁহার মনোজগতে এক আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল। তিনি অন্তরে বাহিরে নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধ্যানপ্রবণতা ও অন্তর্মুখী ভাব ক্রমেই গভীরতর এবং নব নব অনুভূতিতে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন সমৃদ্ধ হইতে লাগিল।

ঠাকুর শুধু যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিষ্যদের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিতেন তাহা নহে, দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যাপারও তিনি তাঁহাদিগকে হাত ধরিয়া শিক্ষা দিতেন। এই বিষয়ে একদিন মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, "তিনি সাধনমার্গে যেমন আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করতেন, তেমনি যত্নের সহিত ছোটখাট সব বিষয়েও কত উপদেশ দিতেন। আমরা কি জানি? দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে অনেক সময় গঙ্গাতেই শৌচাদি

একদিন বলিয়াছিলেন, "তাঁর দীক্ষা তো সামান্য ছিল না—একেবারে জাগিয়ে দিতেন! জিভে কি লিখে দিলেন—আর একেবারে গুড়গুড় করে বুকের ভিতর যেন ঢেউ খেলুছে। আমায় বলেছিলেন, 'তুই অভিষিক্ত হবি?' আমি বল্লাম, 'আমি জানি নে।'—'তবে থাক্'।"

"কালীঘর থেকে নমস্কার করে আস্‌ছি, তখন আমায় দেখিয়ে বললেন, 'এর উঁচু শক্তির ঘর—যেখান থেকে নামরূপ হচ্ছে'।"

করতাম। একদিন ঠাকুর ঐ কথা শুনে বল্লেন, 'সে কি গো! গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি! ওতে কি শৌচ করতে আছে?' তারপর আর কখনও গঙ্গায় শৌচ করি নি।" আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "তখন (দক্ষিণেশ্বরে থাকতে) ঠাকুরের ঘরের মেজেতে বড় মশারির ভেতর শীতকালে সকলে শুতাম। শোবার সময় ঠাকুর এসে দেখাতেন কেমন করে শুতে হয়। বলতেন, 'চিৎ হয়ে শুয়ে, বুকের উপর মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন—এই ভেবে মায়ের ধ্যান করতে করতে ঘুমুলে সুস্বপ্ন হয়। এ রকম সব চিন্তা করতে হয়।' আহা! কত স্নেহ, কত ভালবাসাই তাঁর ছিল! কিন্তু বড় সাবধানে থাকতে হত।"

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বাস করা সম্বন্ধে অন্য এক দিন বলিয়াছিলেন—

"মহারাজ না থাকলে, ঠাকুরের খুব কষ্ট হত। একদিন রাত একটার সময় বারান্দায় এসে আমাকে বল্লেন, 'ওরে, একটু গোপালনাম আমায় শোনা তো।' আমি প্রায় এক ঘন্টা তাই করলাম। কোন কোন দিন দুপুর রাতে কাকেও না পেলে, দারোয়ানকে ডাকিয়ে রামনাম শুনতেন। শুধু নাম।"

দক্ষিণেশ্বরে তাঁহারা ঠাকুরের কাছে থাকিতেন; কিন্তু ভগবদ্ভাবে তন্ময় সেই অবতারপুরুষের সঙ্গে থাকা বড় সহজ ব্যাপার নহে। মহাপুরুষজী বলিয়াছেন, "আমরা দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুরের কাছে রাত্রে থাকতাম, তখন খুবই ভয়ে ভয়ে থাকতে হত। তাঁর আদৌ ঘুম নেই।···কখনও রাত দুপুরেই আমাদের ডাকতেন, 'হাঁরে, তোরা কি এখানে ঘুমুতে এসেছিস্, সারারাত যদি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিবি তো ভগবানকে ডাকবি কখন?' তাঁর গলার শব্দ পেলেই আমরা ধড়মড়

করে উঠে ধ্যান করতে বসতাম।” ধ্যানাদি সম্বন্ধে উপদেশপ্রদান ও প্রেরণাদানের সঙ্গেসঙ্গে ঠাকুর ভক্তগণকে অধ্যাত্মরাজ্যের অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা দিতেন। সাধনভজনের সঙ্গে সাধুভক্তি একান্ত আবশ্যক বলিয়া ঠাকুর তারকনাথকে শিখাইয়াছিলেন যে, সাধুদর্শনে যাইবার সময়ে শুধু হাতে যাইতে নাই—অন্ততঃ এক পয়সার পান লইয়া যাইতে হয়। তারকনাথ তাই এক পয়সার পান লইয়া যাইতেন। ভক্তদের লক্ষণাদি সম্বন্ধেও তিনি ঠাকুরের নিকট নানা শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “আমরা লোক দেখলে বুঝতে পারি—ঠাকুর আমাদের এসব শিখিয়েছিলেন।”

ঠাকুরের নিকট যাতায়াতের ফলে তারকনাথের বৈরাগ্যপ্রবণ চিত্ত যখন ক্রমেই সংসারবিমুখ হইতে লাগিল তখন সময় বুঝিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সন্ন্যাসজীবনের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। উচ্চবংশসম্ভূত ও বাল্যে ধনিগৃহে লালিত তারকনাথের জাগতিক অভিমান চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে ভিক্ষায় পাঠাইলেন।[১]

এই সকল কথা শুনিয়া স্বভাবতঃ মনে হয় যে, ঠাকুরের সহিত তারকনাথের সম্বন্ধ বুঝি সাধারণ গুরুশিষ্যের সম্বন্ধেরই ন্যায় ছিল। বস্তুতঃ তাহা নহে। মহাপুরুষজী নিজে বলিয়াছেন, “আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের যে ভাব ছিল তাতে ঐশ্বর্য্যের ভাব একটুও ছিল না। আমরা আমাদের কথা বলছি—ঠাকুরকে সে ভাবে দেখি নি। তিনিও ওরূপ ভালবাসতেন—কেউ অবতার, ভগবান, এসব বললে তিনি বিরক্ত হতেন। ওতে আপনবুদ্ধি

১ “ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আমাদিগকে ভিক্ষা করিয়েছেন—অভিমানত্যাগের জন্য।”—‘মহাপুরুষজীর কথা’, ৭৭ পৃঃ।

যেন একটু কমে যায়।” মহাপুরুষজী আরও বলতেন, “কি ভাগ্যবানই আমরা—পান সেজে, তামাক সেজে খাইয়েছি, তাঁর সেবা করেছি—আদর-ভালবাসা কত পেয়েছি।” অন্যত্র বলিয়াছেন, “ঠাকুর যে ঈশ্বর, সে কথা এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি। আগে ঠাকুরের ভালবাসার বন্ধনেই আমরা তাঁর কাছে ছিলাম। এখন দেখ্‌ছি, ও বাবা! দেখতে ছোট্ট মানুষটি, নড়াচড়া করতেন সাধারণ মানুষের মত; কিন্তু তিনি কি বিরাট! কত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই না তাঁর ভেতরে রয়েছে!”

ঠাকুরের সান্নিধ্যমাত্রেই ভক্তগণের মনোরাজ্যে কতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করিত তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মহাপুরুষজীর কথা হইতে পাওয়া যায়—“ঠাকুরের কাছে হয়ত দু-এক ঘণ্টা মাত্র কাটিয়ে এলাম, সব দিন তেমন বেশী কথাবার্তাও হ'ত না; কিন্তু তার ফল বহু দিন পর্যন্ত থাকত। কেমন যেন একটা নেশার মত হয়ে যেত—সর্বক্ষণই ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে থাকতাম। তাঁর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবান্—যুগাবতার। তাঁর কৃপাকটাক্ষে সমাধি হয়ে যেত। তিনি স্পর্শমাত্রে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দিতে পারতেন।”

ঐ সময়ের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে পরবর্তী জীবনে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “সময় সময় মনে হ'ত ঠাকুরের কাছে কাঁদি। এক দিন রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে পোস্তার উপর বকুলতলার কাছে খুব খানিকটা কাঁদলাম। এদিকে ঠাকুর আমাকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—‘তারক কোথায় গেল?’ তাঁর কাছে যেতেই তিনি বল্লেন, ‘বোস্ বোস্—দেখ্, ভগবানের কাছে কাঁদলে তাঁর ভারি দয়া হয়। জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ-অশ্রুতে ধুয়ে যায়। তাঁর কাছে কাঁদা খুব ভাল।’ আর একদিন আমি পঞ্চবটীতে ধ্যান করছি,

খুব জমেছে—এমন সময় ঠাকুর ঝাউতলার দিক থেকে এলেন। যেই তিনি আমার দিকে চেয়েছেন অমনি হুহু করে কান্না পেল। ঠাকুর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন—বুকের ভেতর গুড় গুড় করে উঠল, আর এমন কাঁপুনি যে থামে না। ঠাকুর জনান্তিকে বললেন, 'কান্না কি অমনি হয়?—ওর একটা (ঈশ্বরীয়) ভাব হয়েছে—ওকে নিয়ে এস।' তারপর তাঁর ঘরে গিয়ে বসলাম। তিনি কিছু খেতে দিলেন, কুণ্ডলিনী-জাগরণ তাঁর হাতের ভেতর ছিল; না ছুঁয়ে কেবল কাছে দাঁড়িয়ে করে দিতেন।" পরে বিষ্টুর[1] প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী বলিলেন—"সে ধ্যানেতে কাঠ মেরে যেত। আমরা সব ধাক্কা মেরেছি—তবু সাড়া নেই। বিষ্টু বিষ্টু করে ডাকছি—কোথায় বিষ্টু! নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখেছি যে কিছুই নেই। ঠাকুরকে গিয়ে বলাতে তিনি বললেন, 'জড় সমাধি।' ঠাকুর এসে ছুঁয়ে দিতেই সে চেয়ে দেখলে। বিষ্টুর এত গভীর ধ্যান হ'ত কিন্তু ঠাকুর যেমনি ছুঁয়েছেন, অমনি জেগে উঠ্‌ত তাঁর দিকে চেয়ে।"[2]

যতই ঠাকুরের সঙ্গে তারকনাথ অঙ্গরঙ্গভাবে মিশিতে আরম্ভ করিলেন, ততই তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন যে, শ্রীগুরুকৃপাবলে তাঁহার হৃদয়ের সকল গ্রন্থি উত্তরোত্তর শিথিল হইয়া যাইতেছে—সকল সংশয় ক্রমেই নিরাকৃত হইতেছে। তিনি বুঝিলেন, জগদম্বার জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক জানা হইলেই সব জানা ও পাওয়ার শেষ হইয়া যাইবে।

এখন হইতে তাঁহার মন অধিকতর ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিল সমাধির

১ বিষ্টু—জনৈক যুবকভক্ত, এঁড়েদয়ে বাড়ী। ঠাকুরের কাছে খুব যাতায়াত করিতেন। ঠাকুর বিষ্ণু সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "বোধ হয়, শেষ জন্ম।" ('কথামৃত')

২ উপর্যুক্ত প্রসঙ্গটি ১৯১৫ সালে মহাপুরুষজীর আলমোড়ায় অবস্থানকালে এক দিন দ্বিপ্রহরের পর হইয়াছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

অমৃতসাগরে ডুবিয়া যাইবার জন্য। 'আত্মানং বৈ বিজানথ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ'—এই উপনিদ্‌বাক্য যেন তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তিনি আরও অল্পভাষী, কখনও বা মৌনী এবং লোক-সঙ্গবিমুখ হইয়া পড়িলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বতঃই তাঁহার পূত চরিত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ এইরূপেই তিনি শিবমহিম্নঃস্তোত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। শেষ জীবনে তিনি উহা প্রায়ই পাঠ করিতেন এবং অপরকেও পাঠ করিতে উৎসাহিত করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরকে দেখেছি, তিনি শিবমহিম্নঃস্তোত্র সবটা শুনতে পারতেন না। একটা-দুটো শ্লোক শুনেই সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। 'অসিতগিরিসমং স্যাৎ' আর 'তব তত্ত্বং ন জানামি' ইত্যাদি শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে তিনি কেঁদে ফেলতেন, আর কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'তোমার তত্ত্ব কে বুঝবে, প্রভু! তুমি যে কি তা কে জানে? আমি তোমায় জানতে চাই নে, তোমায় বুঝতে চাই নে, প্রভু! কেবল তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।' তাঁকে কে জানবে?"

ধ্যানবিষয়েও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে শেষ বয়সে পর্যন্ত বলিতে পারিয়াছিলেন, "আমার তো তিনটে বাজলেই ঘুম ভেঙ্গে যায়, তা যখনই শুইনে কেন! ঠাকুরকে দেখেছি, রাত তিনটে বাজলে আর কিছুতেই ঘুমুতে পারতেন না। অমনি তাঁর ঘুম অল্প ছিল, এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা হল তো ঢের। উঠেই ভগবানের নাম করতে শুরু করে দিতেন।...তাঁর ঘরে আমাদের যারা থাকত সকলকে ডেকে তুলে দিতেন। বলতেন, 'ওরে, তোরা উঠ লি?

উঠ। উঠে ভগবানের নাম কর্।'...কোন কোন দিন আবার কীর্তন করতে শুরু করে দিতেন, সঙ্গে খোল-করতাল বাজত। আমরাও তাতে যোগ দিতাম। তিনি বেশীর ভাগই নামকীর্তন করতেন। আর মাঝে মাঝে নিজেই আখর দিতেন, কখনও বা ভাবাবেশে নাচতেন। আহা! কি মনোহর নৃত্য!...কি আনন্দেই না তাঁর কাছে আমরা ছিলাম! ঠাকুর্ নিজে নাচতেন—নেচে অন্যকেও নাচাতেন—ভাবের আনন্দে ভরপুর হয়ে তিনি নৃত্য করতেন। ভাবে তন্ময় হয়ে নাচতেন কিনা! তাই অত সুন্দর দেখাত। তাঁর দেহটি অতি সুঠাম ও কোমল ছিল। ভাবের আনন্দে ভরপুর হয়ে তিনি নৃত্য করতেন। সে সব দৃশ্য এখনও যেন চোখের উপর ভাস্‌ছে। তাঁর ঐ মনোহর নৃত্য দেখে আমাদেরও ভেতর হতে নাচতে ইচ্ছা হত। তিনিও আমাদের টেনে নিয়ে ধরে নাচাতেন। কখনও বলতেন, 'লজ্জা কিরে? হরিনামে নৃত্য করবি, তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা ঘৃণা ভয়—এ তিন থাক্‌তে নয়। যে হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে পারে না, তার জন্ম বৃথা—এই সব বলতেন। আহা, সে কি দৃশ্য! এত ভাব হত যে, তখন আর কথাবার্তা বলতে পারতেন না। সে কি প্রেম! দরদর অশ্রু যেন ধারা বয়ে যাচ্ছে! এমন প্রেমাশ্রুপাত আর কারও কখনও দেখি নি।"

ঠাকুরের সম্বন্ধে তারকনাথ আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ঠাকুর ক্রমাগত শিবের গান শুনিতে পারিতেন না—উহার সঙ্গে দেবীবিষয়ক গানও গাহিতে হইত। এক দিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন যে, কোন প্রসিদ্ধ গায়ক সেদিন ঠাকুরকে শিববিষয়ক গান শুনাইতেছিলেন। দুই-একটি গান শুনিয়াই ঠাকুর একেবারে সমাধিমগ্ন! এরূপ গভীর সমাধি তারকনাথ প্রভৃতি পূর্বে

কথনও দেখেন নাই। সেদিন তাঁহার মন আব কিছুতেই নামে না। অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর হঠাৎ 'উঃ উঃ' করিয়া উঠিলেন এবং অতি কষ্টে বলিলেন, 'শক্তি গা'। তাই গায়ককে মায়ের গান গাহিতে বলা হইল এবং সেই গান অবলম্বনে ঠাকুরের মন ক্রমে নির্বিকল্পভূমি হইতে নামিয়া আসিল। ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া মহাপুরুষজীই বলিয়াছিলেন, "তিনি এসেছিলেন জগতের কল্যাণের জন্য।···শিবেব ধ্যান হল নির্বিকল্প অবস্থা।·· তাই তিনি ভক্তসঙ্গে ভক্তিভাব আশ্রয় করে থাকতে চাইতেন।"

তারকনাথ এইরূপে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসাবে বুদ্ধি ও ভাবেব ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদা খুঁজিয়া বেড়াইত, তাবকনাথ ভাবাবেশে কোথাও 'পরধর্মে' আকৃষ্ট হইতেছেন কিনা এবং আবশ্যক হইলে তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে সাবধান কবিয়া দিতেন। ঠাকুরের কথা তারকনাথের এতই ভাল লাগিত যে, তিনি সে-সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে খুব সুন্দব কথা হইতেছে—তারকনাথ নিবিষ্টমনে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকাইয়া সব কথা যেন চিত্তে গাঁথিয়া লইতেছেন। ঠাকুর তাঁহার ঐ ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কিবে, অমন করে কি শুন্‌ছিস্?" তারকনাথ একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, "তোর ওসব কিছু করতে হবে না—তোদের জীবন আলাদা।" তারকনাথের মনে হইল, ঠাকুর যেন তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াই ঐরূপ বলিলেন এবং তদবধি ঠাকুরের কথা লিখিয়া রাখার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন, অধিকন্তু যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন।

ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত সেবা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত ও বাসকালে তারকনাথ স্বভাবতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য লালায়িত ছিলেন এবং সুযোগের অন্বেষণে থাকিতেন। ঠাকুরের কিন্তু মনোভাব ছিল অন্যরূপ এবং অনেক ক্ষেত্রে তারকনাথের সকল রকম সেবাগ্রহণে অনিচ্ছাপ্রকাশ পর্যন্ত করিতেন। একদিন তারকনাথ অপর ভক্তদের সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসিয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর ঝাউতলার দিকে শৌচাদিতে গেলেন। সাধারণতঃ তাঁহাকে শৌচে যাইতে দেখিলে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে কেহ তাঁহার গাড়ুটা লইয়া যাইতেন এবং যথাসময়ে গাড়ু হইতে তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতেন। কারণ, ঠাকুর অনেক সময়ই ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, সেই দিন তারকনাথই গাড়ু লইয়া অগ্রসর হইলেন। শৌচান্তে ঠাকুর তাঁহাকে গাড়ু হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "দেখ্, তুই কেন জলের গাড়ুটা আনলি? তোর জল আমি কেমন করে নেব? তোর সেবা কি আমি নিতে পারি? তোর বাবাকে যে আমি গুরুর মত শ্রদ্ধা করি!" তারকনাথ তো শুনিয়া অবাক্! তখন তিনি বুঝিলেন, ঠাকুর কেন তাঁহার সব রকম সেবা তাঁহাকে করিতে দিতেন না। তিনি কারণ বুঝিলেন বটে, কিন্তু মনের খেদ থাকিয়াই গেল। পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর আমায় তাঁর সেবাদি বড় একটা করতে দিতেন না—তাতে অনেক সময় আমার মনে কষ্ট হত।" এইরূপে কোন-কোনও ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও কিন্তু স্বভাবতঃ সেবাপ্রবণ তারকনাথ সর্ব্বতোভাবে গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"—গীতোক্ত এই নীতি অনুসারে সেবার সহিত একনিষ্ঠ-

ভাবে একমাত্র তাঁহারই বাণী গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "ঠাকুরের কাছে যখন থাকতাম, তাঁর সেবা করতাম তখন কত লোকে কত কথা উপদেশচ্ছলে বলত, তাহার কিছুই ভাল লাগত না ; কিন্তু ঠাকুর দু'-একটি কথা যা বলতেন, তাই শুনতাম আর ভাল লাগতো ; অন্যের কথা শুনতে ইচ্ছাই হত না।"

একবার তারকনাথ অনেক দিন পরে বাড়ীতে গিয়া স্ত্রীর নিকট নিজ মানসিক অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া বলিয়াছিলেন যে, সংসারে থাকা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভবপর নহে, কিন্তু তাহার ভরণ-পোষণের সমস্ত ব্যবস্থা তিনি সানন্দে করিবেন।

উহার কিছুকাল পরেই নিত্যকালী দেবী কিছুদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিবার পর দেহত্যাগ করেন। তারকনাথ বাড়ীতে গিয়া স্ত্রীর ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়াদি যথাবিধি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পরেই তিনি চাকরি ছাড়িয়া দিলেন এবং সংসারের সকল সম্বন্ধ এককালে কাটিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শজীবন তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইবার জন্য খুবই প্ররোচিত করিতেছিল। তিনি নীরবে অশ্রুপাত করিয়া হৃদয়-দেবতার চরণে প্রাণের আর্তি নিবেদন করিয়া উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া তিনি কি ভাবে নিজ পিতৃদেবের প্রাণখোলা আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া চিরদিনের মত সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় তাঁহার নিজের কথা হইতে—"এদিকে ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসা করতে করতে ক্রমে যখন সংসারের সকল সংশ্রব ছেড়ে দেব সঙ্কল্প করলাম, তখন বাবার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে যাই। বাবাকে নিজ অভিপ্রায় জানাতেই

তিনি একেবারে কেঁদে ফেললেন—ধারা বয়ে চোখের জল পড়তে লাগল। ঠাকুরঘর ছিল—আমাকে ঠাকুর প্রণাম করতে বললেন। পরে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার ভগবানলাভ হোক। আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি—সংসার ছাড়বারও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নি। তাই তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তোমার ভগবানলাভ হোক।' আমি একথা ঠাকুরকে এসে বলেছিলাম; তিনি শুনে খুবই আনন্দিত হয়ে বললেন, 'খুব ভাল হয়েছে।' আমার বাবার সাধনভজন কিছু ছিল কিনা—তাই! আবার নিজে চেষ্টা করেও পান নি, অথচ প্রাণে সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল। এদিকে সংসারে নানা অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট লাভ করেছিলেন। তাই তিনি অত সহজে আমায় বিদায় দিতে পেরেছিলেন।"

অনুমান ১৮৮৩ সালের শেষভাগে শ্রীগুরুকৃপাবলে সংসারের সকল প্রকার দায়িত্ব ও বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তারকনাথ শ্রীগুরু-প্রদর্শিত পথে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর কিছু দিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বাস করিলেন। সেই সময়ে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে পরমহংসদেবের তৎকালীন ভক্তদের সমাবেশ প্রায় নিত্যই হইত এবং ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশাবলীর আলোচনা, সংকীর্তন ও ধ্যানভজনাদিতে সকলে প্রভূত আনন্দ লাভ করিতেন। তারকনাথের প্রাণে খুবই ইচ্ছা হইল ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলীর ভিতর বাস করেন। অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁহার প্রাণের ভাব বুঝিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে রামবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ রাম, এই তারক তোমাদের বাড়ীতে থাকবে। ও সর্বদা এখানকার

ভক্তদের সঙ্গে বাস করতে বড়ই উৎসুক হয়েছে।" রামবাবু 'তথাস্তু' বলিয়া তারকনাথকে সানন্দে তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন হইতে তিনি রামবাবুর বাড়ীতে থাকিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ্, তুই ব্রাহ্মণের ছেলে, তাদের অন্নটা খাস্‌নি—আর সব খাবি।" তারকনাথ ঠাকুরের আদেশানুসারে রামবাবুর বাড়ীতে স্বহস্তে রান্না করিয়া খাইতেন। এইরূপে শ্রীরাম-কৃষ্ণের আত্মগোষ্ঠীর মধ্যে তারকনাথই সর্বপ্রথমে সংসারত্যাগ করিলেন।

বর্ষাসমাগমে স্রোতস্বিনী যেমন উচ্ছ্বসিত বেগে সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়া চলে, শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য-সংস্পর্শে তারকনাথের হৃদয়ও সেইরূপ তীব্র ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্যের বিপুল প্রবাহে উদ্বেল হইয়া পরম শ্রেয়োলাভের উদ্দেশ্যে ধাবমান হইল। তিনি রামবাবুর বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ভূমিশয্যায় শয়ন এবং একাহার করিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।[১] তখনকার কঠোরতা সম্বন্ধে পরবর্তী কালে তিনি এক দিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "রামবাবুর বাড়ীতে যখন থাকতাম তখন মনের অবস্থা এমন ছিল যে, আহারাদির দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ ছিল না—কোনরকমে শরীর-ধারণের জন্য যতটুকু না করলে নয় তাই করতাম। অধিকাংশ দিনই একাহার—তাও হবিষ্যান্ন—কখনও বা আলুবেগুন বা যা-হয়-কিছু পুড়িয়ে তা দিয়ে রুটি খেয়ে নিতাম।

১ জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, "একদিন দেখি যে, তারকনাথ একটি ডোরাকাটা কম্বল গায়ে দিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে স্থির হয়ে মেঝেতে শুয়ে ধ্যান করছেন। নিশ্চল পুরুষ! গরমি কাল, দিনের বেলায় কম্বল গায়ে দিয়ে পড়ে থাকা বিশেষতঃ সেই হাওয়া-বন্ধ ছোট কুঠরিটার ভেতর। সবই অদ্ভুত!"

দেহের আরামের জন্য সময় দিতে আদৌ ইচ্ছা হত না।"[১] ঐ সময়ে তিনি সর্বদা অন্তর্মুখ থাকিতেন এবং রাস্তায় চলিতে দৃষ্টি পদাঙ্গুষ্ঠনিবদ্ধ থাকিত। ঐ ভাবে তিনি একদিন গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, এমন সময়ে বারাসত-নিবাসী তাঁহার পূর্বপরিচিত জনৈক ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং কথা বলিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তারকনাথের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি আপন মনেই চলিয়া গেলেন। ইহাতে উক্ত ভদ্রলোক বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া অপর একজনের নিকট তারকনাথের অহঙ্কার সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেন। কিন্তু ঐ লোকটি তারকনাথের মনোভাব জানিতেন। তাই তিনি বলিলেন যে, উহা অহঙ্কার নহে, প্রত্যুত অন্তর্লীন ভাব। তাঁহার সহিত কথা বলিতে হইলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া সম্বোধন করিতে হইবে। তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অবশেষে ঐরূপ করিলে তারকনাথ তাঁহার সহিত অতি বন্ধুভাবে আলাপ করিলেন ও তাঁহার মনের খেদ দূর হইল। তারকনাথের তখনকার মানসিক অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস তাঁহার অন্য একদিনের কথায়ও পাওয়া যায়, "এমন অনেক সময় গেছে যখন বিডন স্কোয়ারে ও হেদোয় রাতভর ধ্যানভজন করে কাটিয়ে দেওয়া যেত। কখনও বা কালীঘাটে এবং কেওড়াতলায়ও ধ্যানভজন করেছি।"

রামবাবুর বাড়ীতে কিছুকাল কাটাইবার পরে আরও একান্তে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাস করিবার মানসে তারকনাথ রামবাবুর কাঁকুড়-

১ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'—৫ম ভাগে, (৮১ পৃষ্ঠা, ১৮৮৩, ২০শে সেপ্টেম্বর) দেখিতে পাওয়া যায়, "তারক রামের বাড়ীতে থাকেন। তারকেরও অবস্থা অন্তর্মুখ। তিনি লোকের সঙ্গে আজকাল বেশী কথা কন্ না।"—ইত্যাদি।

গাছির নির্জন বাগানবাড়ীতে (বর্তমান যোগোত্থানে) চলিয়া আসিলেন। তখন কাঁকুড়গাছি অঞ্চল জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং খুবই নির্জন ছিল। অনুকূল স্থান পাইয়া প্রাণের নবানুরাগে তিনি তীব্র সাধনভজনে ডুবিয়া গেলেন। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন'—এই হইল তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প। কাঁকুড়গাছির জীবন সম্বন্ধে মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, "কাঁকুড়গাছিতে যখন পড়ে থাকতাম, বেশ থাকতাম—খুব নিরিবিলিতে। দিনের বেলায় দুটী ভাত কোনরকমে যোগাড় করে নিতাম, আর রাত্রে ধুনিতে দু খানি রুটি, এক আধটা বেগুন কাঁচকলা পুড়িয়ে খেয়ে নিয়ে ভরপেট জল! আর একমনে সাধনভজন করতাম। তখন ও অঞ্চলে বড় কেউ লোক ছিল না—বাগানে শুধু একটি মালী। একাকী পড়ে থাকতাম, আর ভজন করতাম।" অন্য একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "কাঁকুড়গাছিতে একটা আমগাছ-তলায় ধুনি জ্বালিয়ে দিনরাত সেখানেই পড়ে থাকতাম, ধ্যান জপ বিশ্রাম—সবই ওখানে। সাপগুলি ধুনির আগুন দেখে আসতে আসতে আবার দূরে চলে যেত। আমি এক একবার শুধু দেখতাম—তা আমার দিকে আসত না। দিনে একবার ভিক্ষায় বের হতাম, যা জুটত তাই খাওয়া যেত—বেশ লাগত।"

এইভাবে অতিরিক্ত কঠোরতা করিবার ফলে তাঁহার শরীর ক্রমে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু মনে সঞ্চার হইয়াছিল অদম্য শক্তি, আর দুই চক্ষু হইতে নির্গত হইত একটি স্নিগ্ধ তেজ। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট, কথাগুলি প্রেমপূর্ণ ছিল এবং ব্যবহারে এক অমায়িক মধুরভাব প্রকাশ পাইত। "পরিধানে একখানি মাত্র কাপড়, দেহ অনাবৃত—মাত্র কোঁচার দিকটা ঘুরাইয়া গায়ে দিতেন। সকল সময়েই যেন ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় ও বিভোর—পথে চলিবার সময়

নিম্নদিকে চাহিয়া ধীর পদবিক্ষেপে স্থিরমনে চলিয়া যাইতেন—বৌদ্ধ শ্রমণদের মত। তিনি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন, মুখে সামান্য কোঁকড়ান দাড়ি, চুল উস্কুখুস্কু শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।”

ঐ তপস্যার সময়ে তারকনাথ মধ্যে মধ্যে একাকী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন। ঠাকুরকে একান্তে পাইবার মানসে তিনি বেশীর ভাগ আসিতেন শনি রবিবার বাদ দিয়া এবং অনেক সময় রাত্রিকালে দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করিয়া সকালে নিজ সাধনস্থানে চলিয়া যাইতেন। উৎসবাদিতে যোগদান করার মত তাঁহার তখন মনের অবস্থা ছিল না। তাহা ছাড়া আত্মগোপন করাটা তাঁহার যেন স্বভাব ছিল। বোধ হয় সেইজন্যই ‘কথামৃত’ প্রভৃতি গ্রন্থে তারকনাথের নামের উল্লেখ খুব বেশী দেখা যায় না। অথচ তিনি প্রায় সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত খুব অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়াছিলেন।

তারকনাথ রামবাবুর বাড়ীতে অবস্থানকালে নিত্যগোপাল নামক জনৈক যুবক ভক্তের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। রামবাবু ও নিত্যগোপাল দুইজনেই পরস্পর নিকট আত্মীয়, সেজন্য নিত্যগোপাল অনেক সময় রামবাবুর বাড়ীতেই থাকিতেন এবং ঠাকুরের উপদেশমত ভজন-সাধন করিতেন। ‘কথামৃত’ গ্রন্থে স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, ঠাকুর নিত্যগোপালকে নিত্যসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ এবং তাঁহার ভগবৎ-প্রেমে, ভাবাবস্থাদির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। নিত্যগোপালের সহিত তাঁহার মেলামেশা সম্বন্ধে একদিন জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, “তখন আমি রামবাবুর বাড়ীতে থাকি। নিত্যগোপাল বাবুও ওখানে থাকতেন। ঠাকুর তাঁকে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার লোক

বলতেন ; সেজন্য আমি তাঁর সাথে খুব মিশতাম এবং একসঙ্গে ভজনকীর্তন ও ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতাম। কীর্তনের সময় নিত্যগোপালের ভাব হত। এই করে প্রায় তিন-চার বছর মেলামেশা করেছি ; ঠাকুরও তা জানতেন। একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে বল্লেন, 'দেখ্ তারক, নিত্যগোপালের সঙ্গে বেশী মিশিস্ নি। ওর ভাব আলাদা—ও এখানকার লোক নয়।' ঠাকুরের ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন একেবারে বদলে গেল—তখন আর নিত্যগোপালের দিকে তাকাতেও ইচ্ছা হত না। এক সঙ্গে থাকতে হত বলে নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে কথাবার্তা বলতাম, কিন্তু মন একেবারে উঠে গিয়েছিল তাঁর উপর থোক। ঠাকুর যে শুধু বলতেন তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে মনও ঘুরিয়ে দিতেন। ঠাকুর নিত্যগোপালকে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিলেন।"

সাধনপন্থার পরিপুষ্টির জন্য কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে ঠাকুরের সতর্কীকরণ সম্বন্ধে মহাপুরুষজী আর একবার বলিয়াছিলেন, "একবার দক্ষিণেশ্বরে এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধু আসে —এরা রাধা মানে না, শুধু কৃষ্ণ মানে ; খাজাঞ্চীর ঘরের কাছে ছিল। মায়ের মন্দির, শিবমন্দির বা রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে প্রণাম করতেও আস্ত না। সাধুটীর ইচ্ছা ছিল, ওর কাছে আমরা যাই। এমনি বেশ চরিত্রবান সাধু ; কিন্তু তাদের ঐ মত—রাধা মানে না, শুকনো ভাব। ঠাকুর বলতেন, 'ওদের মত ভাল হতে পারে, তবে আমার প্রাণের মত নয়—ভগবানের লীলা চাই।' তাই আমি তার কাছে যাই নি।"

কাঁকুড়গাছিতে অবস্থানকালে ১৮৮৪ সালে তারকনাথ তীর্থ-ভ্রমণ-মানসে একবার শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া কিছুদিন ঐ পবিত্র ধামে

ভজনসাধনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া ঐ পবিত্র ধামের রজঃ, তিলকমাটি, ছোলাভাজা প্রসাদাদিসহ তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গেলেন। ভাবাবস্থায় পড়িয়া গিয়া ঠাকুরের হাতে আঘাত লাগিয়াছিল; সেজন্য তখনও তাঁহার হাতে 'বার' বাঁধা ছিল। তারক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চাঁদা মামা দেখতে গিয়ে পায়ে তার বেঁধে পড়ে গেছি, হাতে সামান্য চোট লেগেছে—এখনও তার জের চলছে। ওরা তো সব আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে দিয়েছে। একটু আরাম করে যে মাকে ডাকব তার জো নেই। এই সব বাঁধা-ছাঁদা খুলতে দেবে না। বল তো, এমন করে বাঁধলে কি আর মাকে ডাকতে ইচ্ছা হয়? অনেক সময় মনে হয় —দুত্তোর, বাঁধাবাঁধি সব কেটে বেরিয়ে যাই, আবার মনে হয়—না; এও একরকমের বেশ খেলা চলছে—এরি মাঝেও রসকস আছে।" এই সকল কথা শুনিয়া তারকনাথ বলিলেন, "আপনি তো ইচ্ছা করিলেই ভাল হয়ে যেতে পারেন।" "এ্যাঁ, ইচ্ছা করলেই ভাল হয়ে যেতে পারি?"—এই কথা বলিয়া ঠাকুর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "না, রোগের ভোগই ভাল, এখন যারা সব কামনা-বাসনা নিয়ে এখানে আস্‌ছে তারা এই দেখে ভেগে যাবে, আমায় আর বেশী বিরক্ত করতে চাইবে না।" এবং পরক্ষণেই "মা, এ বেশ কৌশল করেছিস্ গো মা!" বলিয়াই মত্ত হইয়া গান ধরিলেন এবং গান গাহিতে গাহিতে একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন[১]। ঠাকুরের হাতভাঙ্গা-অবস্থায় তারকনাথ অন্য একদিনও তাঁহার নিকট

[১] উপরোক্ত ঘটনাটি 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিপ্রসঙ্গ'-অবলম্বনে লিখিত।

গিয়াছিলেন। ঠাকুর একটী ছোটছেলের মত ধীরে ধীরে হাঁটিতে হাঁটিতে ভাবস্থ হইয়া জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, "মা, তোমার তো আর দেহধারণ করতে হল না! দেহধারণের কষ্ট তো বুঝ্‌লে না!" সে দিন কি ঠাকুর তারকনাথের মন পরীক্ষা করিতেছিলেন? সাধু-মহাত্মাদের শারীরিক ব্যাধি সম্বন্ধে ভক্তদের মধ্যে চিরকালই বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যেও এরূপ মতভেদ ছিল। মহাপুরুষজী প্রথমাবধিই এই বিষয়ে কিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস 'কথামৃতে' পাওয়া যায় (৫ম ভাগ, ১৭৫ পৃষ্ঠা)। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিলেন, "আচ্ছা, লোকে বলে, ইনি যদি এত (এত সাধু,) তবে রোগ হয় কেন?" তারক উত্তর দিলেন, "ভগবানদাস বাবাজী অনেক দিন রোগে শয্যাগত হয়ে ছিলেন।" অর্থাৎ তারকের মতে রোগাদি শরীরের ধর্ম—উহা প্রাকৃতিক নিয়মেই হইয়া থাকে; রোগ হওয়া বা না হওয়া কিছুই সাধুত্বের মাপকাঠি নহে। ফলতঃ ঠাকুরের হাতভাঙ্গা বা গলরোগ হওয়ায় তারকনাথের শ্রদ্ধা ও প্রেম-পরিপ্লুত মন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আরও নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

ঠাকুরের শারিরীক গঠন এবং আহারাদির প্রসঙ্গে একদিন মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, "তাঁর হাত খুবই নরম ছিল। হাত কেন তাঁর সর্বাঙ্গই খুব কোমল ছিল। এক খানা কি বড় জোর দু খানা ছোট প্রসাদী লুচী তাঁর রাত্রের আহার। তার সঙ্গে একটু সুজির পায়েস। খাঁটি দুধ হজম হত না বলে, দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে অল্প সুজি ফেলে পায়েসের মতন করে দেওয়া হত। সেই পায়েসই একটু খেতেন। তবে মাঝে মাঝে ক্ষিদে পেলে প্রায়ই একটু-আধটু কিছু-না-কিছু

খেতেন। শিকেতে সন্দেশ ইত্যাদি তোলা থাকত। ক্ষিদে পেলে তাই থেকে একটি-দুটি সন্দেশ খেতেন। কখনও বা একটি সন্দেশের আধখানা খেয়ে বাকী আধখানা সামনে যে থাকত, তাকে দিয়ে দিতেন। তাঁর সবই ছেলেমানুষের মতন ছিল—ঠিক যেন ছেলেমানুষটি!”

অন্য একদিন ঠাকুরের সমাধি-অবস্থা-বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, “দেখে তাঁর সমাধি কি করে বুঝবে? তাঁর কখন না সমাধি হত? শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়—সব সময়ই তো সমাধি তাঁর লেগেই থাকত। একটি হিন্দুস্থানী সাধু রামবাবুর বাগানের (যোগোদ্যানের) নিকট এসে কিছুদিন ছিল। সাধুটি বেশ শান্তপ্রকৃতির, কথাবার্তা খুব কম বলত। একটি গাছতলায় বসে থাকত—রামবাবুর বাগানে যেতে রাস্তায় পড়ে। রামবাবু বোধ হয় তাকে খাবার-দাবার দিতেন। তিনি ঠাকুরের কাছে সাধুটির কথা বললেন; ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, “তা একদিন তাকে নিয়ে এসো।” তারপর রামবাবু গাড়ী করে একদিন সাধুটিকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এলেন। ঠাকুর তাকে আদর করে ছোট খাটটির ওপর বসালেন—নিজেও একপাশে বসলেন। ঈশ্বরীয় আলাপ আরম্ভ হল—ক্রমে সবিকল্প সমাধি—নির্বিকল্প সমাধির কথা উঠল। ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধির কথা বলতে বলতে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন—একটি পা খাটের বাইরে ঝুলছে আর একটি পা খাটের ওপর রয়েছে—এ অবস্থায় একেবারে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে গেলেন। সাধুটি ভাবলে যে, ঠাকুর বুঝি এখন ধ্যান করবেন। ঠাকুর এলোমেলো হয়ে বসে রয়েছেন দেখে সাধুটি ঠাকুরকে ঠিক হয়ে বসে ধ্যান করবার জন্য বলতে লাগল, “আসন করকে—ঠিকসে বৈঠ।” এইরূপ বার বার বল্ছে কিন্তু সেকথা শুন্‌বে কে? ঠাকুরের মন তখন শরীর

ছেড়ে চলে গেছে! কাজেই ঠাকুরের কখন কি অবস্থায় সমাধি হত, কি করে বোঝা যাবে?”

* * *

অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “আমার পাঁচফুলের সাজি।” পার্ষদসঙ্ঘরূপ এই অপূর্ব ‘সাজি’র প্রত্যেকটি পুষ্পেরই একটি নিজস্ব সৌন্দর্য ও সৌরভের বৈশিষ্ট্য ছিল। অদ্ভুত মালী যখন উহাদিগকে একত্রিত করিলেন তখন সেই পুষ্পগুচ্ছের শোভা হইল অতুলনীয়। উহার স্নিগ্ধ সৌরভ পৃথিবীকে আমোদিত করিল। সর্ব-ভাবের, সর্ব-ধর্মের মহাসমন্বয়রূপ যুগপ্রয়োজন-সাধনের জন্যই বোধ হয় যুগগুরু ঠাকুরকে এমনভাবে পুষ্প-সঞ্চয়ন করিতে হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসঙ্গী এই সকল মহাপুরুষের ত্যাগতপস্যাপূর্ণ জীবনের সম্পূর্ণ ঘটনাবলী জগতে চিরকালই অপ্রকাশিত রহিয়া যাইবে। তাঁহারা সকলেই আসিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সাত্ত্বিকভাবে— বাহ্যিক অভিব্যক্তি গোপন রাখিয়া। কি ভাবে এই সকল মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমিক বিকাশ সাধিত হইয়াছিল — কত দুঃখ, বিপদ, নিরাশা ও ব্যর্থতার নিদারুণ আঘাত সহ্য করিয়া, কত হিমালয়প্রমাণ নির্যাতন, উপেক্ষা ও বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগের জীবন সিদ্ধির পূর্ণতায় মহিমমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাইবার উপায় নাই।

ঠাকুরের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের যে সম্বন্ধ ছিল তাহাও বাস্তবিকই অদ্ভুত। প্রথম পরিচয়ে তিনি কাহাকেও পিতৃপরিচয়াদি পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতেন না। তিনি তাঁহার সূক্ষ্মযোগদৃষ্টিসহায়ে দেখিতেন কে কোন্ আধ্যাত্মিক স্তরের বা কোন্ ‘ঘরের’ লোক। উহা হইতেই তিনি

ঠিক করিয়া লইতেন কাহাকে কি ভাবে বা কোন্ পথে চালিত করিতে হইবে এবং তজ্জন্য বিস্তার করিতেন তাঁহার স্বর্গীয় অহৈতুকী ভালবাসার ঐন্দ্রজালিক প্রভাব—যাহার ফলে প্রত্যেকেরই মনে হইত ইনি যেন আপনার হইতেও আপনার। আর কৃষ্ণসোহাগিনী গোপীগণের প্রত্যেকেরই যেমন ধারণা ছিল যে তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেও প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে ঠাকুর তাঁহাকেই সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে ভালবাসেন। ঐ বিষয়ের অনুবৃত্তি করিয়া মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন, "আমরা যখন তাঁর কাছে যেতাম, তখন তিনি অবতার কিনা, এসব ভাবনা কখনও মনে আস্ত না, বা তিনি যে সমগ্র জগতে এমন একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটাবেন তাও আমারা ধারণা করতে পারি নি। কে জানে বাবা তখন যে ঐ চোদ্দপোয়া মানুষটিকে নিয়ে সারা দুনিয়ায় এমন মাতামাতি হবে? তিনি আমাদের ভালবাসতেন, সেই ভালবাসার টানেই আমরা তাঁর কাছে যেতাম। ঠাকুরের ভালবাসার কথা কি আর বলব? সে এক অনির্বচনীয় বস্তু! ছেলেবেলাতে তো কেবল বাপমায়ের ভালবাসাই জানতাম এবং সে ভালবাসার চেয়ে আর বেশী যে কিছু থাকতে পারে সে ধারণাও ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর ভালবাসা যখন পেলাম তখন মা-বাপের ভালবাসা অতি তুচ্ছ বলে মনে হল। তাঁর কাছে এসে মনে হত যেন ঠিক আপনার জায়গায় এসে পৌঁছেছি—এতদিন যেন পরের স্থানে বেড়াচ্ছিলাম।"

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর সাধনপীঠে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর বিভিন্ন ধর্মের নানা মতের কঠোর সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিলেন। পরে দিনের পর দিন করিয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল। তিনি সমাধির আনন্দে

মগ্ন—কেবল আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ! বেশীর ভাগই নির্বিকল্প সমাধি, কখনও অল্পকালের জন্য সবিকল্প অবস্থা। এইরূপে তিনি নানা ভাবে সমাধির আনন্দ সম্ভোগ করিয়া আত্মারাম হইয়া রহিলেন। দেহের জ্ঞান একপ্রকার লুপ্ত হইয়াছিল; আহার-নিদ্রা কি করিয়া সম্ভব! শরীর অতিশয় ক্ষীণ, কঙ্কালসার—অন্নময় দেহ শুষ্ক পত্রের ন্যায় ঝড়িয়া পড়িবার উপক্রম! এমন সময় দক্ষিণেশ্বরে যেন দৈব-প্রেরিত হইয়া একজন সন্ন্যাসী কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঠাকুরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সেই ব্রহ্মানন্দ-বিলাসের শরীর কোন প্রকারে রক্ষা করিতে পারিলে জগতের অভূতপূর্ব কল্যাণ হইবে। তখন হইতে সেই অজ্ঞাত সন্ন্যাসী ঠাকুরের শরীররক্ষার জন্য যত্নবান হইলেন। যষ্টিদ্বারা প্রহার পর্যন্ত করিয়া তিনি তাঁহার মনকে কিঞ্চিৎ দেহজ্ঞান-ভূমিতে নামাইবার চেষ্টা করিতেন। কিঞ্চিন্মাত্র হুঁশ হইলেই সামান্য দুধ বা অন্য খাদ্যদ্রব্য ঠাকুরের মুখে গুঁজিয়া দিতেন। কখনও ঐ আহার্য উদরে প্রবেশ করিত—কখনও বা মুখ গলাইয়া পড়িয়া যাইত। এইভাবে কিছুদিন চলিবার পর ঠাকুর একদিন জগন্মাতার বিচিত্র বাণী শুনিতে পাইলেন, "লোক-কল্যাণের জন্য তুই ভাবমুখে থাক্।" পরে জগন্মাতার ঐশী শক্তিই তাঁহার শরীরমন-অবলম্বনে সমগ্র জগতে কিরূপে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ তুলিবে তিনি তাহার ইঙ্গিত এবং যুগধর্ম-সংস্থাপনের কার্যে তাঁহার সহায়করূপে যাঁহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদেরও পরিচয় পাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমাহিত মনে 'বিশ্বহিতৈষণার' ভাব জাগ্রত হইল। জগজ্জননীও লীলাচ্ছলে ঠাকুরের দেহে কঠিন রক্ত-আমাশয়রূপ ব্যাধির সঞ্চার করিলেন—যাহাতে ধীরে ধীরে তাঁহার মন 'আমি-আমার' রাজ্যে নামিয়া

আসে। সেই কঠিন ব্যাধিতে প্রায় ছয়মাস কাল ভুগিবার পরে মন ক্রমে দেহে নামিয়া আসিল। তখন হইতে তিনি 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' —এই ভাব আশ্রয় করিয়া ভগবদিচ্ছায় জগতের হিতার্থে 'মহদ্ধর্ম'-প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা হইল 'ধর্মসঙ্ঘ'-সংগঠন। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাঁহার ভাবী বার্তাবহ-গণের জীবন অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন—আর সকলের সম্মুখে ধরিলেন তাঁহার পরম পবিত্র 'কামকাঞ্চন-বর্জিত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ' জীবনাদর্শ। ঐ যুগধর্মসংস্থাপনের শেষ কার্য সমাপ্ত করিবার জন্যই যেন সেই দৈবী শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে কঠিন গলরোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঠাকুরও স্বীয় গলরোগের গূঢ়রহস্য জানিয়া তাঁহার সেই 'ধর্মসঙ্ঘ'-গঠনকার্য-সমাপনে তৎপর হইলেন এবং উৎসর্গীকৃত প্রাণগুলিকে অপরিসীম স্নেহের বন্ধনে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সেই ভাবী উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে তাঁহার আধ্যাত্মিক রত্নভাণ্ডারের রত্নরাজি অকাতরে বিতরণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি যখন বুঝিলেন যে তাঁহার দেহধারণের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, তখন ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শ্যামপুকুরে প্রায় তিন মাসকাল অবস্থান ও চিকিৎসাদিতে ঠাকুরের গলরোগের উপশম না হওয়ায় চিকিৎসকগণের নির্দেশমত তাঁহাকে কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে আনা হয়। একদিকে ঠাকুরের কঠিন অসুখ, অন্যদিকে ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে শ্রীভগবান-লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা। ঠাকুরের শরীর তখন এমনই অসুস্থ যে দিবারাত্র সর্বক্ষণ সেবার প্রয়োজন। সেই সেবার সম্পূর্ণ ভার লইলেন নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীনে ত্যাগী যুবক ভক্তবৃন্দ। সমস্ত খরচপত্র ও ঔষধপথ্যাদি-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেন গৃহী ভক্তগণ

তারকনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিতে মাঝে মাঝে শ্যামপুকুর যাইতেন, কিন্তু ঠাকুরকে যখন কাশীপুরে আনা হইল তখন হইতে নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ যুবক ভক্তগণের সঙ্গে তিনিও ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে একদিন জনৈক ভক্ত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "strain বা কষ্ট বলে আমাদের তখন কিছুই মনে হত না। আমরা একভাবে তখন দিন কাটাচ্ছি। ঠাকুরের সেবা ও ধ্যানজপাদিতে এত মত্ত হয়ে থাকতাম যে দিনরাত কোন্ দিক দিয়ে যেত তার হুঁশই অনেক সময় থাকত না। সে এক সময়ই গেছে।"

ঐ দেব-মানবের সেবার সঙ্গে নূতন ভক্তগণের যে তীব্র সাধন-ভজন চলিয়াছিল তাহা সত্যই অদ্ভুত। রাত্রে ধুনি জ্বালিয়া জপধ্যান, কখনও বা সংকীর্তন, শাস্ত্রচর্চা, সৎপ্রসঙ্গ—এইভাবে দিবারাত্র ঈশ্বর-চিন্তার একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা যেন লাগিয়াই ছিল। কখনও বা পঞ্চবটী-মূলে, বেলতলায় বা কোন শ্মশানে সারারাত্রি উগ্র তপশ্চর্যায় অতিবাহিত হইত। ঠাকুরও ভজনসাধন সম্বন্ধে সকলকে খুবই উৎসাহিত করিতেন এবং পৃথকভাবে প্রত্যেককে ডাকিয়া ধ্যান ও দর্শনাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। "কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি"—সকলের হৃদয়বীণায় যেন ঝঙ্কৃত হইতেছিল এই একমাত্র সুর। ঠাকুরের দেহের হৃদয়-বিদারক যাতনা যুবকবৃন্দের প্রাণে দেহের অনিত্যত্ববোধ আরও যেন গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে ভূমার সন্ধানে এককালে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সময় বুঝিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দিব্যস্পর্শে জ্বালিয়া দিলেন প্রত্যেকের হৃদয়-দেউলে ত্যাগের সমুজ্জ্বল প্রদীপ। তিনি জানিতেন—যত বুকফাটা আর্তনাদ, তত বেশী আনন্দ—পরে—পরে। তিনি নিজেই তো জগন্মাতার অদর্শনে ব্যাকুলপ্রাণে "মা দেখা দাও, দেখা দাও" বলিয়া রোদন

করিতে করিতে মাটিতে মুখ ঘষড়াইয়া উহা রক্তাক্ত করিতেন। সেই জন্যই কখনও বলিতেন, "আমি ষোল টাং করেছি, তোরা এক টাং কর্।"

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী ঠাকুর 'কল্পতরু' হইয়া গৃহস্থ ভক্তগণকে কৃপা করিয়াছিলেন।[১] এই প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন—"ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে কেউই সে সময় ওখানে উপস্থিত ছিলেন না। রাতজাগা হ'ত বলে আমরা দুপুরের খাওয়ার পর প্রায় সকলেই খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতাম। সেদিনও নীচের হলঘরের পাশে ছোট ঘরটিতে আমরা ঘুমুচ্ছিলাম।... হঠাৎ গোলমালে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছুটে এসে দেখি যে ভক্তেরা সকলে ঠাকুরকে ঘিরে উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করছেন; আর তিনি মধুর হাসিমুখে সস্নেহে ভক্তদের দিকে তাকিয়ে আছেন।... পরে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করে সব ব্যাপার জানা গেল।"

ঠাকুর একদিকে ভক্তদিগকে যেমন কৃপা করিলেন, অপর দিকে তেমনি আর একটি বিশেষ ঘটনা-অবলম্বনে ত্যাগীদের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্যের ভাবী জীবনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের সাধনমার্গ সুগম করিয়া দিলেন। ঐ সময়ে 'বুড়ো গোপাল' (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) উত্তরাখণ্ডে কেদারবদ্রি-দর্শনান্তে কাশীপুরে ফিরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সাধুভোজনাদি করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "কোথায় সাধু খুঁজ্বি?—এখানেই সব রয়েছে। এই ছোকরাদের খাওয়ালেই হবে।" গোপাল তাহাই করিলেন এবং তৎসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের

---

১ বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-দিব্যভাব' দ্রষ্টব্য।

ইঙ্গিতে মালা-চন্দন ও কয়েকখানি গেরুয়াবস্ত্র আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে ধরিলেন। ঠাকুর তাঁহার একাদশ জন ত্যাগী সন্তানকে—নরেন্দ্র, রাখাল যোগীন, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, গোপাল, কালী ও লাটুকে এক একখানি বস্ত্র ও তৎসহ মালাচন্দন দিলেন এবং উদ্বৃত্ত একখানি বস্ত্র ভক্তচূড়ামণি গিরিশচন্দ্রের জন্য রাখিয়া দিলেন।[১] ফলতঃ সেই দিন হইতেই এই একাদশ জন শিষ্য সন্ন্যাসে দীক্ষিত হইলেন, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসগ্রহণ অনেক পরে হইয়াছিল।

ঠাকুরের ঐ সময়কার কার্যকলাপের মধ্যে অন্যতম ছিল তাঁহার ত্যাগী সন্তানদিগকে একত্রিত করিয়া ভাবী সঙ্ঘের সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা। তিনি প্রত্যহ নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া বিবিধ উপদেশ দিতেন এবং নরেন্দ্রনাথও তদনুযায়ী সকলের মধ্যে একটি গভীর প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় তখন হইতেই সকলে নরেন্দ্রনাথকে নেতার আসনে বসাইয়াছিলেন। এই সময়ে মহাপুরুষজী নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এক অদ্ভুত দর্শন লাভ করেন। কাশীপুর বাগানে একটি বড় মশারির মধ্যে তিনি নরেন্দ্রনাথের পার্শ্বেই শুইয়াছিলেন। গভীর রাত্রে দেখিতে পাইলেন যে নরেন্দ্রনাথের শরীরের চারিদিকে ৺বীরেশ্বর শিবের ন্যায় বাল-শিবমূর্তিসকল বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের অঙ্গচ্ছটায় চারিদিক আলোকিত হইয়া গিয়াছে। পরের দিন সকালে তারকনাথ পূর্বরাত্রের ঘটনা নরেন্দ্রনাথকে বলিতে তিনি শুনিয়া খুবই আমোদিত হইয়াছিলেন।

১ ইহা সম্ভবতঃ ১৮৮৬ সালের মধ্যভাগে ঘটিয়াছিল; কারণ ৺কেদারবদরি যাত্রা সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালেই হইয়া থাকে। পূর্ববৎসর ইহা হওয়া অসম্ভব; কারণ ঠাকুর কাশীপুরে আসেন অগ্রহায়ণের শেষে।

কাশীপুরে অবস্থানকালে ত্যাগবৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ তথাগতের দেবোপম জীবন যুবক ভক্তদের প্রাণে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ নিজে ঐভাবে এতদূর ভাবিত হইয়াছিলেন যে, সর্বক্ষণ বুদ্ধদেবের অনুপম জীবনী ও মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা ও বিচারাদিতে মত্ত থাকিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনাদর্শ নিজ চরিত্রে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিতেন। নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে তারকনাথ প্রভৃতি অনেকেও বৌদ্ধধর্ম্মের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ধ্যানধারণা প্রভৃতিও তদনুরূপ হইতেছিল। ভগবানের সাকার সগুণ ভাব মনকে নির্বিষয় করার প্রতিকূল বলিয়া তাঁহারা তখন নির্গুণভাবেই ঝোঁক দিয়াছিলেন। ঐ বিষয় লইয়া খুব আলাপ-আলোচনা ও তর্ক হইত।

নরেন্দ্রনাথ নিজে বেশী বলিতেন না, তারকনাথকে তর্কে লাগাইয়া দিয়া মজা করিতেন। তারকনাথ তর্কচ্ছলে অনেক সময় এমনও বলিয়া ফেলিতেন, "শরীরবুদ্ধি আনাও অন্যায়, ওতে ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটে, ঈশ্বরের ভাবনা মনকে নির্বিষয় হতে দেয় না।" আর উহা শুধু তাঁহার মুখের কথাই ছিল না, তিনি ধ্যানাদিও ঐ ভাবেই করিতেন। ভক্তেরা নরেন্দ্র প্রভৃতির এইরূপ সাকারভাব-খণ্ডনে স্বভাবতঃই খুব মর্মাহত হইতেন। একদিন তাঁহারা ঠাকুরকেও তাহা জানাইলেন। শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ওরা যা বল্‌ছে, তা ঠিকই বল্‌ছে। একরকম অবস্থা আসে যখন সাধক ভগবান মানে না।"

বুদ্ধদেবের ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা, সর্বোপরি তাঁহার বিশ্বপ্লাবী প্রেমমাধুর্য তারকনাথকে বিশেষ করিয়া মুগ্ধ করিয়াছিল। ঐ অনুপ্রেরণা ক্রমে এত প্রবল আকার ধারণ করিল যে তাঁহার হৃদয় তথাগতের সাধনা ও সিদ্ধির বেদীমূলে গমন করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

আর তেমনই হইয়াছিল নরেন্দ্রনাথের মনের অবস্থা। দুই গুরুভ্রাতার মধ্যে পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। নরেন্দ্র, তারক ও কালী—এই তিন জন অপর সকলের অজ্ঞাতসারে একদিন রাত্রিতে সন্ন্যাসীর বেশে বুদ্ধগয়াদর্শনে বাহির হইয়া পড়িলেন। গয়া ষ্টেশন হইতে প্রায় সাত মাইল হাঁটিয়া পুণ্যতোয়া ফল্গুতে স্নানাদিসমাপনান্তে তাঁহারা বোধিদ্রুমমূলে উপনীত হইলেন। এই সেই স্থান যথায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে সর্বত্যাগী গৌতম 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্'-সঙ্কল্পে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া নির্বাণের জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধভাবে পরিপূর্ণ ঐ পবিত্র স্থানে তিন জনেই ধ্যানে বসিয়া গেলেন। তিন দিন সেই সিদ্ধাসনে তাঁহারা ধ্যানাদিতে কাটাইয়াছিলেন। তৃতীয় দিন গভীর রাত্রে ঝিল্লি-রবাবৃত নিথর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁহারা পাশাপাশি ধ্যানস্থ, এমন সময় নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ ভাবাবস্থায় উচ্চ ক্রন্দন করিতে করিতে দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত তারকনাথকে জড়াইয়া ধরিলেন। কিছুকাল পরে তিনি ধীরে ধীরে সহজাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং পুনরায় আরও গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়েন। পরদিবস তারকনাথ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ ঐকথার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "মনে একটা গভীর বেদনা অনুভব করেছিলুম—সবই তো রয়েছে, এখানে সেই বুদ্ধদেবের ভাব ঘনীভূত হয়ে আছে। তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য, তাঁর সেই মহাপ্রাণতা, তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতা সবই তো রয়েছে; কিন্তু তিনি কোথায়? এসব ভাবের ঘনীভূত বুদ্ধদেবের বিরহ এত তীব্র বোধ হতে লাগল যে আর সামলাতে পারলুম না—তাই কেঁদে উঠে আপনাকে জড়িয়ে ধরেছিলুম।"

তিন-চারি দিন গভীর ধ্যান-ধারণাদিতে কাটইয়া তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা কথঞ্চিৎ শান্ত হইল এবং সঙ্গেসঙ্গে তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন

শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য। এদিকে কাশীপুরে বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথের অদর্শনে অন্যান্য সকল গুরুভ্রাতাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুর কিন্তু নিজদেহ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "এখান ছেড়ে কোথাও থাক্‌তে পারবে না—আস্‌তেই হবে এখানে।" কয়েক দিন পরেই তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঠাকুর খুবই আনন্দিত হইলেন। নিজের একটি অঙ্গুলি চারিদিকে ঘুরাইয়া পরে বৃদ্ধাঙ্গুলিটি নাড়িয়া বলিলেন, "কোথাও কিছু নেই।" পরে নিজের শরীরের দিকে দেখাইয়া কহিলেন, "এবার সব এখানে। আর যেখানেই যাও না কেন, কোথাও কিছু পাবে না। এখানকার সব দোর খোলা।"

পিতা জানেন, সন্তান যাহাই করুক না কেন পিতৃস্নেহ তাহাকে সর্বদাই স্বগৃহে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই জন্য তাঁহার সন্তানদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন। আর এই অসম্ভব রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার সেই সংশয়হীন প্রেম নানাভাবে প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপার-অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করিত। ঘটনার দিক দিয়া তাহা অকিঞ্চিৎকর হইলেও উহার প্রভাব ছিল অতীব গভীর। কাশীপুর বাগানে কিছুদিন পাচকের অসুখ হওয়ায় ত্যাগী সেবকেরাই পালা করিয়া রান্না করিতেন। সেদিন রাত্রে তারকনাথের পালা। সাধারণ রান্না—ভাত, রুটি, ডাল, চচ্চড়ি। চচ্চড়িতে যখন তিনি ফোড়ন দিয়াছেন, তখন ঠাকুর উপর হইতে উহার গন্ধ পাইয়া জনৈক সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, কি রান্না হচ্ছে রে তোদের? বা! চমৎকার ফোড়নের গন্ধ ছেড়েছে তো! কে রাঁধছে?" তারকনাথ রাঁধিতেছেন জানিয়া তিনি বলিলেন, "যা, আমার জন্য একটু নিয়ে আয়।" তখন ঠাকুরের গলার অসুখ—কিছুই খাইতে পারেন না। সামান্য দুধ-সুজি সিদ্ধ খান—তাহাও অতি কষ্টে। কিন্তু সেই চচ্চড়ি তিনি সেদিন একটু চাহিয়া খাইলেন।

বরাহনগর মঠ ও পরিব্রজ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানবলীলা সম্বরণ করিয়া[১] নিত্যধামে চলিয়া যাইবার তিন মাসের মধ্যেই ঠাকুরের প্রত্যাদেশে এবং নরেন্দ্রনাথের আপ্রাণ চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে বরাহনগর মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। কাশীপুর শ্মশানঘাটে ঠাকুরের পূতদেহ-সংকারের পরে তাঁহার দেহাবশিষ্ট ভস্মাস্থি একটি কলসীতে পুরিয়া সেই রাত্রেই শশী উহা কাশীপুর বাগানে আনিয়া ঠাকুর যে বিছানায় শয়ন করিতেন তাহার উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। যুবকভক্তগণ সকলেই শোকে মৃতপ্রায় হইয়া ঠাকুরের শূন্যশয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু 'ততঃ কিম্?' দুর্বহ শোকে কেহই ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে

---

১ শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগ সম্বন্ধে মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের যে দেহত্যাগ হয়েছিল প্রথমটায় আমরা কেউই বুঝতে পারি নি। আমরা মনে করেছিলাম যে, ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছেন, কারণ তাঁর কখনও কখনও এমন গভীর সমাধি হত যে দু-তিন দিন পর্য্যন্ত সে অবস্থায় থাকতেন। তাই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছেন মনে করে আমরা খুব নাম শোনাতে লাগলাম। এই ভাবে সারা রাত কেটে গেল, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। পরদিন সকালে ডাক্তার (মহেন্দ্র) সরকারকে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে নানারকম পরীক্ষা করে বললেন যে, ঠাকুর দেহরক্ষা করেছেন—জীবনের কোনরকম চিহ্ন তিনি পেলেন না। তিনি ঠাকুরের ফটো রাখতে আমাদের বললেন। আমরা তাই করলাম, তারপর বেলা ২টা ২॥টার সময় কাশীপুর শ্মশানে তাঁর দেহের সংকার করা হয়।" (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রবিবার রাত্রে ঠাকুর মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন)।

পারিলেন না। প্রাণপ্রতিম ঠাকুরের আদর্শনে হৃদয় শূন্য, বুদ্ধি জড়ত্বপ্রাপ্ত —অন্য কিছু ভাবিবার মত তাঁহাদিগের মনের অবস্থা তখন নয়। এদিকে শোকে মুহ্যমান মাতাঠাকুরাণী সেই রাত্রে যথারীতি বিধবার বেশ ধারণ করিবার জন্য যখন কাঁদিতে কাঁদিতে হাতের বালা খুলিতেছিলেন তখন ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বালা খুলিতে বাধা দিয়া বলিলেন, "সে কি গো! তোমরা কাঁদ্‌ছ কেন? আমি গেছি কোথায়? এই তো রয়েছি। শুধ্ এ ঘর আর ও ঘর বইতো নয়!" এইরূপে অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া এবং তাঁহার সপ্রেম সম্ভাষণ শুনিয়া মাতাঠাকুরাণীর শোকাবেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছিল। তাঁহার নির্দেশমত হাতের বালা তিনি আর খুলিলেন না এবং ঐ দর্শনের কথা গোলাপ-মা প্রভৃতিকে বলিলেন। সকালে গোলাপ-মা ঠাকুরের আবির্ভাব ও মাতাঠাকুরাণীর সহিত কথাবলা প্রভৃতি ঘটনা সকলের নিকট বিবৃত করিলে, সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন যে, ঠাকুরের স্থূলদেহনাশের সঙ্গেসঙ্গেই সব শেষ হইয়া যায় নাই, তিনি এখনও দিব্য শরীরে তাঁহাদিগেরই সঙ্গে আছেন। এই ভাব ও অনুভূতি সকলের শোকবিক্ষুব্ধ প্রাণে কথঞ্চিৎ স্থৈর্য আনিয়া তাঁহাদের 'ইতিকর্তব্যতা' সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়াছিল। যুবকভক্তগণ একবাক্যে বলিলেন, "তাঁহার সেবা যেমন চলছিল, তেমনই চলবে" এবং সঙ্গেসঙ্গে 'জয় গুরু মহারাজজীকী জয়' ধ্বনিতে শোকস্তব্ধ উদ্যানবাড়ীতে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও সর্বান্তঃকরণে ঐ ভাব অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহারই আদেশক্রমে যোগীন ও লাটু চলিয়া গেলেন কলিকাতায় ভোগরাগের সকল ব্যবস্থা করিবার জন্য। বাগানে রহিলেন শশী, তারক, নিরঞ্জন, বুড়ো গোপাল প্রভৃতি। মধ্যাহ্নে ঠাকুরঘরে পূজা ও ভোগ নিবেদন

করা হইল—পরে সকলে মিলিয়া কীর্তন করিলেন। এইরূপে ঠাকুরের দেহান্তে তাঁহার পূজা ও ভোগরাগাদির প্রথম প্রবর্তন শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারাই হইয়াছিল। সন্ধ্যায় সকল যুবকভক্তই কাশীপুরে মিলিত হইয়াছিলেন। রাত্রিতেও ঠাকুরকে সুজির পায়েস ভোগ দেওয়া হইল, পরে সকলে মিলিয়া খুব কীর্তন করিলেন।

পাঁচ-ছয় দিন পরেই শ্রীশ্রীমাকে বলরাম বাবু বাগবাজারে নিজের আলয়ে লইয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিষপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁহার দেহাবশিষ্ট ভস্মাস্থির নিত্য পূজাদির জন্য কাশীপুরে রহিলেন তারকনাথ, লাটু ও (বুড়ো) গোপাল। অন্যান্য ভক্তগণ দিনের বেলায় কাশীপুরে আসিতেন এবং ভজন, কীর্তন ও ঠাকুরের প্রসঙ্গাদি করিয়া রাত্রে বাড়ীতে ফিরিতেন। তখন নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুবকভক্তেরা পরামর্শ করিলেন যে, গঙ্গাতীরে কোন স্থানে 'অস্থি' সমাহিত করিতে হইবে, কারণ ঠাকুরের তাহাই অভিমত ছিল। কিন্তু তেমন স্থান খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এদিকে কাশীপুর বাগানবাটীর ভাড়ার নির্ধারিত চুক্তির দিন অতিবাহিতপ্রায়। রাম বাবু প্রভৃতি প্রবীণ ভক্তগণ প্রস্তাব করিলেন চুক্তির কয়েকটা দিন শেষ হইলেই ঠাকুরের ভস্মাস্থি কাঁকুড়গাছি বাগানে সমাহিত করিয়া সেখানেই যথাবিধি সেবাপূজাদির ব্যবস্থা করা হইবে—যুবক ভক্তদিগের মধ্যে যদি কেহ ইচ্ছা করেন তো ঐ স্থানে থাকিতে পারিবেন। এই প্রস্তাবে যুবক ভক্তগণের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল বিশেষতঃ এই ভাবিয়া যে, তাহা হইলে ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করা হয় না। তাঁহারা এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং ঠাকুরের ভস্মাস্থি কিছুতেই দিবেন না বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। অথচ তাঁহারা নিরুপায়, নিরাশ্রয়—শ্রীগুরুদেবের সেবা-পূজাদির ব্যয়ভার বহন করিবার তাঁহাদের সামর্থ্য কোথায়? তাঁহারা শ্রীভগবানকে হৃদয়ের গভীর

বেদনা জানাইয়া মহা অশান্ত প্রাণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথের প্রশংসনীয় উদারতায় ও মহত্ত্বে 'ভস্মাস্থি'-ব্যাপারের একটা সুমীমাংসা হইয়া গেল।

জন্মাষ্টমীর দিন অর্থাৎ ঠাকুরের দেহত্যাগের সাত দিন পরে, সন্ন্যাসী ও গৃহী সকল ভক্ত মিলিত হইয়া ভস্মাস্থির কিয়দংশ কাঁকুড়গাছি বাগানে যথাবিধি সমাহিত করিলেন। আগষ্ট মাসের আর বাকী কয়দিন কাশীপুরে রহিলেন তারকনাথ ও গোপাল। লাটু শ্রীগুরুদেবের বিরহে এত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার মন আর কিছুতেই ঐ বাগানে থাকিতে চাহিল না। আগষ্ট মাস শেষ হইবার সঙ্গেসঙ্গেই কাশীপুর বাগান ছাড়িয়া দিতে হইল। ঠাকুরের ভস্মাস্থির বাকী অংশ সঙ্গোপনে পূজিত হইতে লাগিল বলরাম বাবুর ঠাকুরঘরে। ঠাকুরের ব্যবহৃত সব জিনিষপত্রও সেখানেই আনীত হইল।[১]

৩১শে আগষ্ট শ্রীশ্রীমা শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে যাত্রা করিলেন ; সঙ্গে গেলেন যোগীন, কালী, লাটু এবং গোলাপ-মা প্রভৃতি কয়েকজন স্ত্রীভক্ত। বলরাম বাবুই মায়ের বৃন্দাবনবাসের ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়াছিলেন। তারকনাথও কয়েক দিনের মধ্যেই বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও তাঁহার সঙ্গিগণের সহিতই ছিলেন কিনা তাহা সঠিক জানা যায় নাই। শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া প্রায় একমাস পরে তিনি ৺কাশীধামে ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অসমাপ্ত পড়াশুনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশীপুর বাগানে

১ 'লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা'তে পাওয়া যায় যে, বলরাম বাবুর বাড়ী হইতে ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিষ কিছু চুরি হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণপাদমূলে যে যুগসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা কি এত সহজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে? নরেন্দ্রনাথের উপরেই ঠাকুর দেহরক্ষার প্রাক্কালে তাঁহার যুগকার্যের সহায়ক যুবক ভক্তগণের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি শ্রীগুরুদেবের আদিষ্ট কর্ম অসম্পূর্ণ দেখিয়া প্রাণে মর্মন্তুদ বেদনা লইয়া অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন। কি ভাবে সকলকে একত্রিত করিয়া একসঙ্গে ত্যাগের পথে চলা যায়—ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র চিন্তা। এই সময়ে একদিন ভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্রকে[১] ঠাকুর দর্শন দিয়া বলিলেন, "সুরেন্দ্র, তুই করছিস্ কি? আমার ছেলেরা সব এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তুই তাদের জন্য একটা স্থান করতে পারলি নি?" ঠাকুর কর্তৃক এইভাবে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া সুরেশ বাবু মহা অশান্তপ্রাণে নরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের নির্দেশ মত একটা স্থান যে করেই হোক কর। তুমি যেমন করবে আমি তাতেই রাজি আছি। ঠাকুরের সেবার জন্য কাশীপুরে আমি মাসে মাসে যা দিতুম, এখন তোমাদের জন্যও তা দেবো।" ঠাকুরের অসীম স্নেহের কথা ভাবিয়া নরেন্দ্র অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ঠাকুর যখন আদেশ করেছেন তখন এ কাজ হবেই হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" ঠাকুরের প্রত্যাদেশ! নরেন্দ্রনাথের প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইল। আশা-আনন্দ-উদ্বেলিত প্রাণে কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতার সন্নিকটে স্বল্প ভাড়ায় একটি বাড়ীর সন্ধানে তিনি নিজে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকেও নিয়োজিত করিলেন। মঠ-স্থাপনার চেষ্টার সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহার মনে পড়িল বিশেষ করিয়া 'তারকদা'কে; সমস্ত বিবরণ জানাইয়া তারকনাথকে অবিলম্বে কাশীতে চিঠি লিখিলেন।

১। ঠাকুর স্নেহবশে তাঁহাকে সুরেন্দ্র বলিয়া ডাকিতেন।

নরেন্দ্রনাথের চিঠি পাইয়া তারকনাথের প্রাণে আনন্দসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিল। তিনি আসিবার সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যুবক ভক্তবৃন্দকেও একত্রিত করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ তৎপর হইলেন ; কলিকাতায় যাঁহারা ছিলেন, সকলের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া গৃহত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে মুন্সীদের একটি ভূতুড়ে বাড়ী মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় পাওয়া গেল। বাড়ী স্থির হইবামাত্রই তারকনাথকে অবিলম্বে চলিয়া আসিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ তার করিলেন। টেলিগ্রাম পাইয়া তারকনাথ পরদিবসই কলিকাতায় আসিয়া হাজির হন। যে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া তিনি ষ্টেশন হইতে বলরাম বাবুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ীতেই নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বরাহনগরে চলিয়া আসিলেন এবং সেই দিন হইতে তারকনাথ ও (বুড়ো) গোপাল বরাহনগর মঠে বাস করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ বাড়ী হইতে প্রতিদিনই আসিতেন, বিশেষ করিয়া রাত্রিকালটা জপধ্যানে কাটাইতেন বরাহনগর মঠে। মোকদ্দমা-সংক্রান্ত তাঁহার বাড়ীর গোলমাল তিনি তখনও সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়া উঠিতে পারেন নাই; সেইজন্য নিতান্ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইত। কিন্তু তাঁহার সারাটি মন পড়িয়া থাকিত সেই ভূতুড়ে বাড়ীতে শ্রীগুরুদেবের পাদুকার তলে।

বাবুরামের পরমভক্তিমতী মাতৃদেবীর সাদর আমন্ত্রণে ১৮৮৬ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে নরেন্দ্রনাথ গুরুভাইদের অনেককেই সঙ্গে লইয়া আঁটপুরে গমন করিয়াছিলেন। তখন সকলের প্রাণেই তীব্র বৈরাগ্য। আঁটপুরের অনাবিল শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁহারা ভজন-সাধনে মগ্ন হইয়া গেলেন। ধুনি জ্বালিয়া সারারাত ধ্যানে তন্ময়—মধ্যে মধ্যে নবীন

সন্ন্যাসিগণের 'বম্ বম্ হর হর' ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় কখনও ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রসঙ্গ করিতেন, কখনও উপনিষদ্-গীতা-ভাগবত-পাঠ বা ভজনকীর্তনের প্রবাহ চলিত। একরাত্রে সকলেই ধুনির পার্শ্বে ধ্যানমৌন প্রাণে পরমানন্দ-সম্ভোগে মগ্ন। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল ; এমন সময় শান্ত গম্ভীর নিশীথে ভাবাবিষ্ট নরেন্দ্র-নাথ তন্ময় হইয়া যীশুখৃষ্টের পবিত্র জীবন সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। যীশুর কঠোর সাধনা, জ্বলন্ত ত্যাগ-বৈরাগ্য, সর্বোপরি শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁহার একত্বানুভূতি প্রভৃতি বিষয় এমন তেজের সহিত বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার গুরুভ্রাতৃবৃন্দ সকলে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিলেন, যেন স্বয়ং যীশুই নরেন্দ্রনাথের ভিতর আবির্ভূত হইয়া তাঁহার লোকোত্তর জীবন-কাহিনী কোন মহদুদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাঁহাদিগকে শুনাইতেছেন। পরে জানা গেল যে এই দিনই 'ক্রীষ্টমাস্ ইভ্' (যীশুর জন্মসন্ধ্যা), অথচ ঐ বিষয় পূর্বে কাহারও জানা ছিল না ; তখন সকলেই বিস্ময়ে চমকিত হইলেন। স্বামী শিবানন্দ পরবর্তী কালে বলিয়াছিলেন, "আঁটপুরে থাকাকালীনই আমাদের সকলের ভেতর সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকার সঙ্কল্প দৃঢ় হল। ঠাকুর তো আমাদের সন্ন্যাসী করে দিয়েছিলেনই—সেই ভাব আরও পাকা হল আঁটপুরে।"

সপ্তাহাধিক কাল আঁটপুরে মহানন্দে কাটাইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন বরাহনগর মঠে এবং তখন হইতেই যাঁহারা পড়াশুনা করিতেছিলেন তাঁহারাও ক্রমে মঠে সমবেত হইতে লাগিলেন। এক একদিন এক একজন আসিয়া উপস্থিত হন, আর মঠবাসীরা 'জয় গুরু মহারাজজীকী জয়'-ধ্বনিতে নবাগতকে প্রেমালিঙ্গনপাশে স্বাগত করেন—এইভাবে সেই ভূতের বাড়ীতে সব 'দানারা' আসিয়া জুটিতে

লাগিলেন। আর সঙ্গেসঙ্গে চলিতে লাগিল কঠোর তপস্যা; শরীরের দিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, দিবারাত্র অবিশ্রান্ত চলিয়াছে ধ্যান, জপ, ভজন, পূজন, পাঠ, আলোচনা।

ইতোমধ্যে নরেন্দ্রনাথও সংসারের একটা ব্যবস্থা করিয়া স্থায়িভাবে মঠে বাস করিতে লাগিলেন—মঠও খুব জমিয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বালক ভক্তগণের মধ্যে যে একাদশ জনকে স্বয়ং গেরুয়া দান করিয়াছিলেন তারকনাথ তাঁহাদের অন্যতম; কিন্তু তখন যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস-গ্রহণের আনুষঙ্গিক বিরজাহোম ও নামকরণাদি অনুষ্ঠিত হয় নাই। সেইজন্য দলপতি নরেন্দ্রনাথ শুভদিনে[১] বিরজাহোম সম্পাদনপূর্বক স্বয়ং সন্ন্যাসনাম ও বহির্বাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত অন্যান্য গুরুভ্রাতা-দিগকেও তাঁহাদিগের অন্তরের ভাবানুযায়ী বিভিন্ন নামে ভূষিত করিয়াছিলেন। তারকনাথের নাম হইল স্বামী শিবানন্দ।[২]

১ স্বামী অভেদানন্দের জীবনী-গ্রন্থে রহিয়াছে, "১২৯৩ সালের মাঘ মাসের প্রথম ভাগে একরাত্রে তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকার সম্মুখে বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন।"

২ 'অদ্বৈতাশ্রম' হইতে প্রকাশিত স্বামীজির ইংরেজী জীবনীতে বরাহনগর মঠের গোড়াপত্তনের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়—"কেবলমাত্র তারকনাথ ও গোপালদা বরাহনগর মঠে প্রথম থাকিতে আরম্ভ করেন। যুবক ভক্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ সে সময় নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ বা বহির্গত হইয়াছিলেন তীর্থভ্রমণে। রাখাল তখন মুঙ্গেরে ছিলেন। যোগীন, লাটু ও কালী গিয়াছিলেন মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে।...আঁটপুর হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই শরৎ ও শশী বরাহনগর মঠে যোগদান করিলেন। অতঃপর আসিলেন রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম ও কালী; তাহার পরই সুবোধ ও সারদা-প্রসন্ন যোগদান করিলেন। গঙ্গাধর নরেন্দ্রনাথের অদর্শন সহ্য করিতে পারিতেন

*　　　　*　　　　*

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সকলেই নিত্যসিদ্ধ—জগদ্ধিতায় তাঁহাদিগের দেহধারণ। ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "নিত্যসিদ্ধের আলাদা থাক, যেমন অরণি কাঠ—একটু ঘসলেই আগুন, আবার না ঘসলেও হয়। একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে, আবার সাধন না করলেও পায়। তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবান-লাভ করবার পর সাধন করে; যেমন লাউ কুমড়া গাছ—আগে ফল হয় তারপর ফুল।" সেই জন্যই দেখা যাইতেছে যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য স্পর্শে সকল অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের হৃদয়কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল এবং সকলেই ভগবদ্ভাবে তদ্গত হইয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই পরে কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন লীলাচ্ছলে গোপাঙ্গনাগণের মনপ্রাণ হরণ করিয়া রাসমঞ্চ হইতে অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে ত্রিভুবন শূন্যময় দেখিয়াছিলেন তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলদেহ-অপ্রকটের পর তাঁহার অন্তরঙ্গভক্তগণ দেখিলেন যে, হৃদয়দেবতা কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়াছেন! তখনই আসিয়াছিল প্রিয়তমের অদর্শনে মর্মান্তিকবেদনাভরা বিরহের সুদীর্ঘ রজনী—তখনই আরম্ভ হইল শূন্য হৃদয়ের দারুণ আর্তনাদ! সত্যে প্রতিষ্ঠিত

না—সেজন্য তিনি তখন প্রায়ই মঠে যাতায়াত করিতেন এবং পরে তিব্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মঠে যোগদান করেন। হরিও মঠে প্রায়ই আসিতেন এবং কিছু দিন পরে মঠের অন্তর্ভুক্ত হন। যোগীন ও লাটু মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে প্রায় একবৎসর কাল অবস্থান করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং মঠের ভাইদের সঙ্গে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যেই ঠাকুরের প্রিয় সন্তানগণ বরাহনগর মঠে সমবেত হইলেন।"

হইবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা তরুণ সন্ন্যাসিমণ্ডলীকে এককালে জগৎসংসার, এমন কি অতিপ্রিয় নিজদেহ-জ্ঞান পর্যন্ত বিস্মৃত করাইয়া দিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত 'স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান' গ্রন্থ হইতে তৎকালীন বরাহনগর মঠের ঐ 'সৃষ্টিছাড়া দলের' কঠোর তপশ্চর্যার একখানি চিত্র আমরা এখানে সন্নিবেশিত করিতেছি—"শ্রাবণ বা ভাদ্র মাস। বৈকাল বেলা। মঠে লোকজন খুবই কম। অশান্তপ্রাণে পরিব্রাজকরূপে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। গাছের পাতায় পাতায় ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টির শব্দ বাতাসে ভাসিয়া সেই জনহীন স্তব্ধ মঠবাড়ীটার নিস্তব্ধতাকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। বড় ঘরটাতে তারকদা ও শরৎ মহারাজ আছেন। দুই জনেই চুপচাপ—অর্ধশায়িত অবস্থায়। শরৎ মহারাজ বিষণ্ণ হইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন; তারকদাও ভাববিভোর ও বিষাদে পরিপূর্ণ—চক্ষুতে জল ভরিয়া রহিয়াছে। খানিক পরে তারকদা বলিলেন, 'শরৎ, বাঁয়াটা একটু পাড়ো তো—ঠেকা দাও তো।' তারকদা উঠিয়া বসিয়া সকরুণ কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

'হরি গেল মধুপুরী, হাম কুলবালা।
বিপথ পড়ল সই! মালতীর মালা।
নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস।
সুখ গেল প্রিয়সাথে, দুঃখ মোরি পাশ।'

গানের সেই করুণ ঝঙ্কারে সমস্ত মঠবাড়ী যেন আর্তনাদ করিতে লাগিল। জীবনের যত সুখ ও আনন্দ প্রিয়তমের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়াছে। তারকদা প্রাণের আবেগে এই বিরহসঙ্গীতটি এমন সুন্দর গাহিতে লাগিলেন যে আমার পর্যন্ত প্রাণ দ্রব হইয়া গেল! গানের সঙ্গেসঙ্গে দুই গুরুভ্রাতার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে, আর ক্ষণে

ক্ষণে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল কণ্ঠস্বর। হৃদয়-বিদারক বিরহ যে কী জিনিষ এবং কৃষ্ণ-বিরহে রাধিকা যে অতি করুণস্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহা যেন চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। অন্তরে যে বিরহভাবের তরঙ্গ বহিতেছিল—তাহারই বহিঃপ্রকাশ হইয়াছিল কণ্ঠে ও 'নয়ান-জলে বয়ান' ভাসিয়া। পক্ষান্তরে, ইহা তারকদা ও শরৎ মহারাজের বরাহনগর মঠ-জীবনের অন্যতম রূপ" ; কারণ তাঁহাদের প্রাণও তখন আকুলিবিকুলি করিতেছিল ভগবানলাভের জন্য এবং বাস্তবিকপক্ষে এই চিত্রটি সকল যুবক সন্ন্যাসীর মানসচিত্রের বহিঃরূপ। এইরূপে আশা-নিরাশা-সুখ-দুঃখের বিপরীত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া শিবানন্দপ্রমুখ বরাহনগরের সাধকগণ যে-ভাবে সাধনার 'উজান স্রোতে' অগ্রসর হইতেছিলেন, জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে তাহা একটি অত্যুজ্জ্বল নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছে। সহায়-সম্পদহীন, কতকগুলি অখ্যাত, অজ্ঞাত যুবকের এই 'সৃষ্টিছাড়া' দল যে ভবিষ্যতে এক অভিনব আধ্যাত্মিকতরঙ্গ সমগ্র জগতে সঞ্চারিত করিবেন তাহা তখন কে ধারণা করিয়াছিল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "শিব-অংশে জ্ঞান হয়, বিষ্ণু-অংশে ভক্তি হয় ; যাদের শিব-অংশ তাদের জ্ঞানীর স্বভাব, যাদের বিষ্ণু-অংশ তাদের ভক্তের স্বভাব।" পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তারকনাথ বালককাল হইতেই ভগবানের নিরাকার, নির্গুণভাব ভালবাসিতেন এবং সেই ভাবেই আপন মনে সাধন-ভজন করিতেন। উহা যেন পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার। কিন্তু সর্বভাব-ঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করার পর হইতে সেই অদ্ভুত যোগী যেন তারকনাথের আধ্যাত্মিক জীবন অন্যভাবে চালিত করিতেছিলেন। প্রথম দর্শনের দিনই তিনি প্রিয় শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "শক্তি মানতে হয়," এবং পরে তাঁহার জীবনাদর্শে যুগপ্রয়োজন-সাধনের জন্য

শিষ্যহৃদয়ের স্বভাবজাত জ্ঞানের ভাব একেবারে নষ্ট না করিয়া উহাকে একটু মোড় ফিরাইয়া জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। বরাহনগর মঠেও প্রথমতঃ শিবানন্দের প্রাণে নির্গুণ ভাবই প্রবল ছিল। কিন্তু একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "ওরে, গুরুই সব। গুরুর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।" ঠাকুরের দিব্যদর্শন ও ভাগবতবাণীর শক্তিতে শিষ্যের চিন্তাধারা একেবারে আমুল পরির্তিত হইয়া গেল, তাঁহার হৃদয়ে নির্গুণের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন সগুণ শ্রীগুরু। শিষ্য ক্রমে 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবঃ মহেশ্বরঃ, গুরুরেব পরং ব্রহ্ম'—এই সত্য নানাভাবে উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এই ভাব তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-'আত্মগোষ্ঠীর' ভিতর পরস্পরের প্রতি এক অত্যাশ্চর্য শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও একাত্মবোধের ভাব বিকাশ হইয়াছিল। 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'—প্রত্যেকেই শ্রীগুরুর রূপান্তর বা অংশবিশেষ—এই ভাব যেন মাতাইয়া রাখিয়াছিল সকলকে, আর উঁহার প্রকাশ দেখা যাইত পরস্পরের প্রতি এক জীবন্ত সহানুভূতি ও সেবাপরায়ণতায়। স্বামী শিবানন্দ একদিন বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে এত গভীর ভালবাসা ছিল যে, এক জনের জন্য অপরে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারতাম।" কি করিয়া ভাইদের সুখী করিতে পারিবেন, উহাই ছিল প্রত্যেকের প্রচেষ্টা। ঐ প্রেমডোরে শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে একত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন বলিয়াই সকলে একপ্রাণ, একমন হইয়া একই লক্ষ্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন।

একদিন বেলুড় মঠে জনৈক জিজ্ঞাসু মহাপুরুষজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কি করে তাঁর অন্তরঙ্গদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন—কি বন্ধনে তিনি সকলকে একত্র করলেন ?" তদুত্তরে বৃদ্ধ তাপস তাঁহার সুদীর্ঘ

জীবনের সকল সাধনার সারকথা প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "প্রেমই একমাত্র বন্ধন। তিনি প্রেমসূত্রে সকলকে একত্রে গেঁথে রেখেছিলেন। আমরা সকলে তাঁর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে, তাঁর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে এসেছিলাম এবং পরে পরেও একত্র হয়েছিলাম।···এখনও তাঁর সেই সঙ্ঘ প্রেমের দ্বারাই চালিত হচ্ছে। এখানে প্রেমই একমাত্র common cord (সংযোগ-সূত্র) যদ্দ্বারা সকলে একত্রে গ্রথিত হয়ে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আছে।"

ঐ প্রেমের স্বভাব বিস্তার। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় বরাহনগর মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-তনয়গণের সেই অহেতুক ভ্রাতৃপ্রেম ক্রমে সঙ্ঘের আবেষ্টনী, দেশকাল বা জাতির সীমার মধ্যে রুদ্ধ না থাকিয়া ধূর্জটির জটাজাল-সম্ভূত জাহ্নবীর পূত ধারার ন্যায় বিশ্বপ্লাবী প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া সকল দেশের সকল জাতির নিতান্ত হীন জনকেও একাত্মবোধে স্পর্শ করিতেছে।

বরাহনগরে গুরুভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে শিবানন্দ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইতেন সেবকরূপে এবং অক্লান্ত সেবাযত্নাদির দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতেন। ১৮৮৯ সালের শেষভাগে স্বামী যোগানন্দ প্রয়াগে কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। ঐ খবর তারযোগে বরাহনগরে পৌঁছিলে স্বামিজী তাড়াতাড়ি প্রয়াগ চলিয়া আসেন। তাঁহার সহিত আমরা শিবানন্দকেও যোগীন মহারাজের শয্যাপার্শ্বে দেখিতে পাই।

তাঁহার সেবা হইতে গৃহী গুরুভ্রাতারাও বঞ্চিত হইতেন না। ১৮৯০ সালের প্রথম ভাগে ঠাকুরের অন্যতম গৃহী-ভক্ত গুরুগতপ্রাণ বলরাম বসু কঠিন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। স্বামিজী ও রাখাল মহারাজ প্রভৃতি অনেকেই তখন বরাহনগর মঠে ছিলেন না। বলরাম বাবুর অসুখের সংবাদ

পাওয়া মাত্রই মহাপুরুষজী কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। মহাপুরুষজী একদিন বলরাম বাবুর দেহত্যাগ-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "দেহত্যাগের দু'-তিন দিন আগে থেকেই বলরাম বাবু আত্মীয়স্বজনদের কাউকে কাছেও আসতে দিতেন না। আমরাই তাঁর কাছে থাকতাম। যতটুকু কথা বলতেন তা খালি ঠাকুর সম্বন্ধে। মৃত্যুর একদিন আগেই ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেলেন।"

শিবানন্দ মঠজীবনের প্রারম্ভ হইতেই যেমন নির্লিপ্ত ও ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, তেমনি তাঁহার হৃদয়ের একটি অপূর্ব্ব উদার ভাবও বিশেষ লক্ষণীয় ছিল। তাঁহার ভিতর দ্বিধা-সঙ্কোচ, উচ্চ-নীচ প্রভৃতি সংকীর্ণ ভাব স্থান পাইত না। সরলপ্রাণে বালকের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে অতি নম্র মিষ্ট ও মধুরভাবে সকল কাজই সানন্দে শ্রীপ্রভুর সেবাজ্ঞানে চুপচাপ করিয়া যাইতেন। মঠে কুটনা-কোটা, জলতোলা, ঘরবাড়ী ঝাঁট দেওয়া, এমন কি পায়খানা-পরিষ্কার পর্যন্ত তাঁহার একপ্রকার নিত্যকর্ম ছিল। ঐ সময় সকল কাজের ভিতরই তাঁহার মুখে প্রায়ই শোনা যাইত 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' এই কথাটি।

বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে একবার বলরাম বাবু কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামিজী গুরুভাইদের সহিত তাঁহার বাড়ীতে যান। এই বলরামমন্দিরের সঙ্গে তাঁহাদের কত মধুর স্মৃতি জড়িত! ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বহুবার ঐ স্থানে শুভাগমন করিয়া কত ভজন, কীর্তন ও ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার নানা ভাব, সমাধি—আবার বালক ভক্তগণেরও কত ভাবানন্দলাভ হইয়াছিল! আর ঐ পুণ্যস্থানে ঠাকুর ভক্তদিগের সঙ্গে কি মধুর রঙ্গরস ও হাসি-তামাসাই না করিতেন! ঠাকুর বলিতেন, "বলরামের শুদ্ধ অন্ন।"

মহাপুরুষ শিবানন্দ

বলরামমন্দিরে আসিয়া সকলেই ঠাকুরের ভাবে বিশেষরূপে তন্ময় হইয়া গেলেন। খুব ভজন-কীর্তনাদির পরে সকলে সানন্দে বলরামের পবিত্র অন্ন-ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গে মগ্ন হইলেন। ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে স্বামিজী বলিলেন, "এক ঠাকুরই ছিলেন কামজিৎ, নইলে বিবাহিত জীবনে কামজিৎ পুরুষ জগতে বিরল।" শুনিয়া শিবানন্দ বলেন, "তা কেন? ঠাকুর আমার ভেতর এমন শক্তিসঞ্চার করেছিলেন যে, তার বলে আমিও কামজয় করতে পেরেছি। তাঁর কৃপায় সবই সম্ভব।" এই কথা শুনিয়া স্বামিজী আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তাহলে তো আপনি মহাপুরুষ।" সমবেত গুরুভ্রাতারাও ঐ ঘটনাশ্রবণে চমৎকৃত ও বিস্মিত হন। সেইদিন হইতেই স্বামীজি নিজেও শিবানন্দকে 'মহাপুরুষ' বলিয়া ডাকিতেন এবং মঠবাসীরাও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে আরম্ভ করেন। স্বামিজী-প্রদত্ত তাঁহার এই 'মহাপুরুষ' নাম অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এতাদৃশ জ্বলন্ত ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা, গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি—পরবর্তী জীবনে সর্বপ্লাবী প্রেম ভগবানের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত অসাধারণ দৈবীসম্পদযুক্ত মহাপুরুষেই সম্ভব।

ঠাকুর বলিতেন, "আমি গোমড়া মুখ দেখতে ভালবাসি নে।" তিনি নিজে যেমন 'রসরাজ' ছিলেন, তাঁহার সন্তানগণও সকলেই ছিলেন সদানন্দ। ঠাকুরের রসিকতা সম্বন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন বলেন, "তিনি এক এক দিন এমন হাসাতেন যে, আমার দমবন্ধ হবার উপক্রম হ'ত। আমি তাঁর পায়ে ধরে অনুরোধ করতাম—একটু থামুন, হাস্‌তে হাস্‌তে আমার পেটের নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়ে গেল যে! এক এক দিন হাস্‌তে হাস্‌তে চোখের জল বেরিয়ে যেত।" ঠাকুরের জীবন সব দিক দিয়াই অদ্ভুত—এদিকে মুহুর্মুহু ভাব, সমাধি লাগিয়াই আছে, আবার তেমনি রঙ্গরসের উৎস!

বরাহনগর মঠ ও পরিব্রজ্যা

লাটু মহারাজের 'স্মৃতি-কথা' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় লাটু মহারাজ বলিয়াছেন, "হামাদের মধ্যে তারকদা ছিলেন ভারী আমুদে।" শিবানন্দ সকলের সঙ্গে হাসি-তামাসা কৌতুক-রঙ্গরস দ্বারা, কখনও বা গাজনের সন্ন্যাসীদের ছড়া দ্বারা অথবা পুস্তু বা গুজরাটী ভাষার অনুকরণে বক্তৃতাদি দ্বারা নিজের মনকেও হাল্‌কা করিয়া নিতেন আর অপর সকলকেও প্রভূত আনন্দ দিতেন। তাঁহার বেশ অনুকরণ করিবার শক্তি ছিল—হাত-পা নাড়িয়া, নানা প্রকারে মুখভঙ্গী করিয়া তিনি হুবহু অপরের অনুকরণ করিতেন ; আবার পরক্ষণেই তিনি স্থির, গম্ভীর ও আত্মস্থ পুরুষ হইয়া যাইতেন। ধ্যানস্থ হইয়া থাকাটাই ছিল যেন তাঁহার মনের স্বাভাবিক গতি। বরাহনগর মঠের 'আমুদে' শিবানন্দকে পরে সেই ভাবে দেখিবার সুযোগ কাহারও বড় একটা হয় নাই—কখনও কখনও নিজ গুরুভাইদের সঙ্গে মিলনে সেই আমোদের আভাস খানিকটা দেখা যাইত মাত্র।

ক্রমে ক্রমে মঠবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই পরিব্রাজকরূপে তপস্যায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সকলেরই প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য—এমন কি সকলের একসঙ্গে থাকাটাও 'মায়ার বন্ধন' বলিয়া তাঁহাদের মনে হইত। স্বামিজী এবং রাখাল মহারাজও শান্তিলাভের আশায় বাহির হইয়া পড়িলেন। মহাপুরুষজী কিন্তু প্রাণের বিরাট আবেগকে বহুযত্নে শান্ত করিয়া ভজন-সাধনে মগ্ন হইয়া রহিলেন বরাহনগর মঠেই। মঠের প্রথমাবস্থায় শশী মহারাজের ন্যায় তিনিও ঐ প্রকার একনিষ্ঠভাবে শ্রীগুরুর স্থান আগলাইয়া পড়িয়া থাকিবার ফলে মঠ ক্রমে স্থায়ী আকার ধারণ করিল। বাস্তবিকপক্ষে মঠস্থাপনাও হইয়াছিল যেন শিবানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়াই কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্থূলদেহে বর্তমান থাকাকালেই তিনি শ্রীগুরুকৃপাকটাক্ষে

সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া 'সর্বস্ব'কে পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানের পর যুবক-ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মন যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছিল না, তখন শিবানন্দের ত্যাগ-বৈরাগ্যোজ্জ্বল জীবন যে তাঁহাদিগকে বহুল প্রেরণা দিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রায় আড়াই বৎসরকাল[১] বরাহনগর মঠে নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দৃঢ়ব্রত হইয়া তপস্যায় কাটাইবার পর শিবানন্দ প্রাণে প্রাণে হিমালয়ের তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৮৮৯ সালের প্রথম ভাগে তিনি পরিব্রাজক-বেশে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের উদ্দেশে বহির্গত হন। পথে নানা তীর্থ দর্শন ও বহু দুর্গম স্থান অতিক্রম করিয়া দিনের পর দিন চলিতে লাগিলেন। হিমালয়ের গম্ভীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁহার হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। অভ্রভেদী চিরতুষারমণ্ডিত কেদারশ্রেণী দেখিয়াই তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। ৺কেদারনাথে পৌঁছিয়া তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া শ্রীবিগ্রহকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া বহুক্ষণ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। মহানন্দে কয়েক দিন কেদারে অবস্থান করিয়া শিবানন্দ বদরীনারায়ণদর্শনে চলিলেন।

বদরিকাশ্রমে অবস্থানকালে মহাপুরুষজী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে যে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া হইল—"পরম-

১ এই সময়ের মধ্যে ১৮৮৮ খৃঃ (খুবসম্ভব আগষ্ট মাসে) শিবানন্দ উত্তরাখণ্ডে যাইবার জন্য বরাহনগর মঠ হইতে একবার বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু হাতরাস ষ্টেশনে পীড়িত স্বামিজীর সহিত দেখা হইতেই তিনি উত্তরাখণ্ডে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। স্বামিজীর বিশেষ আগ্রহে তিনি শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে মাত্র গিয়াছিলেন এবং পরে অসুস্থ স্বামিজীকে সঙ্গে করিয়া হাতরাস্ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

প্রীতিভাজন রাখাল, আজ চার দিন হইল ৺বদরীনারায়ণে আসিয়াছি। অতি রমণীয় স্থান—ঠিক অলকানন্দার উপরে। চারিদিকে চিরতুষারমণ্ডিত পর্বতমালা। এস্থানে অলকানন্দা কোথাও বরফের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, আবার কোথায়ও একেবারে তুষারাবৃত—জল মোটেই দেখা যায় না। বদরী-নারায়ণে আসিবার পথে স্থানে স্থানে বরফের উপর দিয়া চলিতে হইয়াছিল —এমন কি আধ মাইল পর্যন্ত! তথাপি এস্থান কেদারের মতন ভীষণ ঠাণ্ডা নহে।··· গঙ্গাধর এখানে সর্বত্র সুপরিচিত—শুধু যে সুপরিচিত তাহা নহে, সকলেই তাহাকে খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে।··· কালী প্রভৃতি দর্শনাদি করিয়া নামিয়া গিয়াছে এবং দেবপ্রয়াগে গঙ্গাধরের পরিচিত একজন লোকের নিকট একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছে—গঙ্গাধরের কোন খবর পাইলে যেন তার কাছে ঐ চিঠিখানি পৌছাইয়া দেয়।"

কেদারনাথের পথে শ্রীনগর নামক স্থানে শিবানন্দের সহিত গঙ্গাধর মহারাজের দৈবক্রমে সাক্ষাৎ হইয়াছিল[১]। অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হওয়ায় উভয়েই খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে গঙ্গাধর মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন—"ঐ বৎসর দশহরায় দেবপ্রয়াগে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য যখন তিব্বত থেকে নামছি তখন শ্রীনগরের দেড় ক্রোশ নীচে এক-স্থানে তারকদার সঙ্গে দেখা হল। তিনি প্রথমটায় আমায় চিনতে পারেন নি। আমার মাথায় তিব্বতী-টুপি, গায়ে তিব্বতী লামাদের মত পোষাক, মুখটা

১। "আপনি বোধ হয় জানেন, আমাদের ভাই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীতারকনাথ বাবাজীর দর্শন শ্রীনগরে পাই। সেখান হইতে একত্রে যাত্রা করিয়াছিলাম।··· ৺বদরীনাথে তিনি আমাকে তিব্বতে যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু আমি না শুনিয়া তিব্বতে যাত্রা করি, তিনি আলমোড়া যাত্রা করেন। তাহার পর তিব্বত হইতে এখানে পৌছিয়াছি প্রায় দুই মাস হইবে।"—(স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র, ১০।৩।৯০)

snow-burnt (হিমঝল্‌সান) হয়ে কাল হয়ে গিছিল। আমি তারকদাকে দূর থেকে দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলাম। কাছে গিয়ে 'দাদা-দাদা' বলে ডাকতেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কে? গঙ্গা? তুই বেঁচে আছিস্‌? তোর জন্য যে বরাহনগর মঠে কান্নাকাটি পড়ে গেছে!' এই বলে আমায় জড়িয়ে ধরলেন—আর দুজনেই কাঁদতে লাগলাম।" তিনি গঙ্গাধর মহারাজকে বরাহনগরে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন ; কিন্তু তখন তাঁহার মনের অবস্থা অন্য প্রকার—তিনি মঠের দিকে না আসিয়া পুনরায় তিব্বত চলিয়া যান। গঙ্গাধর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার খবর শিবানন্দ যথাসময়ে বরাহনগর মঠে ও অন্যান্য গুরু-ভাইদিগকে জানাইয়াছিলেন ; কারণ দীর্ঘকাল তাঁহার কোন সংবাদ না পাওয়ায় সকলেই তাঁহার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন।

কেদারবদরী-দর্শনানন্তর শিবানন্দ আলমোড়ায় কয়েক মাস কাটাইয়া ৺কাশীধামে ফিরিয়া আসিলেন এবং তথায় কিছুকাল সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিয়া ১৮৮৯ সালের শেষভাগে পুনরায় বরাহনগরে গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন। আলমোড়ায় অবস্থানকালে তথাকার লালা বদ্রীসা থুলঘোরিয়া নামক জনৈক ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহাপুরুষজীর পরম অনুগত ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ তেজস্বী যতিকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন এবং কোনপ্রকারে তাঁহার সেবা করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। লালা বদ্রীসা অপুত্রক ছিলেন ; একটি পুত্রসন্তানলাভের জন্য একদিন অতি কাতরভাবে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। শিবানন্দ তাঁহার সেবা ও ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে বদ্রীসার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সিদ্ধ মহাপুরুষের আশীর্বাদে লব্ধ বলিয়া বদ্রীসা পুত্রের নাম সিদ্ধদাস রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ

তখন হইতে বদ্রীসা ঠাকুরের সন্তানদিগের সেবা করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন।[১] বরাহনগর মঠের সন্ন্যাসীরা আলমোড়ায় গেলে তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে ভারতে ফিরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যখন আলমোড়ায় যান তখন তিনিও বদ্রীসার আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মঠের গুরুভ্রাতারা তীর্থ-প্রত্যাগত 'তারকদা'কে পাইয়া খুবই আনন্দিত হইলেন; তিনিও সকলকে তাঁহার তীর্থভ্রমণের বিবরণ ও অভিজ্ঞতা জানাইয়া আনন্দ দিলেন। শিবানন্দ পুনরায় একনিষ্ঠভাবে বরাহনগরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় স্বামিজী ও ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মঠে না থাকায় তাঁহাকে মঠের কাজকর্ম দেখাশুনার অনেক ভার লইতে হইয়াছিল।

১৮৯০ সালের ৮ই জানুয়ারী বরাহনগর হইতে গঙ্গাধর মহারাজকে লিখিত তাঁহার চিঠিতে তৎকালীন মঠ ও গুরুভাইদের অনেক বিবরণ জানা যায়—"ভাই গঙ্গাধর, আজ বেলা ১১টার সময় তোমার চিঠিখানা পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি বন্দী হইয়াছ শুনিয়া আমরা সকলে বড়ই দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, তুমি যে ইংরেজের এলাকায় আসিয়া পড়িয়াছ তাহাতে অনেক সুবিধা হইয়াছে। রেসিডেন্ট মহাশয় ও গভর্ণর মহোদয়কে শীঘ্রই তোমার সম্বন্ধে লিখিতেছি—তুমি চিন্তিত হইও না।

"আজকাল আমাদের প্রায় সকলেই পশ্চিমে। নরেন্দ্র, রাখাল ও খোকা কাশীধামে আছেন। যোগীন, নিরঞ্জন এলাহাবাদে। শরৎ, কালী, হরিবাবু ও সান্যাল হৃষীকেশে এবং দক্ষ রাওলপিণ্ডিতে আছেন।

১। "তিনি আমাকে নিজপিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করেন"—(স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র, ২৮।৭।৮৯)।

এখানে বাবুরাম, শশী, সারদা, লাটু, গোপালদা ও আমি আছি। আমরা সকলেই ভাল আছি এবং যাঁহারা যাঁহারা বাহিরে আছেন পত্রদ্বারা তাঁহারাও ভাল আছেন, সদাসর্বদা এই খবর আসিতেছে। ··· এখানে পূর্ববৎ গুরুসেবা চলিতেছে। তুমি আর কতদিন ঘুরিয়া বেড়াইবে? তুমি যদি ফিরিয়া আসিয়া এখানে স্থির হইয়া কিছুকালের জন্য বস, তাহা হইলে আমরা সকলে যে কি পর্যন্ত আনন্দিত হই তাহা বলিতে পারি না। ব্রহ্ম 'অচল অটল সুমেরুবৎ'—তুমি সন্ন্যাসী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ, এই জন্যই ভাই তোমাকে বলিতেছি। ··· তুমি কারামুক্ত হইলেই যেন প্রকৃত মুক্ত পুরুষ হইয়া আমাদের নিকট আইস—ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

"আগামী ১০ই ফাল্গুন শ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব। আশা করি এইবার উৎসবের সময় তুমি আমাদের সহিত যোগদান করিবে।"

৺কেদারবদরী হইতে ফিরিয়া শিবানন্দ প্রায় দুই বৎসর কাল মঠে অবস্থানকালে মঠের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। গুরুভাইদের মধ্যে অনেকেই পরিব্রাজক-অবস্থায় তপস্যায় রত ছিলেন অথবা তীর্থাদিদর্শনমানসে তখন হিমালয়ের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এদিকে বরাহনগরেও সাধনার নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। একদিকে রামকৃষ্ণানন্দ সেবাপূজাদি দ্বারা যেমন ঠাকুরকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি অন্যেরাও নিজ নিজ সাধনদ্বারা ঠাকুরের জাগ্রতাবস্থান প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন। প্রত্যেকেই সাধনমার্গে যত অগ্রসর হইতেছিলেন, ততই প্রতি কর্ম ও ব্যবহারে সেই অন্তঃপ্রবাহী আনন্দের অভিব্যক্তি হইতেছিল এবং তাঁহাদের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিতেছিলেন তাঁহারাও সেই আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইতেছিলেন। সেই তপস্যার

ধারা প্রত্যেকেরই ছিল স্বতন্ত্র ধরণের—কেহ হয়ত অভুক্ত অবস্থায় উদয়াস্ত জপ করিতেছেন, কেহ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন, কেহ একাহার বা স্বল্পাহারে সাধনভজনে মগ্ন। ঐ সময় ত্রিগুণাতীতানন্দও কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আহার-নিদ্রার দিকে তাঁহার মোটেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তিনি সর্বক্ষণ জপ করিতেন। মঠবাসীরা কোন-না-কোন উপায়ে তাঁহাকে অভুক্ত থাকিতে দিতেন না। একদিন সকলেরই প্রসাদ পাওয়া হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ত্রিগুণাতীতানন্দের পণ যে তিনি জপ ছাড়িয়া কিছুতেই আহার করিতে যাইবেন না। শেষটায় অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি বলিলেন, "তারকদা যদি আমাকে স্পর্শ করে থাকেন, তাহ'লে উহা জপের সমান কাজ করবে। অতএব তিনি স্পর্শ করে থাকলে সেই সময় আমি খেয়ে নেব।" অগত্যা তাহাতেই রাজি হইয়া শিবানন্দ ত্রিগুণাতীতানন্দের গায়ে হাত দিয়া সঙ্গেসঙ্গে চলিলেন এবং তাঁহার আহারের সময় তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঘটনাটিতে এক দিকে যেমন ত্রিগুণাতীতানন্দের একনিষ্ঠ সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি সূচিত হয় মহাপুরুষজীর উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা।

শিবানন্দও সেই সময় প্রশান্তচিত্তে আনন্দ-নেশায় কতটা মশগুল ছিলেন তাহার আভাস পাওয়া যায় তৎকালীন তাঁহার একখানি চিঠিতে —"... শ্রীগুরুদেবের কৃপায় চিত্তের অবস্থা অতি সুন্দর চলিতেছে এবং ইচ্ছা করি আপনিও সে অবস্থার অংশ প্রাপ্ত হউন। গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করি আপনার চিত্ত নিরাময় অভয় শিবধামে বিশ্রাম করুক।" যাঁহারা জগতে আসেন অমৃতরস-পরিবেশনের জন্য তাঁহাদের

জীবনের ধারা প্রথম হইতেই স্বতন্ত্র, তাঁহারা ব্রহ্মানন্দ নিজে সম্ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না, অন্যকে উহা বিতরণ করিতেই যেন তাঁহাদের আনন্দ বেশী।

১৮৯১ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে বরাহনগর মঠ হইতে লিখিত মহাপুরুষজীর একখানি চিঠি হইতে জানা যায় যে, ঐ বৎসর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসবে অন্যান্য বারের অপেক্ষা অনেক বেশী লোক যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা নগরীর প্রায় অধিকাংশ ভক্ত ও ভদ্রলোকদিগের সমাগম হইয়াছিল। রবিবারে জনসমাগম অধিক হইতে পারিবে বলিয়াই ঠাকুরের জন্মতিথির অব্যবহিত পরেই যে রবিবার হয় সেই রবিবারেই মহোৎসবের প্রথা তখন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। জন্মতিথির দিন মঠবাসীরা সমস্তদিবসব্যাপী পূজাপাঠাদির অনুষ্ঠান করিতেন এবং উহাতে কেবলমাত্র বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দই যোগদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। সর্বসাধারণকে জন্মতিথির দিন নিমন্ত্রণ করা হইত না।

মঠ স্থায়ী ভাব ধারণ করিবার পরে ১৮৯১ সালের অক্টোবর মাসে শিবানন্দ পুনরায় পরিব্রজ্যায় বহির্গত হইলেন। তাঁহার তখনকার মানসিক অবস্থার একটি সুস্পষ্ট ছবি একখানা চিঠিতে দেখিতে পাওয়া যায়—"বরাহনগরে একদিন গাঢ় ধ্যানের সময় ৺রামেশ্বরের দর্শনাভিলাষ এত প্রবল হইয়াছিল যে, পক্ষীর ন্যায় যদি পাখা থাকিত তাহা হইলে উড়িয়া যাইতাম। ··· শ্রীগুরুদেব এবার তাঁহার ৺রামেশ্বরমূর্তিতে আকর্ষণ করিতেছেন। অনন্ত তাঁহার রূপ। বিশ্বনাথ যখন আকর্ষণ করিবেন তখন কার সাধ্য স্থির থাকে।"

ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঠাকুর একদিন শিবানন্দকে দর্শন

দিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে গুরুই সব" এবং সেই দর্শনের পর হইতেই ধীরে ধীরে তাঁহার ভাবরাজ্যে একটা আমূল পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল। তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন—সর্বদেবদেবীস্বরূপ শ্রীগুরুই সব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলের ভিতরই তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন শ্রীগুরুর প্রকাশ—সকল দেবদেবীই শ্রীগুরুর এক একটি রূপ। অন্তরে শ্রীগুরুকে বিভিন্নরূপে দর্শন করিবার পরে বাহিরেও সেই অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় তিনি তীর্থ-দর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। বরাহনগর পরিত্যাগ করিয়া ৺রামেশ্বরের পথে প্রথম তিনি উপস্থিত হইলেন ত্রিবেণীসঙ্গমে। তথা হইতে লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—"ওঁকারনাথ, উজ্জয়িনীতে মহাকাল ও গোদাবরীতটে ত্র্যম্বকেশ্বর—এই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করিতে হইবে—ইঁহারা আকর্ষণ করিতেছেন। সকলই গুরুরূপ। রামকৃষ্ণের বোধ হয় বিশেষ ইচ্ছা যে আমি সকল দর্শন করি—তাহা না হইলে এত ইচ্ছা কেন হইবে ? এ মন যে তাঁর কাছে বিক্রীত !"

তীর্থদেবতার বিশেষ প্রকাশ হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার জন্য তিনি প্রত্যেক তীর্থস্থানে কিছুকাল করিয়া কাটাইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রয়াগ হইতে নর্মদা তীরস্থিত ওঁকারনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ-দর্শনে গমন করিলেন। সেই মহাপবিত্র শৈবতীর্থে শিবভক্ত শিবানন্দের প্রাণ গভীর অব্যক্ত আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। ওঁকারনাথে কিছুকাল তপস্যায় কাটাইয়া তিনি আসিলেন ত্র্যম্বকেশ্বরে। পরে কিছুদিন পঞ্চবটীতে অবস্থান করিয়া বোম্বাই উপস্থিত হইলেন। ঐ জনবহুল কোলাহলপূর্ণ নগরী তাঁহার আদৌ ভাল লাগিল না। পাঁচ-ছয় দিন মাত্র বোম্বাইএ থাকিয়া তিনি পুণায় আসিয়া তথাকার প্রাচীন

দেবালয় ৺সোমেশ্বর শিবমন্দিরে কিছুদিন তপস্যায় অতিবাহিত করিলেন। মন্দিরের পূজারীগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তপস্যার অনুকূল ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরে অবস্থানকালে ৺রামেশ্বর হইতে প্রত্যাগত পীড়িত দুই জন ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। শিবানন্দের ৺রামেশ্বর-দর্শনের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঐ অঞ্চলে জলহাওয়া তখন মহা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ঐদিকে যাইতে নিষেধ করিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে ঐ ব্রাহ্মণদ্বয়ের নিষেধ শ্রীগুরুদেবেরই সতর্ক ইঙ্গিত মনে করিয়া শিবানন্দ ৺রামেশ্বরদর্শনের সংকল্প আপাততঃ পরিত্যাগ করিয়া গোদাবরীতটে পঞ্চবটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং 'করতল-ভিক্ষা তরুতল-বাস'-ব্রত গ্রহণকরতঃ তপস্যায় রত হইলেন। সীতারামেব পবিত্র স্পর্শ বুকে করিয়া পঞ্চবটী যুগযুগান্তর হইতে মহাতীর্থে পরিণত—কতশত ভক্ত, সাধক ঐ তীর্থে শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। 'যিনি রাম যিনি কৃষ্ণ' তিনি ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে ভূভার-হরণের জন্য ধরণীর বুকে পদার্পণ করিয়াছেন। রামরূপে শ্রীগুরুদেবের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভে শিবানন্দ আত্মানন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। সন্ধ্যাকালে যখন অগণিত ভক্তবৃন্দ শ্রদ্ধানম্রচিত্তে সীতারামের জয়ধ্বনিতে গোদাবরীতট মুখরিত করিত আর শত শত স্থানে সন্ধ্যা-আরাত্রিকের মধুর ঘন্টা বাজিয়া উঠিত, ধ্যানোপবিষ্ট শিবানন্দের প্রাণেও তখন সীতারামের জীবন্ত আবির্ভাব আনিয়া দিত। কিছুকাল পঞ্চবটীতে কাটাইবার পরে অত্যধিক কঠোরতার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি পুনরায় ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে ত্রিবেণীসঙ্গমে ফিরিয়া আসেন এবং ঐ পবিত্রতীর্থে কল্পবাসমানসে ঝুসিতে আসিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার শুধু পা শুধু গা—একটিমাত্র ভোটকম্বল অবলম্বন আর নিত্য ত্রিবেণীস্নান। তিনি সকালবেলা ছত্র

হইতে সামান্য রুটি-ডাল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ঐ যে ভজন-সাধনে বসিতেন আর বাহির হইতেন না। সেই সময় স্বামী অভেদানন্দও প্রয়াগে তপস্যায় নিরত। দুই গুরুভাই একসঙ্গে মিলিত হইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে মকরসংক্রান্তিস্নান। মাঘ-স্নানসমাপনান্তে শিবানন্দ আসিলেন শিবক্ষেত্র কাশীধামে। বিশ্বনাথের পুরীর প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক আকর্ষণ বরাবরই ছিল। কাশীতে বংশীদত্তের বাগানবাড়ীতে উঠিয়াছিলেন।

এদিকে মঠও অনুমান ১৮৯২ সালের প্রথমভাগে বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইল। এই সংবাদ পাইয়া এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিও আগতপ্রায় দেখিয়া (১৮৯২ সালের) ঠাকুরের জন্মতিথির দিন মহাপুরুষজী আলমবাজার মঠে প্রত্যাগমন করেন। জন্মতিথির পর সাধারণ মহোৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। ১৮৯২ সালের ৬ই মে তারিখে আলমবাজার মঠ হইতে লিখিত তাঁহার একখানি চিঠিতে তৎকালীন মহোৎসবের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়, "শ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব এবার মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। কলিকাতাস্থ প্রায় ১৫০০ সুশিক্ষিত ভদ্রলোক আসিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রায় ৫।৬ সম্প্রদায় হরিকীর্তন করিয়াছিলেন। এক সম্প্রদায় তাঁহার পবিত্র জীবন-চরিত পাঠ করিয়া সকল লোককেই আনন্দে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। যে কুটীরে তিনি অবস্থান করিতেন এবং যে স্থানে তিনি তপশ্চর্যা ইত্যাদি করিয়াছিলেন বহুতর লোক সেই সেই স্থানে যাইয়া আনন্দে হরিকীর্তন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছিলেন। ইংরেজীশিক্ষিত লোক অধুনা বঙ্গদেশে যে এমন ভক্ত হইতেছেন—তা কেবল ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা।"

ঐ কালে[১] শিবানন্দ শ্রীগুরুদেবের ভাবে এতই ভাবিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার মনোরাজ্য শ্রীরামকৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিল। ঐ উৎসবের পরে তাঁহার মনে শ্রীগুরুদেবের পবিত্র জন্মস্থান কামারপুকুরদর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা অতীব প্রবল হইয়া উঠিল। মার্চ মাসের শেষভাগে তিনি শশী মহারাজকে সঙ্গে করিয়া শ্রীভগবানের বাল্যলীলাস্থলে কিছুকাল বাস করিবার মানসে গমন করেন। ঐ পুণ্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া শিবানন্দের মনে এক দিব্য ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হইল—মনের আবেগে তিনি ঠাকুরের জন্মভিটার পবিত্র ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কামার-পুকুরের আকাশ-বাতাস, জনমানব, বৃক্ষলতা, প্রতিধূলিকণাই যে কত

---

১ যখন তিনি নাসিক প্রভৃতি স্থানে তপস্যা করিতেছিলেন তখন তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। শিবানন্দ কঠোর সন্ন্যাসী হইলেও শুষ্কপ্রাণ ছিলেন না। পিতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কতটা গভীর ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বোঝা যায়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "গোদাবরীতীরে নাসিক প্রভৃতি স্থান হয়ে পরে মঠে এলাম—মঠ তখন আলমবাজারে। শশী মহারাজ আমাকে দেখে কি যেন বলতে ইতস্ততঃ করছেন। আমি বললাম—'কি, বলই না!' 'আপনার বাবার দেহত্যাগ হ'য়েছে। তাতে আর কি! তুমি বল্‌তে কিন্তু কিন্তু কর্‌ছ কেন? বহুকাল তো বাবার সঙ্গে সব সম্বন্ধ কাটিয়ে এসেছি। তা বাবা খুব সাধক লোক ছিলেন—আর ত্যাগী। অত টাকা রোজগার করেছিলেন কিন্তু একটা বাড়ীও করেন নি।' পিতৃদেবের দেহত্যাগের সংবাদ শুনিয়া তিনি একবার নিজ জন্মস্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং পিতার শ্মশানে প্রণাম করিয়া গড়াগড়ি দিয়া অশ্রুজলে পিতৃদেবের তর্পণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনে জানা যায় ঠাকুর মাতৃদেবীর দেহত্যাগের পর গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু করিতে পারেন নাই। 'গলিত হস্ত'—অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। তখন অশ্রুজলে তর্পণ সমাপন করিয়াছিলেন। (সন্ন্যাসীর ঊর্ধ্বদৈহিক কর্মাদি করার বিধি নাই)

পবিত্র! 'অবতারবরিষ্ঠের' পুণ্যপাদস্পর্শে ঐ স্থান যে শ্রীবৃন্দাবনতুল্য! যে পর্ণকুটীর শ্রীভগবানকে আশ্রয় দিয়াছিল সেই কুটীর এখনও সগৌরবে বর্তমান। আর সেই চিরজীবন্ত জাগ্রত-দেবতা রঘুবীরের ঘর এবং বাড়ীর পার্শ্বেই সেই জলাশয় যেখানে বালক গদাধর স্নান করিতেন—সকলই রহিয়াছে। এখনও যেন নিস্তব্ধ রজনীতে কান পাতিয়া শুনিলে গদাধরের সুমধুর সঙ্গীতলহরী শুনিতে পাওয়া যায়! অদূরবর্তী শিবমন্দির, হালদার-পুকুর, ভূতির খাল, আম্রকানন, সবই তো রহিয়াছে—অথচ কিন্তু তিনি আজ কোথায়? শ্রীগুরুদেবের অদর্শনব্যথা শিবানন্দকে অধীর করিয়া ফেলিল। তাঁহারা দুই জনেই কখনও বা আম্রকাননে কখনও বা একান্তে 'বুধুই মোড়ল' শ্মশানে গিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন; অনেক সময় ভজন-গানে নানা মন্দিরে মন্দিরে অতিবাহিত করিতেন। এইভাবে কয়েকদিন বাস করিবার পরেই শিবানন্দ কঠিন জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়েন কিন্তু তাঁহার মন তখন বিচরণ করিতেছিল দেহজ্ঞান-অবস্থার বহু ঊর্ধ্বে —আনন্দময় লোকে। শরীরের উপর দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি ঐ অসুস্থ শরীরেই মাসাধিক কাল কামারপুকুরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কামারপুকুর হইতে শিবানন্দ আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন। দীর্ঘকাল তপশ্চর্যার ফলে প্রব্রজ্যা-জীবনে তাঁহার নানাপ্রকার উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হইয়াছিল। তাঁহার তৎকালীন নির্লিপ্ত ও আত্মারাম ভাব লক্ষ্য করিয়া মঠবাসিগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শিবানন্দের তৎকালীন

২ ১৮৯২ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে লিখিত স্বামী সারদানন্দের চিঠিতে জানা যায়, "স্বামী শিবানন্দ পরমহংসদেবের জন্মস্থানদর্শন করিতে আজ ১৬দিন হইল গিয়াছেন।" ঐ যাত্রায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও শিবানন্দের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা জয়রামবাটীতেও গিয়াছিলেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিবার জন্য।

মানসিক অবস্থা ও তাহার বাহ্যিক অভিব্যক্তির বর্ণনা করিতে গিয়া জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন—"তারকদা সর্বাবস্থায়ই আপনভাবে বিভোর, আত্মহারা। বাহ্যিক কোন বস্তুর সহিত তাঁহার সংশ্রব নাই। তাঁহার মন যেন দেহবুদ্ধির অতি উর্ধ্বে কোন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিত। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি স্নেহপূর্ণ, পাদবিক্ষেপ ধীর; নিঃসঙ্গ ভাব—জগতে আছেন কিন্তু জগতের সঙ্গে পার্থিব কোন সম্বন্ধ নাই—সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তিনি স্বল্পভাষী ও সংযত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুখে একটা কান্তি ও অতি স্নিগ্ধগম্ভীর ভাব পরিলক্ষিত হইত। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন ধ্যানানন্দে মগ্ন হইয়া আছেন। পরস্পরের হাসি-তামাসায় তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া যোগ না দিলে তাঁহার সহিত কেহ হাসিতামাসা করিত না। তাঁহার ধীর-শান্ত মুখমণ্ডল দেখিলেই মনে হইত তিনি যেন অন্তরে, প্রাণে আনন্দ ও শান্তি সম্ভোগ করিতেছেন—আত্মানন্দে মগ্ন।"

কাশীপুর বাগানে নির্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ যখন শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রণত হইলেন, তখন ঠাকুর সস্নেহ দৃষ্টিতে বলিয়াছিলেন, "তুই যা পেয়েছিলি তা তো পেয়েছিস্, এখন চাবি আমার হাতে রহিল। তাঁর কাজ শেষ হ'লে আবার এ অবস্থা ফিরে পাবি।" ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ সেই নির্বিকল্প অবস্থায় ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া থাকিবার ব্যর্থ প্রয়াসে অশান্তপ্রাণে কত তীর্থ, কত মন্দির-দেবালয়, গিরিকন্দর ও দুর্গম পর্বতে ভ্রমণ করিয়া কতদিন অনাহারে, অনিদ্রায় কাটাইয়াছিলেন—হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়াছিলেন সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তিলাভের আশায়! যিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের আপ্তকাম ঋষি তাঁহার প্রাণে এ অশান্তি কেন? স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যিনি যুগবতারের স্নেহের পুতুলি, তাঁহার

কঠোর তপস্যা, হৃদয়ের মর্মন্তুদ বেদনা, ভীষণ নৈরাশ্য ও 'হা হতোঽস্মি' কেন? তাঁহাকে যে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধির আনন্দ কতবার সম্ভোগ করাইয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও এ কি? এ দৈবী প্রহেলিকার ঘন আবরণ কে উন্মোচন করিবে? ইহা কি সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দকে নানাভাবে সম্ভোগের প্রচেষ্টা, না যুগ-প্রয়োজনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আত্মগোষ্ঠীকে সমাধির আনন্দে মগ্ন থাকিতে না দিয়া জগদ্ধিতায় কর্মে নিয়োজিত করিবেন বলিয়া, অথবা জগতের সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ দেখাইবার জন্য?

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ যে মানসিক অশান্তিতে ছটফট্ করিতেছিলেন, উহা শিবানন্দকেও এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ জীবৎকালেই তাঁহাকে একাধিকবার সমাধির আনন্দে মগ্ন করিয়াছিলেন, যদিও তিনি গুরুকৃপাবলে কঠোর তপস্যা ও সাধনাসহায়ে স্বাভাবিক আনন্দময় ভাবে এখন প্রতিষ্ঠিত, তথাপি ইহাতেও তিনি তৃপ্ত নন। তিনি চান সেই আনন্দকে নানাভাবে সম্ভোগ করিতে—সর্বাবস্থায় সেই আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে—শ্রীগুরুদেবকে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করিতে। তাই আমরা দেখিতে পাই কিছুকাল গুরুভাইদিগের সঙ্গে কাটাইয়া ১৮৯২ সালের শেষভাবে শিবানন্দ পুনরায় পরিব্রজ্যায় বহির্গত হইয়াছেন। প্রথমে প্রয়াগে কিছুদিন কাটাইয়া, পরে সাহারাণপুর হইয়া ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। ঐ পুণ্যক্ষেত্রে উপনীত হইয়া সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাচীন স্মৃতির সঙ্গে তিনি যেন এক হইয়া গেলেন। ধ্যাননেত্রে দেখিতে পাইলেন শ্রীভগবানকে সখা অর্জুনের সঙ্গে, যেন শুনিতে পাইলেন হৃষীকেশের পাঞ্চজন্য-নিনাদ, আর সর্ব-উপনিষদের সার গীতার উপদেশ। কুরুক্ষেত্রে এইভাবে কয়েকদিন কাটাইয়া জ্বালামুখীতে আসিলেন। ঐ জাগ্রত পীঠস্থানে শিবানন্দের হৃদয়-মন জগন্মাতার ভাবে তন্ময় হইয়া

গেল। জ্বালামুখীর নিকটবর্তী তীর্থস্থানাদি দর্শন করিয়া তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় আম্বালায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়কার প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে একদিন বলিয়াছিলেন, "তখন প্রাণে খুব ব্যাকুলতা ও অশান্তি। চল্‌তে চল্‌তে ভগবানের স্মরণ-মনন হত, আর ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতাম। লোকজনের সঙ্গ মোটেই ভাল লাগিত না। যে-সব রাস্তা দিয়ে সাধরেণতঃ লোক চলাচল করে, সেই-সব রাস্তা দিয়ে প্রায়ই যেতাম না। সন্ধ্যা হলে কোথাও থাকার আস্তানা খুঁজে নিয়ে নিজের ভাবেই রাত কাটিয়ে দিতাম। সাধন-ভজনের প্রকৃষ্ট সময় তো রাতই। বাইরের কোলাহল কিছুমাত্র থাকে না, মন স্বতঃই শান্ত হয়ে আসে। এইভাবে অনেক দিন বেড়িয়ে কাটিয়েছি। এরকম নিঃসম্বল অবস্থায় কিছুদিন কাটালে ভগবানের উপর একটা পূর্ণ নির্ভরতা আসে। সম্পদে, বিপদে তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্তা, এ ভাবটা বেশ পাকা হয়ে যায়।"

ঐ নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক-জীবনে তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব-সরোবরে কত নব নব সুরভি কমল যে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, যাহার আনন্দ-সৌরভে মন-অলি মত্ত হইয়া অমৃত-মধুপানে আত্মহারা হইয়া যাইত তাহা জগতের কাছে অজ্ঞাত। ঐ আনন্দ-সম্ভোগের জন্য তিনি আরও কিছুকাল যে পবিত্র তীর্থাদিতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় আলমোড়া হইতে ১৮৯৩ সালের ৮ই মে তারিখের এক পত্রে—"পাঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে বরাহ-অবতারের জন্মস্থানে আসি। স্থানের নাম সারোঁ (Saroa), ইহা এটা জেলার অন্তর্গত। পরে সহস্রবাহুর (পরশু-রামের) জন্মস্থানে আসি—ইহা বাদাওন জেলার অন্তর্গত। তৎপরে এখানে আসিয়াছি। এখানে পূর্বেও একবার আসিয়াছিলাম। নরেন্দ্রবাবাজী প্রভৃতিও কিছুদিন এস্থানে ছিলেন। ইহা কেদারখণ্ডের অন্তর্গত।"

বরাহনগর মঠ ও পরিব্রজ্যা

কঠোর পরিব্রাজকরূপে কয়েক মাস নানা তীর্থে ভ্রমণের পর তিনি পুনরায় তপোগম্ভীর হিমালয়ে আসিয়া তীব্র সাধন-ভজনে মগ্ন হইলেন। পার্বত্য শীতল আবহাওয়া ভজন-সাধনের পক্ষে অনুকূল মনে করিয়া মহানন্দে কয়েক মাস আলমোড়া ও তৎসন্নিকটস্থ পাতালদেবী এবং আরও কয়েকটি নির্জন স্থানে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার মনের তৎকালীন আনন্দাবস্থার কতকটা আভাস একখানি চিঠিতে পাওয়া যায়—"আমার মানসিক অবস্থা এখন উত্তম আছে। সময় প্রায় ধ্যানে ও মননে বীত হয়—কথনও বা পাঠেও হয়; কিন্তু তাহা অতি অল্প, কারণ পাঠকালীন কোন-একটি ভাবপূর্ণ শ্লোক বা কথাতে মন বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া যায়, তাহার পর পাঠে ইচ্ছা হয় না। সেই ভাব লইয়া চিত্ত ক্রমে ক্রমে প্রশান্ত হইয়া মহানন্দ উপভোগ করে। নির্জন বনাদি দর্শন করিয়া চিত্তের যে শান্তি হয় সে অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

এই সময় কখনও কখনও তিনি দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করিয়া দিনযাপন করিতেন। যদিও তিনি অজ্ঞাতবাসের জন্য লোকদৃষ্টিকে এড়াইয়া আপন সাধনে মগ্ন থাকিতেন, তথাপি ক্রমে ক্রমে বহু ধর্মপিপাসুর দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইতে লাগিল। তিনিও অবসরমত সমাগত উপদেশ-প্রার্থিগণকে শ্রীগুরুদেবের ভাগবত জীবনকথা শুনাইতে লাগিলেন। সেই সময় লণ্ডন থিওসফিক্যাল সোসাইটীর ই টি ষ্টার্ডি নামক জনৈক ইংরেজ সাধক যোগ-সাধন করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়া আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন; তথায় তিনি থাগমাড়া নামক মহল্লায় থাকিতেন। শিবানন্দের পূতসঙ্গলাভ করিয়া ষ্টার্ডি তাঁহার প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি শিবানন্দকে তাঁহার নিজের কাছে লচ্ছিরাম সার বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দকে

পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে বেদান্ত-প্রচারকার্যে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে আলমোড়া হইতে লিখিত একখানি চিঠিতে শিবানন্দের "মনের পরাধীনতা ও মর্ত্যতা এবং আত্মার স্বাধীনতা ও নিত্যতা অনুভব" করিবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাতালদেবী হইতে আর এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "প্রগাঢ় ধ্যানকালে যে বিমল আনন্দ অনুভব হয়, তাহার মাদকতা-শক্তি চিত্তে চব্বিশ ঘণ্টা সংলগ্ন থাকে—যে কার্যই করুক না কেন কখনই সে তন্তু বিচ্ছিন্ন হইবে না।"

এইভাবে আলমোড়ায় কিছুকাল কাটাইবার পর তাঁহার ৺রামেশ্বর-দর্শনের ইচ্ছা আবার বলবতী হইয়া উঠিল। তদনুসারে ১৮৯৩ সালের ২রা অক্টোবর তিনি আলমোড়া পরিত্যাগ করিয়া নৈনিতাল, বেরেলি, বাদাউন এবং তথা হইতে আগ্রা, বৃন্দাবন, জয়পুর, আবু, বোম্বাই হইয়া ক্রমে মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন। ইতোমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির বার্তাবহ হইয়া আমেরিকায় উপস্থিত হইয়াছেন। চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে তাঁহার বিজয়ভেরী জীমূতমন্দ্রে নিনাদিত হইয়াছিল। উহার প্রতিধ্বনি ভারতেও আসিয়া পৌঁছিল। স্বামিজীর একান্ত অনুগত মাদ্রাজের যে উৎসাহী যুবকবৃন্দ তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, স্বামিজী আমেরিকা হইতে তাঁহাদিগকে গভীরউদ্দীপনাপূর্ণ পত্রাদি লিখিতেন। ঐ যুবকদলের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা শিবানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য জানিতে পারিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে কিছুদিন মাদ্রাজে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শিবানন্দও ভক্তবৃন্দের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া কয়েক দিন তথায় থাকিয়া শ্রীগুরুদেব-আচরিত ও প্রদর্শিত উদার ধর্মমত-ব্যাখ্যা দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত

করিয়াছিলেন। ভক্তগণ মহাপুরুষজীর কঠোর সন্ন্যাস-জীবন, ত্যাগদীপ্ত মূর্তি ও সপ্রেম মধুর ব্যবহারে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। স্বামিজীর স্বহস্ত-লিখিত অনেকগুলি চিঠি ঐ ভক্তবৃন্দের নিকট দেখিতে পাইয়া শিবানন্দ বিশেষ আনন্দিত হন। ঐ সকল চিঠিতে স্বামিজী তাঁহার আমেরিকার কার্যের আশাতীত সফলতা, সর্বত্র তাঁহার সমাদর ও সমগ্র পাশ্চাত্ত্যে বেদান্তের মহিমা-ঘোষণা প্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিয়াছিলেন।[১] মাদ্রাজ হইতে মহাপুরুষজী কাঞ্চী যান এবং ক্রমে চিদম্বরম্ হইয়া কাডালোর নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন। তৎপরে তিনি মাদুরা হইয়া রামেশ্বরে উপনীত হইলেন।

প্রায় তিন বৎসর পূর্বে হৃদয়ে শ্রীগুরুদেবের প্রেরণা অনুভব করিয়া তিনি ৺রামেশ্বরদর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন; কিন্তু তখন মনোরথ সফল হয় নাই। এখন সেই দীর্ঘকাল-বাঞ্ছিত ৺রামেশ্বরের দর্শনলাভে তাঁহার প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। যে কয়দিন ওখানে ছিলেন দেবাদিদেবের ভাবে ভরপুর হইয়া গিয়াছিলেন। রামেশ্বর হইতে শ্রীরঙ্গনাথজীর দর্শন-

১ মাদ্রাজে ভক্তদিগের নিকট স্বামিজীর চিঠিগুলি পড়িয়া মহাপুরুষজী বাঙ্গালোর হইতে (২৩।২।৯৪) প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—"বিবেকানন্দ (মাদ্রাজবাসীদিগকে লিখিত) পত্রে তর্ক করিয়া কিছুই লেখেন নাই। তবে আমি যতদুর বুঝিতে পারিতেছি তাহাতে এই অনুমান হয় যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের সভ্য জাতির মধ্যে আমেরিকা প্রথমশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। ইহারা যদ্যপি হিন্দুধর্মের গৌরব ও মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে পাশ্চাত্ত্যের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য জাতিও তাহাদের অনুকরণ করিতে অবশ্যই বাধ্য এবং ইংরেজ জাতি যদি এরূপ করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ভারতবর্ষের যে বিশেষ কল্যাণ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মানসে তিনি কাবেরীতীরে শ্রীরঙ্গমতীর্থে আসিলেন। 'সকলই গুরুরূপ' এই উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শিবানন্দ নানা তীর্থরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া তীর্থদেবতাদিগের জীবন্ত- প্রকাশ অনুভব করিতে লাগিলেন নানাভাবে। স্বামী শঙ্করানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "দক্ষিণভারতে তীর্থভ্রমণ-সময়ে মহাপুরুষজী কাঞ্চী প্রভৃতি স্থান এক কৌপিন পরে বৈরাগী সাধুদের সঙ্গে বেড়িয়েছিলেন।"

ইতঃপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যখন পরিব্রাজক অবস্থায় বাঙ্গালোর ও মহীশূর-অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন বহু ব্যক্তি তাঁহার অলৌকিক চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে সম্মান ও পূজা করিয়াছিলেন। স্বামিজীরই একজন গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দের দক্ষিণভারতে তীর্থভ্রমণের সংবাদ মাদ্রাজ হইতে অবগত হইয়া ভক্তগণ এখন শিবানন্দকে একবার বাঙ্গালোর-অঞ্চলে পদার্পণ করিবার জন্য সানুনয় আহ্বান জানাইলেন। তদনুসারে মহাপুরুষজী ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাঙ্গালোর গমন করেন। তাঁহাকে পাইয়া তথাকার ভক্তদের আনন্দের সীমা রহিল না। শিবানন্দও তাঁহাদের নিকট শ্রীগুরুদেবের অলৌকিক জীবনচরিত-কীর্তন ও সর্বধর্মসমন্বয়রূপ উদার ধর্মমতের প্রচারদ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালোর হইতে মহীশূর-অঞ্চলে গিয়া শ্রীরামানুজাচার্যের পবিত্রস্মৃতিজড়িত মেলকোট প্রভৃতি তীর্থদর্শন করিবারও তাঁহার খুবই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বাঙ্গালোরের ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিলেন না। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি আগতপ্রায় দেখিয়া মাদ্রাজের ভক্তগণ ঐ বৎসর বিরাটভাবে যুগাবতারের জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের একজন সন্তানকে তাঁহাদের মধ্যে পাইবার আশায় শিবানন্দকে মাদ্রাজে ফিরিয়া

আসিবার জন্য তাঁহারা বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া লিখিলেন। ভক্তগণের সাদর আহ্বান মহাপুরুষজী প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না, মাদ্রাজে আসিয়া তিনি ঠাকুরের উৎসবে যোগদান করিলেন। সমগ্র মাদ্রাজ ঐ উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠিল; শিবানন্দও শ্রীগুরুদেবের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সহরের নানাস্থানে আলাপ-আলোচনাদি দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম জীবনের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ অনাড়ম্বর প্রচারকার্য সকলের প্রাণে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে মাদ্রাজের ভক্তগণ শিবানন্দের বিশেষ প্রশংসা করিয়া আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সকল সংবাদ জানাইয়াছিলেন। স্বামিজীও তাহাতে আনন্দিত হইয়া ব্রহ্মানন্দকে লিখিলেন, "মাদ্রাজ হইতে তারকদা সম্বন্ধে সমস্ত খবর অবগত হইয়াছি। মাদ্রাজের ভক্তেরা তাঁহার কাজে খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছে।" পরে শিবানন্দকেই স্বামিজী লিখিয়াছিলেন, "তারকদা, আপনি যদি মাদ্রাজে যান এবং তথায় কিছুকাল থাকেন তাহা হইলে যথেষ্ট কাজ হইবে।" এবং অখণ্ডানন্দকে তিনি জানান, "তারকদা মাদ্রাজে অনেক কাজ করিয়াছেন; বড়ই আনন্দের কথা। মাদ্রাজের লোকেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাকে লিখিয়াছে।"

এইরূপে দক্ষিণ ভারতের তীর্থসমূহদর্শন এবং বহুস্থানে শ্রীগুরুদেবের সমন্বয়-বাণী ও ত্যাগধর্মের মহিমা প্রচার করিয়া শিবানন্দ পুনরায় আলমবাজার মঠে গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এতদিনে মঠও খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। স্বামিজীর বিদেশ-অভিযান, চিকাগো ধর্মমহাসভায় বেদান্তের পতাকা-উত্তোলন, আমেরিকায় হিন্দুধর্মের জয়যাত্রা ও সমাদর—এই সকল ঘটনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সারাভারতে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নরনারীর কৌতূহলদীপ্ত দৃষ্টি বিশেষ করিয়া নিবদ্ধ

হইল দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটী-সাধনপীঠে এবং ঐ সাধনবেদীমূলে উৎসর্গীকৃত-জীবন নবীন সন্ন্যাসিগণের আলামবাজার মঠের উপর। এদিকে ভারতের নানাস্থানে সভাসমিতি এবং দক্ষিণেশ্বরের নরদেবতার জীবনবেদের আলোচনা চলিতেছিল পূর্ণোদ্যমে। কলিকাতাতেও স্বামিজীর মহিমা ঘোষণা করিয়া বক্তৃতাদি হইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী বহুস্থান হইতে ধর্মপিপাসুগণ আলমবাজার মঠে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। কতিপয় শিক্ষিত যুবক সর্বস্বত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে স্থায়িভাবে যোগদান করিলেন, আরও বহু যুবক ঐ উদ্দেশ্যে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। মঠেও তখন চলিতেছিল একনিষ্ঠ সাধনা সমভাবে। দিকে দিকে তাঁহার মহিমা ঘোষিত হইতেছে দেখিয়া মঠবাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণজীবন-প্রেমমদিরা পান করিয়া আরও মাতিয়া উঠিলেন।

দীর্ঘদিন পরে মঠের ভাইরা মহাপুরুষজীকে পাইয়া খুবই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু শিবানন্দের প্রাণে তপস্যার অগ্নি এখনও নির্বাপিত হয় নাই—তাঁহার মন ছুটিতেছিল পুনরায় হিমালয়ের বিজন পার্বত্য প্রদেশে। এবার চলিলেন উত্তরকাশী অভিমুখে। পথে তিনি কাশীতে একদিন ও লক্ষ্ণৌতে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সঙ্গে তাঁহার লাক্ষ্ণৌতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ দুজন গুরুভ্রাতাও সেই সময় পরিব্রাজকরূপে নানা স্থানে তপস্যায় অতিবাহিত করিতেছিলেন। অনেকদিন পরে দেখা হওয়াতে তিন জনেই খুব আনন্দিত। প্রাণে কত পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—তাঁহারা "সারারাত ছাদের উপর গল্প করিয়া কাটাইয়া দিয়াছিলেন।"

উত্তরকাশীর পথে মুসৌরী পাহাড়ে পৌঁছিয়া চৌদ্দদিন পরে ৬।৭।৯৪

তারিখে শিবানন্দ একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"চাতুর্মাস্য উত্তর-কাশীতেই করিব। কল্য এখান হইতে যাত্রা করিব।" মুসৌরী পরিত্যাগ করিয়া তিনি ক্রমে হিমালয়ের নিবিড় বনস্থলীর ভিতর দিয়া ব্যাঘ্রাদি-হিংস্রজন্তু-বহুল দুর্গম গিরি-পথে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। 'ভিক্ষান্নমাত্রেন চ তুষ্টিমন্তঃ' হইয়া, অঞ্জলি পুরিয়া নির্ঝরিণীর নির্মল জল পান করিয়া উচ্ছ্বসিত প্রাণে আপন মনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখনকার দিনে উত্তরকাশীতে খুব অল্পসংখ্যক সন্ন্যাসীই বাস করিতেন। উত্তরকাশীতে পৌঁছিয়া শিবানন্দ গঙ্গাতীরে একটি কুঠিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সাধনভজনে ডুবিয়া গেলেন। একবার মাত্র তিনি বাহির হইতেন ভিক্ষার জন্য—তাহাও সকলদিন খেয়াল থাকিত না।

অত্যুচ্চপর্বত-আবেষ্টিত ক্ষুদ্র সমতল ভূমির উপর অবস্থিত উত্তরকাশী। পূতসলিলা জাহ্নবী তিনদিকে বৃত্তাকারে প্রবাহিত হইয়া ঐস্থানের উচ্চ অধ্যাত্মিক আবহাওয়াকে যেন যুগযুগান্তর ধরিয়া আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ঐ জনকোলাহলশূন্য উত্তরকাশীতে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কালভৈরব, বটুকভৈরব, সঙ্কটমোচন প্রভৃতি ৺কাশীর সকল দেবদেবীর সমাবেশ—প্রাণে স্বতঃই উচ্চ ধর্মভাবের প্রেরণা আনিয়া দেয়।

শিবানন্দ ঐ রমণীয় তপঃক্ষেত্রে তন্ময়চিত্তে সাধনায় মগ্ন থাকিয়া চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপন করিলেন। উত্তরকাশী হইতে ফিরিয়া আসিলেন পুনরায় লক্ষ্ণৌতে। ততদিনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ তথা হইতে ফৈজাবাদে চলিয়া গিয়াছেন। শিবানন্দ ফৈজাবাদে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং কয়েক দিন পরমানন্দে একত্রে কাটাইয়া হরি মহারাজকে সঙ্গে করিয়া মঠে ফিরিলেন।[১] তিনি কয়েক মাস মঠে ছিলেন

১ স্বামিজীর ঐ সময়ে লিখিত এক চিঠিতে দেখিতে পাওয়া যায়—"তারকদা

এবং পুনরায় ১৮৯৫ সালের প্রথম ভাগে তপস্যায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কানপুর হইয়া আসিলেন ব্রহ্মাবর্ত বিঠুরে এবং কয়েকমাস ঐ অঞ্চলে তপস্যায় অতিবাহিত করিলেন। বিঠুরগমন ও তৎকালীন প্রব্রজ্যাজীবনের প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন, "এই দেখ না, শরীরের কি অবস্থা! এখন দু পা চলতেও কষ্ট হয়। অথচ এই শরীর, এই পা-ই ত কত পাহাড়-পর্বত চলে বেড়িয়েছে—কত দেশদেশান্তর ঘুরেছে, কত কঠোরতা করেছে! এমন অনেক সময় গেছে যখন একখানা কাপড়ের বেশী সঙ্গে থাকত না। সেই এক কাপড়ই অর্ধেক পরে আর অর্ধেক গাঁতি মেরে গায়ে জড়িয়ে পথ চলতাম। পথে চলতে চলতে হয়ত কোন কুঁয়াতে স্নান করে কৌপীন পরে থেকে কাপড়খানি শুকিয়ে নিতাম। কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে। তখন মনে তীব্র বৈরাগ্য। শারীরিক আরামের কথা মনেই হত না। কঠোরতাতেই আনন্দ। কত তো নিঃসম্বল অবস্থায় বেড়িয়েছি; কিন্তু কখনও কোন বিপদে পড়তে হয় নি। ঠাকুরই সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থেকে সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন। কখনও অভুক্তও রাখেন নি—অবশ্য এমন দিন গিয়েছে যে খুব সামান্যই আহার জুটেছে। একদিনের কথা বেশ মনে আছে। বিঠুরে যাচ্ছি একজন সাধুকে দর্শন করতে। দুপুরে পথে এক জায়গায় গাছতলায় বিশ্রাম করছি। তখনও খাওয়া হয় নি। নিকটে লোকালয় ছিল না। এমন সময় পাশের বেলগাছ থেকে একটা পাকা বেল ধুপ্ করে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল।

ও হরির আগের লিখিত এক পত্র শেষে পাই। তাহাতে অবগত হইলাম যে তাঁহারা কলিকাতায় আসিতেছেন।"

তখন সেই বেলটি কুড়িয়ে এনে তাই খেয়ে সেদিন কাটিয়ে দিলাম। বেশ বড় বেল ছিল।[১]

বিঠুরে খণ্ডরাও নামক একজন অতি প্রাচীন সাধুকে দর্শন করিয়া মহাপুরুষজী খুবই আনন্দিত হন।

পরিব্রজ্যা-কালীন অন্যান্য সাধু মহাত্মাদের দর্শন-প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন, "পওহারী বাবাকে দেখি নি। ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দুবার দেখেছি—একবার বসা, একবার শোয়া। ভাস্করানন্দ স্বামীকে স্বামিজী, গোপালদা ও বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে দেখতে যাই।... চামেলী পুরীর কথা শেষটায় শুনি, খুব ত্যাগী—চানা গুড় ছেলেদের দিতেন, মায়ের—ভগবতীর ভক্ত। নবরাত্রির ন দিন উপোস দিতেন। মণিরাম বরাবর নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিভাবে ছিলেন। খুব ত্যাগী, পবিত্র—তবে ব্রাহ্মণাভিমান যায় নি। ভাস্করানন্দ স্বামীর খুব প্রতিষ্ঠা ও কঠোরতা ছিল—বার-তেরটি রাজা শিষ্য হয়েছিল।"

ব্রহ্মাবর্ত হইতে কানপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে ঘুরিয়া মহাপুরুষজী কাশীধামে আসিলেন এবং প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে

১ অন্য একবার বলিয়াছিলেন, "নর্মদাতীরে গোবিন্দপাদ শঙ্করের গুরু ছিলেন। বেশ জায়গা, তপস্যার অনুকূল স্থান। আমিও নর্মদাতীরে কিছুকাল ছিলাম। দীনু (স্বামী সচ্চিদানন্দ) আর দক্ষ (স্বামী জ্ঞানানন্দ) সঙ্গে ছিল। সকাল-সন্ধ্যায় বহু সাধু-ভক্ত সুর করে শিবের স্তব নিত্য পাঠ করত। চমৎকার লাগত, খুবই উচ্চভাবোদ্দীপক। অমরকণ্টক, জব্বলপুর, ব্রোচ প্রভৃতি স্থানেও কিছুদিন ছিলাম। অমরকণ্টকে এক ব্রহ্মচারীর কুঠিয়ায় থাকতাম। সে সব এক দিনই গেছে! কাশীতে বংশীদত্তের বাগানে বা অন্যান্য স্থানেও যখন ছিলাম, খড়ের উপর শুতাম আর খড়ের একখানা চাটাইয়ের আসন করে বসে থাকতাম; খড় বেশ গরম।"

তাঁহারই বাগানবাড়ীতে থাকিয়া তপস্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রমদাবাবু সমগ্র সংযুক্ত-প্রদেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন একনিষ্ঠ সাধক, মহাপণ্ডিত ও প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত উদার ধর্মভাবের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। সেইজন্য স্বামিজীপ্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-তনয়গণ সকলেই তাঁহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন। প্রমদাবাবু-রচিত "ওঁ বিশুদ্ধবিজ্ঞানমগাধসৌখ্যং" ইত্যাদি স্তবটি [১] তাঁহার শ্রীরাম-কৃষ্ণের উপর গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন। স্বামী শিবানন্দকে প্রমদাবাবু

১। মহাপুরুষজী ৺প্রমদাদাস মিত্র-রচিত শ্রীরামকৃষ্ণস্তবটির খুবই উচ্চ প্রশংসা করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি কাশী অদ্বৈত আশ্রমে যখন ঠাকুরপূজা করিতেন তখন ঐ স্তোত্রটি পাঠ করিতে করিতে ঠাকুর তুলিতেন। আশ্রমবাসীদিগকেও স্তবটি কণ্ঠস্থ করিতে বলিতেন। একদিন বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের এত স্তব আছে, কিন্তু এইটিই সব চাইতে চমৎকার। প্রমদাবাবু একাধারে কবি, ভক্ত ও লেখক ছিলেন।"

ওঁ বিশুদ্ধবিজ্ঞানমগাধসৌখ্যং বিশ্বস্য বীজং করুণাপয়োধিঃ।
অনাদ্যনন্তং প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ তত্ত্বমেকং ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ১ ॥
ন নেতি মত্বা শ্রুতয়ো বদন্তি, বদন্তি সাক্ষান্ন চ যৎ কদাচিৎ।
চিদেকরূপঃ শিব ঈশ্বরাণাং, মহেশ্বরোঽসৌ ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ২ ॥
যন্নিত্যমানন্দমখণ্ডমেকং নাম্না শিবং বৈ শ্রুতয়ো গৃণন্তি।
তস্যাবতারো নররূপধারী কৃপাসুধাব্ধির্ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৩ ॥
মমেতি বুদ্ধির্বিষয়েষু যস্য নাসীৎ কদাচিৎ বিষয়াতিগৈব।
স কামিনীকাঞ্চনরিক্তচিত্তঃ কোঽপ্যেক আসীদ্ ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৪ ॥
গম্ভীরপ্রেমাব্ধিতরঙ্গভঙ্গৈরান্দোলিতো যো ভগবদ্বিলীনঃ।
ভক্তির্বিশুদ্ধা স্বয়মাবিরাসীৎ পুংবিগ্রহোঽহো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৫ ॥

অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার পূত সঙ্গলাভের ইচ্ছায় ঐ সময়ে তাঁহাকে সমস্ত শীতকালটা কাশীতে রাখিয়াছিলেন। শিবক্ষেত্রে আসিয়া শিবানন্দও যেন শিবময়প্রাণ হইয়া ভজন-সাধনে ডুবিয়া গেলেন, কখনও বা প্রমদা-বাবুর সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গ ও শাস্ত্রাদি-আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। কাশীর বিখ্যাত বীণকার মহেশবাবু, যাঁহার বীণাবাদন শুনিয়া ঠাকুরের সমাধি হইয়াছিল, প্রমদাবাবুর মাতুল ছিলেন। প্রমদাবাবুও তাঁহার নিকট বীণা বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। একদিন রাত্রে প্রমদাবাবু মহাপুরুষজীকে বীণা শুনাইয়াছিলেন। মহেশবাবু তখন পরলোকগত। এই ভাবে কয়েক মাস ৺কাশীতে অবস্থান করিয়া ঠাকুরের জন্মতিথির পূর্বে মহাপুরুষজী আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন। উহা ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস।

* সোঽপ্যদ্ভুতঃ কশ্চিদচিন্ত্যশক্তির্বন্দ্যঃ প্রশান্তঃ পরিপূর্ণবোধঃ।
জ্ঞানস্য ভক্তেশ্চ বিশুদ্ধমূর্ত্তির্বিমূর্ত্তিরেকো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৬ ॥
বিজ্ঞানপীযূষনিমগ্নমূর্ত্তিঃ পস্পর্শ যান্ যান্ দয়য়া করেণ।
তে কামিনীকাঞ্চনরিক্তচিত্তাঃ সদ্যো বভূবুর্ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৭ ॥
* বন্দ্যং জগদ্বীজমখণ্ডমেকং বন্দ্যঃ সুরাসেবিতপাদপীঠঃ।
বন্দ্যো ভবেশো ভবরোগবৈদ্যঃ স এব বন্দ্যো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৮।

* ভগ্নপ্রক্রমতাদোষবশতঃ দুইটী শ্লোকে
বিভক্তি-পরিবর্তন করিতে হইয়াছে।

স্বামিজীর পার্শ্বে

স্বামিজীর পাশ্চাত্ত্য-বিজয়ের বৈদ্যুতিক প্রভাব ভারতের জাতীয় জীবনের শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র হিন্দুজাতির প্রাণে যেন এক নূতন চেতনার সৃষ্টি করিতেছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত হিন্দুর ঘরে ঘরে বিবেকানন্দ এবং তদীয় গুরুদেবের নাম ধ্বনিত হইতেছিল। শিবানন্দও ইতঃপূর্বে মাদ্রাজ ও সংযুক্তপ্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণকালে ঐ বিষয় সম্যকরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি নিজভাবানুসারে শ্রীগুরুদেবের উদার সনাতন ধর্মমতপ্রচারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যেখানেই যাইতেন, তাঁহার বেদান্তময় জীবন সকলের হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার আদর্শ সন্ন্যাসজীবন অনুষ্ঠানমূলক ধর্মের জীবন্ত ব্যাখ্যা-স্বরূপ হইয়া যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহাদের জীবনে ধর্মভাব জাগাইয়া দিত। শিবানন্দের ঐরূপ প্রচারকার্যের খবর পাইয়া স্বামিজী জনৈক গুরুভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন—"তারকদা চমৎকার কাজ করিতেছেন। সাবাস্—এই তো চাই।"

মহাপুরুষজীর প্রচারের ধারা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একে তো আত্ম-গোপন করাটা তাঁহার যেন জন্মগত স্বভাব ছিল, তাহা ছাড়া কাজের হৈচৈ তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন না। আদর্শের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া নীরবে আদর্শ জীবন গড়িয়া তোলার দিকেই তিনি জোর দিতেন। তাঁহার প্রাণে 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'—এই ভাবটি এত গভীর ছিল যে, তিনি শ্রীভগবানের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন কাজই নিজের ঝোঁকে করিতেন না। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "An ounce of practicality

is more weightier than a ton of talks."—এই ভাবটি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল শিবানন্দের জীবনে; সেইজন্য 'জীবনযাপন' করাকেই শ্রেষ্ঠ প্রচার মনে করিয়া তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে আদর্শ জীবনযাপন করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার ভাব তাঁহারই কথায় প্রকাশ পাইয়াছে, "ঠাকুরের কাজ তিনিই করছেন। আমি-তুমি নিমিত্তমাত্র। তাঁহার চরণে লক্ষ্য স্থির রেখে চলতে থাক—যা করবার তিনিই করিয়ে নেবেন। 'কাজ করব' বললেই কি কাজ হয়—না তাতে জগতের কোন উপকার হয়? বহু তপস্যা যে করেছে তাকেই যন্ত্র করে ভগবান কাজ করিয়ে নেন—সে-ই ঠিক ভাবানুযায়ী কাজ করতে পারে। ভাবহীন কর্ম জঞ্জালমাত্র।" বোধ হয় সেই জন্যই স্বামিজী যদিও ১৮৯৪ সালে শিবানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "তারকদা, আপনি যদি মাদ্রাজে যান এবং তথায় কিছুকাল থাকেন তাহা হইলে যথেষ্ট কাজ হইবে।" তথাপি তিনি তখন প্রকাশ্যভাবে কর্মক্ষেত্রে নামেন নাই।

মহাপুরুষজী একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী আলমবাজার মঠে শশী মহারাজকে লিখলেন, 'দেখ শশী, এখন সব বুঝতে পারছি—এসব তাঁর কাজ; তিনি কেন এত ভালবাসতেন, এত করে বলতেন—সব বুঝতে পারছি।' পূর্বে স্বপ্নেও ভাবি নি কর্ম করতে হবে, ও দিকে ঝোঁকও ছিল না। স্বামিজীর ঐ চিঠি পেয়ে ভাবনা হল—তাইতো, কিছু করতে হবে। তখন পড়ার ঝোঁক হল। টাকা-কড়ি কিছু নেই, ঠিক এমনি সময় বম্বে থেকে একজন ভক্ত এল। সে কটা টাকা দিলে, তাই দিয়ে কলকাতা থেকে দু volumes **'Webster's Dictionary'** (দুইখণ্ড 'ওয়েবষ্টার অভিধান') কিনে নিয়ে এলাম। আলমারি হল, ডেস্ক হল, একটু কর্মের ভাব এল।"

এবার আলমবাজার মঠ ও কলিকাতায় আসিয়া শিবানন্দ দেখিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মভাব সকলের মনোরাজ্য প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সর্বত্র শ্রীপ্রভুর জয়জয়কার দেখিয়া আনন্দে তাঁহার মনঃপ্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনিও সেই সময় যেখানেই যাইতেন সকলকে শ্রীগুরুদেবের মহান জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া দেশময় যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল তাহার নিদর্শনস্বরূপ তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রাদি প্রচুর পরিমাণে স্বামিজীকে নিয়মিতভাবে পাঠাইতেন এবং জনসাধারণের ভিতর কী গভীর শ্রদ্ধা ও উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছে —সে সকল বিষয়ও চিঠি-পত্রাদি দ্বারা তাঁহাকে জানাইতে লাগিলেন।

গুরুভ্রাতাদিগের নিকট স্বামিজী ইতঃপূর্বে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি আগামী শীতে ভারতবর্ষে আসিতেছেন। ক্রমে সেই সংবাদ মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ-প্রমুখাৎ ভক্তগণের মধ্যে এবং দেখিতে দেখিতে তড়িদ্‌বেগে ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল। গুরুভাইদের মধ্যে যে যেখানে ছিলেন সকলেই ক্রমে আলমবাজার মঠে সমবেত হইতে লাগিলেন এবং সোৎসাহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন বিশ্ববিজয়ী ভ্রাতাকে প্রেমালিঙ্গনপাশে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য। স্বামিজীকে যথাযোগ্য স্বাগত করিবার উদ্দেশ্যে বহুস্থানে অভ্যর্থনা সমিতি প্রভৃতি গঠিত হইতে লাগিল। মঠের সন্ন্যাসি-গণও নানাভাবে দেশের জনসাধারণের সহযোগিতায় স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই দীর্ঘ প্রত্যাশিত দিন সমাগত হইল। স্বামিজীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য শিবানন্দ মাদ্রাজ প্রদেশের মাদুরা পর্যন্ত গমন করিলেন। মাদুরা হইতে স্বামীজীর সহিত কলিকাতা পর্যন্ত আগমন-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমি মঠের কতিপয় সন্ন্যাসীর সহিত মাদুরা ষ্টেশনে

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি মাদুরায় রামনাদের রাজার রাজকীয় শকট হইতে নামিয়া মহানন্দে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। ... পরে সকলে একত্রে রামনাদের রাজার বাড়ীতে বিশ্রাম করিতে থাকিলাম। বৈকালে মাদুরাসহরবাসী শিক্ষিত লোকসকল মাদুরা কলেজে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি আমি সেই প্রথম অনুভব করিলাম। পূর্বে যখন তাঁহার সহিত একত্রে বেড়াইয়াছি, বাস করিয়াছি, কখনও তাঁহার এরূপ ওজঃপূর্ণ বাগ্মিতা-শক্তির প্রকাশ দেখি নাই। বিশেষতঃ বৈদেশিক ভাষায় তাঁহার এত দখল ছিল যেন তিনি নিজের মাতৃভাষায়ই বক্তৃতা করিতেছেন।... মাদ্রাজেও প্রায় পাঁচ-ছয় দিন অবস্থান করা হয়। স্বামিজী সেখানে কয়দিনে পাঁচ-ছয়টি বক্তৃতা করেন। পরে ষ্টীমারযোগে কতিপয় শিক্ষিত মাদ্রাজী শিষ্যসহ কলিকাতায় যাত্রা করেন। সাহেব-মেম শিষ্যগণ এবং আমরা বরাবর তাঁহার সঙ্গেই আছি। জাহাজেও ইংরেজ পাদ্রীদের সহিত কয়দিন খুব ধর্মচর্চা হইয়াছিল। পাদ্রীরা স্বামিজীর নিকট অনেক শিক্ষালাভ করিল। জাহাজের ডেক্ যেন বক্তৃতামঞ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামিজী যখন কথোপকথন করিতেন, জাহাজের যাবতীয় যাত্রীই তাঁহার কথোপকথন শুনিবার জন্য ডেকে আসিয়া বসিতেন।...স্বামিজী কলিকাতায় পৌঁছিলেন। মহাসমারোহে তাঁহার অভিনন্দনাদি হইল। ক্রমে দুই-তিনটি বক্তৃতাও কলিকাতায় হইল। আমরা পুনরায় মহা-সুখে স্বামিজীর সহিত কিছুদিন মঠে রহিলাম। সে যে কি আনন্দের দিন তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না!"

কলিকাতাবাসীরা স্বামিজীকে দেব-অভিনন্দনে সম্মানিত করিয়াছিল। সভা-সমিতিতে বক্তৃতাদি ছাড়াও প্রতিদিন শত শত দর্শনপ্রার্থী ও

জিজ্ঞাসু তাঁর নিকট আসিত। স্বামিজীও সর্বক্ষণ অগণিত লোকের সহিত অক্লান্তভাবে ধর্ম, দর্শন ও দেশের নানা সমস্যাসম্বন্ধে আলাপ-আলোচনায় মাতিয়া থাকিতেন। ইহা ছাড়া মঠবাসী সাধু-ব্রহ্মচারিবৃন্দকে শিক্ষাদান, মঠের গুরুভাইদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-আচরিত উদার ধর্মমত কি করিয়া সমগ্র জগতে প্রচার করা যায়, দরিদ্র পদ-দলিত ভারত কিভাবে পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, 'শিবজ্ঞানে জীব-সেবা'-রূপ মহামন্ত্রে সমগ্র দেশবাসীকে কি করিয়া দীক্ষিত করিবেন ইত্যাদি নানা বিষয়ে চিন্তা, পরামর্শ ও আলোচনা স্বামিজীর নিত্য কর্ম ছিল। ফলে অতিরিক্ত পরিশ্রমে কলিকাতায় আসিবার অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার শরীর খুব অসুস্থ হইয়া পড়িল। স্বামিজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া গুরুভ্রাতাগণ মহা শঙ্কিত হইলেন। চিকিৎসকগণ স্বামিজীকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য সকল প্রকার মানসিক পরিশ্রম হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। সকলের সমবেত আগ্রহ ও অনুরোধে স্বামিজী কতিপয় গুরুভ্রাতা ও শিষ্যসহ কিছুদিনের জন্য দার্জিলিং শৈলাবাসে গমন করিলেন। এদিকে শিবানন্দের প্রাণও পুনরায় কিছুদিন নির্জন বাসের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামিজী ইতঃপূর্বে মহাপুরুষজীর কর্মশক্তির বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার আশা ছিল তারকদা আর নিভৃতে কাল না কাটাইয়া যদি প্রভুর ভাবপ্রচারে ব্রতী হন তো অনেক কাজ হইবে। সেইজন্য শিবানন্দের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সপ্রেমে বলিয়াছিলেন, "তারকদা, আপনাকে তপস্যায় কিছুতেই যেতে দেবো না।" কিন্তু পরে শিবানন্দের মনের অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে তপস্যায় যাইবার সম্মতি দিয়া হিমালয়ে ঠাকুরের একটি আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

অবশ্য ঠিক এই সময়েই মহাপুরুষজীর পক্ষে সে মঠস্থাপন করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু স্বামিজীর আদেশ স্মরণ করিয়া তিনি ১৯১৫ সালে আলমোড়াতে একটি মঠস্থাপনের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ ঐ অসমাপ্ত কাজ সমাধা করেন। স্বামিজী দার্জিলিংএ গমন করিবার পরেই শিবানন্দ আলমোড়ায় চলিয়া গেলেন। সম্পূর্ণ বিশ্রামলাভের জন্য স্বামিজী দার্জিলিংএ গিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সেই বিশ্রামসুখ মিলিল না। দার্জিলিংএ বসিয়া তিনি ভাবী মঠকে স্থায়িভাবে স্থাপন, সেবাকার্যের প্রচার, সর্বসাধারণ্যে শিক্ষা-বিস্তার ইত্যাদি নানা বিষয় লইয়া গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। সেজন্য তথায় স্বাস্থ্যোন্নতির কোন লক্ষণ না দেখিয়া বায়ু-পরিবর্তনের জন্য তাঁহার আলমোড়া যাওয়া স্থির হইল। তদনুসারে প্রায় দুই মাসকাল দার্জিলিংএ কাটাইবার পর তিনি কলিকাতায় নামিয়া আসিলেন এবং ৬ই মে কয়েক জন গুরুভাই ও শিষ্যসহ আলমোড়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আলমোড়া যাইবার পূর্বে তিনি ১লা মে তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণকে সমবেত করিয়া শ্রীগুরুদেব-প্রদর্শিত যুগধর্ম নানাভাবে সর্বসাধারণের ভিতর প্রচার-কল্পে 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামক সমিতি স্থাপন করেন।

১৮৯৭ সালে স্বামিজীর সহিত পুনরায় আলমোড়ায় কিছুকাল অবস্থান করার প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, "আমরা তখন স্বামিজীর সঙ্গে আলমোড়ায় আছি। একজন ভক্ত আমরা thought-reading (মনের কথা বলিয়া দেওয়া) জানি কি-না জিজ্ঞাসা করলে স্বামিজী আমায় ডেকে কি করে তা করতে হয় শিখিয়ে দিলেন; বললেন, 'কারও মনের কথা জানতে হলে

প্রথমে নিজের মনটা একেবারে খালি করে ফেলবে। তারপর যে চিন্তাটা তোমার মনে প্রথম উঠবে সেইটেই জানবে প্রশ্নকারীর মনের চিন্তা।' স্বামিজীর কথা শুনে আমি সেই ভক্তকে বললাম, 'আচ্ছা. তোমার মনে কি আছে তা বলব।' এই বলে ধ্যানের দ্বারা মনটাকে একেবারে খালি করে ফেললাম। তারপরই দেখি একটি চিন্তা উঠেছে। তখন ভক্তটিকে বললাম, 'তুমি এই মনে করেছিলে?' সে স্বীকার করলে।"

ঐ সময় মহাপুরুষজী স্বামিজীর নির্দেশে আলমোড়া হইতে কলম্বোতে গমন করিয়া তথায় বেদান্তপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি নিত্য গীতা-ক্লাস, ধর্মপ্রসঙ্গ ও রাজযোগসাধনার উপদেশাদি দ্বারা বহুলোকের আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্লাসে আলোচনাদিতে বহু য়ুরোপীয় নরনারীও যোগদান করিতেন এবং হিন্দু-ধর্মের গভীরতা ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই ভাবে সাত-আট মাস কাল সিংহলে অক্লান্তভাবে কাজ এবং বেদান্ত-প্রচারের একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া মহাপুরুষজী বেলুড়ে[১] ফিরিয়া আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানবর্গের প্রাণস্বরূপ ছিলেন স্বামিজী। বিশেষ করিয়া ঠাকুরের দেহত্যাগের পর হইতে সকলের প্রাণের জমাটবাঁধা ভালবাসা পড়িয়াছিল তাঁহার উপর। গুরুপ্রতিম স্বামিজীর প্রতি তাঁহাদের কী গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়

---

১ ১৮৯৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী স্থায়ী মঠের জন্য বেলুড়ে নূতন জমি কিনিবার বায়না হইবার পরেই মঠ গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড় গ্রামে বর্তমান মঠের সন্নিকটে নীলাম্বর বাবুর বাড়ী ভাড়া লইয়া আলমবাজার হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

মহাপুরুষজীর কয়েকটি কথার ভিতর, "বিশেষতঃ স্বামিজী হলেন আমাদের মাথার মণি। তাঁর জন্য আমরা নিজেদের প্রাণপাত করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করি নে। বুকের রক্ত দিয়েও তাঁর সেবা করতে পারলে তাতে নিজেদের ধন্য মনে করব। স্বামিজী যে কি জিনিষ তা তুমি কি বুঝবে?" এই অপার্থিব শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দাবীতেই স্বামীজি ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণকে পরিব্রাজকজীবন পরিত্যাগ করাইয়া সংঘবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ভালবাসার সর্বজয়ী শক্তিতেই তিনি একনিষ্ঠ-সাধক গুরুগতপ্রাণ রামকৃষ্ণানন্দকে ঠাকুরের সেবাপূজাদি হইতে যেন এক প্রকার ছিনাইয়া লইয়া বেদান্তপ্রচারকল্পে মাদ্রাজে পাঠাইতে পারিয়াছিলেন এবং এই ভালবাসার প্রভাবেই শিবানন্দকেও ইতঃপূর্বে তাঁহার নির্দেশে তপস্যা ছাড়িয়া কলম্বোতে বেদান্ত-প্রচারকল্পে যাইতে হইয়াছিল।

প্রায় ছয় মাস কাল সমগ্র উত্তর ভারত ও কাশ্মীরে বেদান্তের 'অভীঃ'-বাণী ঘোষণা করিয়া ১৮৯৮ সালের মাঝামাঝি স্বামিজী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার দীর্ঘকাল-বাঞ্ছিত স্থায়ী মঠের জমি ক্রয় করিলেন গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড় গ্রামে। স্বামিজীর মঠে প্রত্যাগমন এবং নূতন মঠের জমি ক্রয়ের সংবাদে কলম্বোতে বসিয়া শিবানন্দের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল এবং "পুনরায় তাঁহার (স্বামিজীর) পবিত্র সঙ্গলাভের বাসনা এত প্রবল হইল" যে, তিনি ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজীর সহিত বেলুড়ে বাস করিতে লাগিলেন।

স্বামিজীর নিয়ম-অনুসারে মঠের সন্ন্যাসিব্রহ্মচারিগণ প্রত্যহ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হইয়া শাস্ত্রীয় নানা বিষয়ে আলোচনাদি করিতেন।

স্বামী শিবানন্দও এই সকল আলোচনায় সোৎসাহে যোগদান করিতেন এবং অনেকদিন উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দিবার ভার লইতেন। মঠের পুরাতন ডায়েরী হইতে কয়েকদিনের প্রশ্নোত্তরের চুম্বক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। প্রশ্নগুলি নানা লোকের—মীমাংসাগুলি মহাপুরুষজীর।

১৪ই মার্চ, ১৮৯৮ সাল

প্রশ্ন (স্বামী বিরজানন্দ)—সত্যের কখনও কখনও পরাভব দেখা যায় কেন? ধরুন, ধর্মকে রক্ষা করিতে গিয়া অনেককে অত্যাচারী বিপক্ষের সহিত সংঘর্ষে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে।

উত্তর—সত্য কখনও নির্যাতিত হয় না, কেন না উহা বিদেহী। দেহকেই আমরা শুধু কষ্ট পাইতে দেখি, দেহ সত্যকার মানুষ নয় বলিয়াই উহার কষ্ট। ঐ অত্যাচার বরং সত্যকে আরও অধিকতর-ভাবে প্রকাশ করে।

প্রশ্ন (নন্দলাল ব্রহ্মচারী)—যদি মানুষ নিজের কর্মজনিত অদৃষ্টেরই অধীন হয় তাহা হইলে সৃষ্টিবিধানে সর্বশক্তিমান এবং করুণাময় শ্রীভগবানের সার্থকতা কোথায়?

উত্তর—সর্বশক্তিমান করুণাময় শ্রীভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং কর্মবাদকে যদি একই মতবাদের অঙ্গ বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে উহারা পরস্পর সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ যাঁহারা কর্মবাদে বিশ্বাসী তাঁহারা উপরি-উক্ত-গুণসম্পন্ন শ্রীভগবানে বিশ্বাসী নহেন। আবার যাঁহাদের শ্রীভগবান সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা তাঁহারা কর্মবাদকে অতটা আমল দেন না; তাঁহারা বলেন, সুখ-দুঃখ কর্মের অপেক্ষা না রাখিয়া সম্পূর্ণ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আমাদের কল্যাণের জন্যই হইয়া থাকে।

১৭ই মার্চ, ১৮৯৮ সাল

প্রশ্ন (স্বামী প্রকাশানন্দ)—অকুণ্ঠ আজ্ঞানুবর্তিতার সহিত মৌলিকতা ও স্বতন্ত্রতার কিরূপে সংগতিরক্ষা হইতে পারে?

উত্তর—শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্রতা সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তিতার মধ্যেই নিহিত। বাসনা-মুক্তিই যথার্থ স্বতন্ত্রতা। গুরুজনদের আদেশ দ্বিধাহীনচিত্তে প্রতিপালনের দ্বারাই উহা সংসাধিত হয়।

৩০শে মার্চ, ১৮৯৮ সাল

প্রশ্ন (স্বামী শুদ্ধানন্দ)—জগৎসংসারে প্রত্যেকেই যখন সম্পূর্ণরূপে পরমার্থনিষ্ঠ হইবে তখন জগতের সামাজিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে?

উত্তর—এই প্রশ্নটি সহজ দৃষ্টিতেই অযৌক্তিক। কেন না, জগৎ-সংসার হইতে মন্দটা একেবারে লোপ পাইতে পারে না। উহা ভালর সাথী হইয়া থাকিবেই।

৯ই এপ্রিল—সান্ধ্য আলোচনা। 'জগতে সন্ন্যাসীর স্থান' সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্দের আলোচনার সারাংশ:

প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল বিবিধ শক্তিনিচয়ের মধ্যে দুইটি শক্তি অতীব প্রত্যক্ষগোচর এবং প্রবল। একটি গঠন করিতেছে আর অপরটি আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সব কিছুকে ভাঙ্গিতেছে। এই ভাঙ্গা-গড়াকে অন্যভাবে বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, একটি আকর্ষণী শক্তি এবং অপরটি বিকর্ষণী। যে আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে জীবগণ সংসারে বলপূর্বক আকৃষ্ট হয়, সন্ন্যাসীরা উহার কবল হইতে প্রায়ই মুক্ত থাকেন বলিয়া তাঁহাদের জীবন শেষোক্ত বিকর্ষণী শক্তিরই সহায়ক। সংকোচনই মৃত্যু এবং সম্প্রসারণই জীবন; আর এই সম্প্রসারণ বিকর্ষণী শক্তিরই পরিণতি। অতএব প্রকৃতির মনোরাজ্যে 'মন' নামক মহাশক্তির

পরিবিস্তারে প্রভূত সহায়ক বলিয়া সন্ন্যাসীর জীবন প্রকৃতিতে একটি অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। আর পূর্ণতম সম্প্রসারণের অর্থ চেতন অচেতন সকল পদার্থের চরম লক্ষ্য—অনন্ত অস্তিত্ব, জ্ঞান এবং আনন্দস্বরূপ সেই ভূমিতে পৌঁছানো। উপরন্তু অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি সন্ন্যাসিগণই হইয়া আসিয়াছেন আধ্যাত্মিক, সামাজিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার জগৎ-আলোড়নকারী নেতা।

এই আলোচনার পর :

প্রশ্ন (স্বামী প্রকাশানন্দ)—বাহ্যিক কি লক্ষণ দ্বারা আমরা সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারি ?

উত্তর—তাঁহার কর্মদ্বারা। তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র, প্রেমিক ও নির্ভীক হইয়া থাকেন।

প্রশ্ন (মিসেস বুল্)—যিনি জগৎসংসারকে ভয় করেন তিনি কি সন্ন্যাসি-পদবাচ্য ?

উত্তর—না। সন্ন্যাসীর সদ্‌গুণাবলীর মধ্যে নির্ভীকতাও একটি গুণ। যিনি কোন বিষয়ে ভয় পান তিনি কখনও পূর্ণভাবে সন্ন্যাসী হন নাই, তবে সন্ন্যাসীর পথ ধরিয়াছেন মাত্র।

প্রশ্ন (স্বামী সারদানন্দ)—কোন গৃহস্থ লোক কি সন্ন্যাসী হইতে পারেন ?

উত্তর—হাঁ। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপনিষদ্‌যুগের জনক ঋষি এবং অপরাপর ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন (মিসেস্ বুল্)—কোন স্ত্রীলোক কি সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিতে পারেন ?

উত্তর—হাঁ। প্রত্যেকেরই সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার অধিকার আছে; আত্মাতে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নাই।

১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৮ সাল, সান্ধ্য আলোচনা

প্রশ্ন (স্বামী তুরীয়ানন্দ)—কখনও কখনও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিবার পূর্বে তত্ত্বাভিলাষীকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন হওয়ারূপ সর্বসম্মত এবং অত্যাবশ্যকীয় ক্রম অতিক্রম করিতে দেখা যায় কেন? রজোগুণ ও তমোগুণ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পক্ষে অনাবশ্যক ও অন্তরায়-বোধে সত্ত্বগুণের বহু পশ্চাতে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু কোনও কোনও স্থলে দেখা যায় যে জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণও ক্রোধান্বিত এবং রজোগুণপ্রসূত অপরাপর প্রভাবের অধীন হইয়া পড়েন, যেমন কোপনস্বভাব মুনি দুর্বাসা এবং অপরাপর মহাত্মাগণ।

উত্তর—প্রত্যেক ব্যক্তিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের অধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু সর্বথা একটি গুণ অপর দুইটির উপর প্রভাব বিস্তার করে; কাহারও কাহারও ভিতর রজোগুণ ও তমোগুণের অনাধিক্য এবং সত্ত্বগুণের প্রাবল্য; কাহারও কাহারও ভিতর রজোগুণ বেশী এবং অপর দুই গুণ কম, ইত্যাদি। কোন তত্ত্বাভিলাষী যখন ত্রিগুণাতীত মুক্তির অবস্থা লাভ করেন, তখন তিনি হন গুণত্রয়ের প্রভু। সেই জীবন্মুক্ত অবস্থায় জগৎসংসারে বাস করিবার কালে তিনি আচার্যের জীবনযাপন করেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক সংস্কার, মনোবৃত্তি অথবা জন্মগতগুণানুযায়ী তিনি উপরি-উক্ত তিনটি গুণের যে-কোন একটিকে নিজকর্মোপযোগী নির্বাচন করিয়া লন। কিন্তু সাধারণতঃ আচার্য ও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণকে আমরা সত্ত্বগুণ ও রজোগুণপ্রধান দেখিতে পাই। কোন কোন মহাপুরুষ অতীব নিভৃত

স্থানে শান্তভাবে অবস্থান করিয়া তত্ত্বজ্ঞানকামী জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকে উপদেশ দান করেন। কোন কোন মহাপুরুষ জনসাধারণের ভিতর ধর্মপ্রচারার্থ পরিব্রাজকবেশে পৃথিবীর সর্বত্র পর্যটন করেন। কখনও কখনও অসৎপ্রকৃতির জনসাধারণকে (তাহাদের অসৎকর্মের বিষয় ভাবিয়া) তাঁহারা যেন ক্রোধান্বিত হইয়া অভিসম্পাত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের ঐ প্রকার অভিসম্পাত কৃত্রিম মাত্র। পিতা যেমন পুত্রকে স্নেহ করেন, আচার্যেরাও শিষ্যবর্গকে তদ্রূপ স্নেহ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা তাহাদিগের কল্যাণকামনায় শাসন করিলেও কালে উহা সুফলপ্রসূই হইয়া থাকে।

১৫ই এপ্রিল, ১৮৯৮ সাল

প্রশ্ন (স্বামী স্বরূপানন্দ)—এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবাস্তব এবং ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য-সত্য ইহা কিরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে?

উত্তর—আমাদের অন্তরে ও বাহিরে যাবতীয় পদার্থের পরিবর্তনশীলতা অনবরত লক্ষ্য করিলে নিখিল জগতের অবাস্তবতা সিদ্ধ হয়। আর ঐ প্রত্যেকটি পরিবর্তন ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা বহির্দেশ হইতে সূচিত হইয়া আমাদের (অন্তর্দেশে) মনের মধ্যেই সংঘটিত হইতেছে। যে পরিমাণে বহির্জগৎ পরিবর্তনশীল (অন্তর্জগৎ) মনও সেই অনুপাতে পরিবর্তনশীল। কোন পদার্থের সত্তা বলিতে এই বুঝায় যে উহা অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহজগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহার অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও কোন প্রকার পরিবর্তন হয় নাই। সত্যোদ্‌ঘাটনের জন্য আমরা যদি নিখিল জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে বস্তুতঃ উহার মধ্যে আমরা পরমতত্ত্বই অনুস্যূত দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ স্থূলপদার্থ, অতঃপর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থ; অবশেষে

মন চূড়ান্ত মীমাংসায় অক্ষম হইয়া তাহার নিজাভ্যন্তরে প্রত্যাবর্তন করিয়া বহির্জগৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও অন্তর্মুখ হয়। আর পরমতত্ত্বে উপনীত হইবার একমাত্র উপায় হইতেছে অন্তর্মুখিতা।

ঐ সময়ে মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগকে স্বামিজী স্বয়ং বেদান্ত, গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা এবং মঠবাসীদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন; তাহা ছাড়া নূতন মঠবাড়ীনির্মাণ প্রভৃতি কোন কাজেই তাঁহার উৎসাহের অভাব ছিল না। ক্রমে শ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব আগতপ্রায় দেখিয়া ঐ বৎসর মহোৎসবের বন্দোবস্তের ভারও তিনি নিজেই গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে সকল কাজে এতটা উৎসাহের সহিত যোগদান করিতে দেখিয়া মঠবাসিগণও নববলে বলীয়ান হইয়া কাজে মাতিয়া উঠিলেন। কিন্তু এই ভাবে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই স্বামিজীর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অবশেষে বাধ্য হইয়া মার্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি দার্জিলিংএ গমন করিলেন কিন্তু যে ঐশী শক্তির প্রেরণায় স্বামিজীকে নরদেহধারণ করিতে হইয়াছিল সেই জগজ্জননীই যেন তাঁহাকে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে দিলেন না। দার্জিলিংএ অবস্থানের ফলে স্বামিজীর শরীর ধীরে ধীরে সুস্থ হইতেছিল; এমন সময় কলিকাতা মহানগরীতে ভীষণ প্লেগের আক্রমণ-সংবাদে তাঁহার প্রাণ বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে শৈলাবাস পরিত্যাগ করিয়া ৩রা মে কলিকাতায় আসিয়া ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতির উপর প্লেগবিপন্নদের সেবার ভার অর্পণ করিলেন। ততদিনে প্লেগমহামারীর আক্রমণে বহুলোক প্রত্যহ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। শিবানন্দ নিজ জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন ঐ সেবাকার্যে। সেবকগণের আন্তরিক ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে কয়েকদিনের

মধ্যেই রোগের প্রকোপ উপশমিত হইয়া গেল। স্বামিজীও কলিকাতাকে রোগমুক্ত দেখিয়া কয়েকদিন পরেই আলমোড়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী যেখানেই যখন থাকতেন যেন আনন্দের হাট বসিয়ে দিতেন। কত হাসি-তামাসা, রঙ্গরসিকতা—কত আনন্দ যে করতেন তা আর কি বলব! আর কত উচ্চভাবের কথাবার্ত্তা! তাঁর সবই ছিল অদ্ভুত! যে একদিনও তাঁর সঙ্গ করেছে, সে কখনও তাঁকে ভুলতে পারবে না—এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সর্বতোমুখী প্রতিভা!" মঠের 'আনন্দের হাট' ভাঙ্গিয়া স্বামিজীর আলমোড়াযাত্রার কয়েকদিন পরেই (২২শে মে, ১৮৯৮) শিবানন্দও কিছুদিন একান্ত বাসের ইচ্ছায় দার্জিলিংএ গমন করিলেন।

এই বৎসর অত্যধিক বর্ষার ফলে দার্জিলিং পাহাড়ে একটি প্রকাণ্ড ধস্ নামিয়া বহুলোকের সর্বনাশ হইয়াছিল। ঐ নিদারুণ বিপদ্-সংবাদে শিবানন্দের মন করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি একান্ত বাস পরিত্যাগ করিয়া আর্তনারায়ণের সেবায় ব্রতী হইলেন এবং দার্জিলিং শহর ও কলিকাতার বহুস্থান হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া দুঃস্থদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ শুভ প্রচেষ্টার ফলে বহু সর্বস্বান্ত পরিবার প্রাণে বাঁচিয়া গেল।

এদিকে বেলুড়ে নূতন মঠের নির্ম্মাণকার্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের তত্ত্বাবধানে ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মকুশলতায় দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল, নূতন জমি ভরাট হইয়া মঠবাড়ী প্রভৃতি নির্মিত হইতে লাগিল। শিবানন্দ ঐ সেবাকার্য শেষ করিয়া দার্জিলিং হইতে ১১ই নভেম্বর বেলুড়ে ফিরিয়া আসিলেন। ১২ই নভেম্বর ৺কালীপূজার দিন শ্রীশ্রীমা নূতন মঠপ্রাঙ্গণে প্রথম শুভপদার্পণ করেন। এই উপলক্ষে মঠের নূতন জমিতে

ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদির আয়োজন হইয়াছিল। মাতাঠাকুরাণী তাঁহার নিত্যপূজিত ঠাকুরের ফটো সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের বিশেষ পূজাদি করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাই যেন ঐ দিন ঠাকুরকে 'বহুজনশুভায়, বহুজনসুখায়' প্রথম ঐ মঠে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

৯ই ডিসেম্বর স্বামিজী নিজে ঠাকুরের দেহভস্মাস্থিপূর্ণ কৌটা—যাহাকে তিনি 'আত্মারামের কৌটা' বলিতেন—মাথায় করিয়া আনিয়া আনুষ্ঠানিক-ভাবে নূতন মঠে স্থাপন করেন। ঐ মঠপ্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন, "এই মঠ হল আধ্যাত্মিক শক্তির power-house (উৎপত্তি-কেন্দ্র), এখান থেকেই আধ্যাত্মিক শক্তির স্রোত বয়ে গিয়ে সমগ্র জগতকে প্লাবিত করবে। তাইতো স্বামিজী নিজে মাথায় করে ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছিলেন। স্বামিজীকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুই মাথায় করে নিয়ে গিয়ে আমায় যেখানে রাখবি আমি সেখানেই থাকব।' এ মঠ যে দিন প্রতিষ্ঠিত হয় সেদিন স্বামিজী 'আত্মারামকে' নিজে মাথায় করে নিয়ে এলেন এবং এ মঠে স্থাপন করলেন। পূজা হোম ও ভোগরাগ খুব হয়েছিল। আমি ঠাকুরের ভোগের পায়েস রান্না করেছিলাম। ঠাকুরকে এ মঠে বসিয়ে স্বামিজী বলেছিলেন, 'আজ আমার মাথা থেকে জীবনের সব চাইতে বড় দায়িত্ব নেমে গেল, এখন আমার শরীর গেলেও কোন ক্ষতি নেই।' তারপর থেকেই এখানে সব সাধনভজন 'আত্মারাম'কে কেন্দ্র করে।"

২০শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমা পুনরায় নূতন মঠবাড়ীতে শুভাগমন করিয়া মঠভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। মঠের নির্মাণকার্যাদি দেখিয়া তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন। বাড়ীর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৯৯ সালের ২রা জানুয়ারী ভাড়াটিয়া মঠবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া সকলেই নূতন মঠে বসবাস করিতে লাগিলেন। এখন হইতে মঠকে সর্বাঙ্গসুন্দর-

ভাবে গড়িয়া তোলাই ছিল মঠবাসিগণের একমাত্র প্রচেষ্টা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে মঠের পূর্ণতাসম্পাদনের জন্য যত্নের ক্রটি করেন নাই। শিবানন্দও সে বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তিনিও মঠের প্রত্যেকটি কাজ অতি যত্নসহকারে করিতে লাগিলেন।

মঠের এই নব উদ্যম ও উৎসাহের দিনে শ্রীশ্রীমায়ের বীরসেবক স্বামী যোগানন্দ খুব পীড়িত হইয়া পড়েন। চিকিৎসা ও সেবাদির কোন ক্রটি নাই, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৯৯ সালের ২৮শে মার্চ যোগানন্দ শ্রীগুরুপদে মিলিত হইলেন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম দেহত্যাগ করেন। স্বামিজী অতি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, "এইবার ইমারতের প্রথম ইট খস্‌ল।" মহাপুরুষজী যোগানন্দ স্বামীর অন্তিম শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন এবং খুবই ব্যথিতহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যোগীন্, ঠাকুরকে মনে আছে তো?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আরও খুব বেশী মনে আছে, আরও বেশী, আরও বেশী।" দেহত্যাগের পূর্বে তাঁহার নানা অলৌকিক দর্শনাদি হইয়াছে।

এদিকে স্বামিজীর স্বাস্থ্যও ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতেছিল; সেজন্য ডাক্তারগণের পরামর্শে এবং গুরুভ্রাতা ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্যবর্গের বিশেষ অনুরোধে স্বামিজী দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রা করিলেন ১৮৯৯ সালের ২০শে জুন—সঙ্গে তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। স্বামিজী প্রভৃতিকে বিদায় দিবার জন্য অন্যান্য মঠবাসীদিগের সহিত শিবানন্দও প্রিন্সেপ ঘাটে গিয়াছিলেন। তাহার কয়েক দিন পরে ২৯শে জুন তিনি কিছুদিনের জন্য দার্জিলিংএ যান এবং কয়েক মাস তথায় অতিবাহিত করিয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

স্বামিজীর পার্শ্বে

স্বামিজী তাঁহার দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্যভ্রমণ শেষ করিয়া ১৯০০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রাত্রে বেলুড় মঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য ক্যাপটেন্ সেভিয়ারের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মিসেস্ সেভিয়ারকে ঐ দুর্বহ শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি অবিলম্বে মায়াবতী যাইবার সংকল্প করিলেন; শিবানন্দ এবং সদানন্দের (গুপ্ত মহারাজ) সহিত কলিকাতা হইতে ২৭শে ডিসেম্বর রওনা হইয়া কাঠগুদামে ২৯শে পৌঁছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য মায়াবতী হইতে স্বামী বিরজানন্দ ডাণ্ডী, ঘোড়া ও কুলী প্রভৃতিসহ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। দারুণ শীত, বৃষ্টি ও ভীষণ তুষারপাত প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ৬৫ মাইল পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ৩রা জানুয়ারী সকলে মায়াবতী পৌঁছিলেন।

পনরদিন মায়াবতীতে কাটাইয়া স্বামিজী শিবানন্দ ও অন্যান্য সঙ্গিগণসহ নীচে নামিয়া আসিলেন। পিলিভিটে আসিয়া তিনি মহাপুরুষজীকে ঐ অঞ্চলে ঠাকুরের ভাবপ্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে মঠের জন্য অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি সংযুক্তপ্রদেশের নানাস্থানে ঘুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বজনীন ধর্মমত ও উদার বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

সেই বৎসর স্বামিজী বেলুড় মঠে মহাসমারোহে প্রতিমায় শ্রীশ্রী৺দুর্গামাতার আরাধনা করিয়াছিলেন। জগজ্জননীর জীবন্ত প্রতীক শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে স্বামিজী পূজার কয়দিন মঠের সন্নিকটে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। দুর্গোৎসবের কয়দিন 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত—মহামায়ার আবির্ভাবে সর্বত্র আনন্দের তুফান বহিয়া যাইতেছিল—সহস্র সহস্র নরনারী সেই

আনন্দের মলয়স্পর্শে প্রাণে নূতন আধ্যাত্মিক প্রেরণা পাইয়াছিল।[১] মহাপুরুষজী তখন মীরাটে। মঠে পূজা হইতেছে অথচ সেই পূজার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলেন ভাবিয়া তিনি খুবই ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মীরাটেও সার্বজনীন পূজা হইতেছিল; তিনি সেই পূজাতে যোগদান করিয়া পূজার কয়েকদিন ৺চণ্ডীপাঠাদি করেন। অন্তর্যামিনী জগন্মাতা সন্তানের প্রাণের বেদনা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তথায় দর্শনদানে ধন্য করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া মহাপুরুষজী একসময় বলিয়াছিলেন, "মঠে পূজা দেখতে পেলাম না বলে মনে খুবই কষ্ট হয়েছিল। তা মা আমাকে কৃপা করে সেইখানেই দর্শন দিয়েছিলেন। কিসে, কি ভাবে, কখন কি উপায়ে যে তাঁর কৃপা হবে তা বাবা, কেউ বলতে পারে না।"

ইতঃপূর্বে স্বামিজীর ইচ্ছায় কল্যাণানন্দ কন্‌খলে একটি ছোট সেবাশ্রম স্থাপন করিয়া আর্ত–নারায়ণদিগের সেবায় নিযুক্ত হন। স্বামিজী একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ কল্যাণ, একদিকে ঠাকুরমন্দির হবে, আর একদিকে সেবাকার্য চলবে। মন্দিরে ধ্যানধারণা করে কার্যতঃ জীবনে তা প্রতিফলিত করতে হবে সেবাশ্রমে—এই আমি চাই।" প্রচার-কার্যাদির জন্য মহাপুরুষ মহারাজ ঐ অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন সংবাদ পাইয়া কল্যাণানন্দ তাঁহাকে কন্‌খলে যাইবার জন্য বিশেষ

১ নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের অনেকের ধারণা ছিল পাশ্চাত্ত্যদেশ-প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের সনাতন আচার, নিয়ম ও পূজাদি মানেন না। স্বামিজী-কর্তৃক রঘুনন্দনস্মৃতির বিধান-অনুযায়ী সনাতন মতানুসারে মঠে এই দুর্গাপূজা-প্রবর্তনে তাঁহাদের ঐ ধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছিল।

অনুরোধ করেন। তিনিও তদনুসারে ১৯০১ সালের শেষভাগে কন্‌খলে গিয়া কল্যাণানন্দকে নানাভাবে সেবাকার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

কন্‌খাল অবস্থানকালে ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি খবর পাইলেন যে, স্বামিজী বায়ু-পরিবর্তনের জন্য শীঘ্রই কাশীতে আসিতেছেন। ঐ সংবাদে মহাপুরুষজী স্বামিজীর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য অবিলম্বে কন্‌খল হইতে স্বামিজীর আগমনের পূর্বেই কাশীতে চলিয়া আসিলেন। স্বামিজীও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাকে পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। কাশীতে থাকার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই স্বামিজীর শরীর কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। মাসাবধিকাল পরে শিবানন্দ প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া স্বামিজী বেলুড়ে ফিরিলেন এবং মঠে আসিয়া পুনরায় পূর্ণোদ্যমে মঠের গঠনমূলক কাজে মাতিয়া গেলেন। তিনি যখনই যে কাজে মন দিতেন তাহাতেই নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া দিতেন; সেজন্য ঐ অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁহার ভগ্ন শরীর সহ্য করিতে পারিল না। অল্পদিনের মধ্যেই স্বামিজী পুনরায় এতটা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। বিশেষজ্ঞদিগের পরামর্শে তাঁহার জন্য কবিরাজী চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল। সেই সময় মহাপুরুষজী অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার কবিরাজী ঔষধ তিনি নিজের হাতে মাড়িয়া স্বামিজীকে খাওয়াইতেন এবং তাঁহার যাবতীয় সেবাকার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন।

ভিঙ্গার মহারাজা বৃদ্ধবয়সে কাশীতে দুর্গাবাড়ীর নিকটে একটি বাগানবাড়ী তৈয়ার করিয়া বানপ্রস্থাবলম্বনে বাস করিতেছিলেন। তিনি নিজের বাড়ীর সীমানার বাহিরে যাইতেন না। স্বামিজী কাশীতে অসিয়াছেন শুনিয়া মহারাজা সাদরে তাঁহাকে নিজভবনে

নিমন্ত্রণ করেন। স্বামিজী ঐ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য যান। তাঁহার সঙ্গে মহাপুরুষজী এবং আরও কয়েকজন গুরুভ্রাতা ছিলেন। ভক্তিপূর্ণ সাদর আপ্যায়নের পরে মহারাজা কাশীতে বেদান্তপ্রচারের জন্য স্বামিজীর হস্তে ৫০০৲ টাকা দিতে চাহিলেন। স্বামিজী তখন উহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কয়েকদিন পরেই মহারাজা ঐ টাকা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তখন স্বামিজী উহা গ্রহণ করেন। ফলতঃ ঐ ভাবে স্বামিজী কাশীতে বেদান্তপ্রচারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। মঠে আসিয়া সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি 'তারকদা'কে কাশীতে বেদান্তপ্রচারের জন্য যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহাপুরুষজী খুব প্রেমভরে স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন, "এখন তোমার সেবা ছেড়ে কোথাও যাব না—তুমি সেরে উঠ, তারপর যাওয়া যাবে।"

কিছুদিনের মধ্যেই কবিরাজী চিকিৎসার ফলে এবং গুরুভাইদের প্রাণপাত সেবায় স্বামিজীর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখা গেল। সকলের প্রাণে আনন্দের সীমা রহিল না। স্বামিজীর ইচ্ছানুসারে মহাপুরুষজী কাশীতে বেদান্তপ্রচারের জন্য গমন করিলেন।

ঐ প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেম, "মঠে ফিরে স্বামিজী প্রথম শরৎ মহারাজকে কাশীতে যাবার কথা বলেন। শরৎ মহারাজ তাতে রাজী হলেন না—বল্লেন, 'কাশীতে আমার সুবিধে হবে না।' কাজেই তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ কাশী যাবার কথা বলতে লাগলেন। তখন তাঁর শরীর খুবই খারাপ, ডায়বেটিস্ অত্যন্ত বেড়েছিল। আমি তাঁহাকে ঔষধাদি খাওয়াতাম এবং তাঁর সেবার তত্ত্বাবধান করতাম। তাই তখন তাঁর সেবা ছেড়ে গেলাম না। পরে তাঁর শরীর যখন অনেকটা সেরে এল তখন আমায় কাশীতে পাঠিয়েছিলেন।"

কাশী অদ্বৈতাশ্রম

১৯০২ সালের ২৫শে কিম্বা ২৬শে জুন মহাপুরুষজী অদ্বৈত আশ্রম-স্থাপনের জন্য বেলুড় মঠ হইতে কাশী রওনা হন। কর্মিরূপে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন স্বামী অচলানন্দ। প্রথমে তিনি কাশীর রামাপুরা অঞ্চলে পুরাতন সেবাশ্রমের বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। কয়েকদিন চেষ্টার ফলে মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় লাক্ষার মহল্লায় 'খাজাঞ্চী বাগিচা' নামক একটি পুরাতন বাগানবাড়ী পাইল উহাই আশ্রমস্থাপনের স্থানরূপে নির্বাচিত হয় এবং ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই মহাপুরুষজী নূতন ভাড়াটে বাড়ীতে আশ্রম স্থাপন করেন।[১]

---

১ স্বামী অচলানন্দ অদ্বৈতাশ্রম-স্থাপনের ইতিহাসসম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যান্য খবরের মধ্যে ইহাও জানা যায়—"অদ্বৈতাশ্রম হইবার পূর্বেও ১৯০১ সালে মহাপুরুষজী কাশী সেবাশ্রমের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কয়েকদিন ছিলেন, তখন সেবাশ্রমের খুব অস্বচ্ছল অবস্থা—কবিরাজী চিকিৎসা চলিত। মহাপুরুষজী নিজে রোগীদের পাঁচন সিদ্ধ করিয়া দিতেন এবং সেবকগণ রোগীদিগের মধ্যে তাহা বিতরণ করিত। চারুবাবু প্রভৃতি মহাপুরুষজীর আগমনে এখন খুবই আনন্দিত হইয়াছিল—কারণ পূর্বেও যখন তিনি সেবাশ্রমে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার সাহচর্যে সকলেই খুব আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। তিনিও সেবকগণকে নানাভাবে উপদেশাদি ও সেবাকার্যে সাহায্য ও উৎসাহ দিতেন। মহাপুরুষজী বেশীরভাগ সময় উপরে ভজন-সাধন করিতেন। কখনও রাত্রে একতলায় রোগী মারা গিয়াছে—তিনি বলিতেন, 'এখন শব-সাধনা করা যাক।'"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'কার শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয় এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"শিবানন্দের সাধনায় কাশী সেবাশ্রম কেমন জেঁকে উঠেছে দেখ্‌ছ ত?

৫ই জুলাই রাত্রে আহারের কিছু পূর্বে মহাপুরুষজী স্বামিজীর দেহরক্ষার মর্মন্তুদসংবাদবাহী টেলিগ্রাম পাইয়া শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন—কিছুতেই যেন এই নির্মম সত্য বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মাত্র দুই দিন পূর্বে তিনি স্বামিজীর স্বহস্তলিখিত চিঠি পাইয়াছিলেন এবং ঐ চিঠিতে অন্যান্য খবরের মধ্যে স্বামিজী তাঁহাকে কাশী হইতে কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সন্ধান করিয়া পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। সে রাত্রে মহাপুরুষজী কিছুই আহার করিলেন না এবং নানাভাবে স্বামিজীর জন্য শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরদিন সংবাদপত্রে স্বামিজীর মহাপ্রস্থানের খবর প্রকাশিত হওয়ায় সন্দেহের আর কোন আবকাশই রহিল না। প্রাণাধিক স্বামিজীর দেহত্যাগ হইয়াছে, বেলুড় মঠে গিয়াও তো আর তাঁহার দর্শন পাইবেন না—ইহা ভাবিয়া শিবানন্দ মঠে গেলেন না, স্বামিজীর শেষ ইচ্ছামত কাশীতেই তাঁহার নির্দিষ্ট কার্যে আত্মনিয়োগ করিবেন স্থির করিলেন।

পরবর্তী রথযাত্রার দিন বিশেষপূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠানপূর্বক আশ্রমে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা করিয়া ঠাকুরের পার্শ্বে মহাপুরুষজী স্বামিজীকে স্থাপন করিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, তিনি স্বামিজীকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন। আশ্রমটির নাম রাখা হইল 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম'। 'দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে' ইহাই ছিল ঠাকুরের ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—এই আদর্শ অনুসারে আশ্রমের স্থাপনা ও নামকরণ হইয়াছিল।

মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন যে, বক্তৃতাদির দ্বারা বেদান্তপ্রচার না করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মলাভের অনুকূল ভজন-সাধনপূর্ণ জীবনযাপন

দ্বারা প্রকৃত বেদান্তভাব প্রচার করিবেন এবং তিনি করিয়াছিলেনও তাহাই। কাশীতে অবস্থানকালে তাঁহার বেদান্তময় জীবন প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই এককালে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি কাশীতে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর যে কঠোরতপস্যাময় জীবনযাপন করিয়াছেন তাহা রামকৃষ্ণসংঘের ইতিহাসে স্বর্ণতুলিকায় চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে।

স্বামিজীর আকস্মিক দেহত্যাগের দারুণ আঘাত ভুলিবার জন্য মহাপুরুষজী একান্ত আত্মসমাধানে ডুবিয়া গেলেন। পূর্বে ঠাকুরের অদর্শন তাঁহার প্রাণে যেমন তীব্র বৈরাগ্যানল জ্বালিয়া দিয়াছিল, এখন স্বামিজীর তিরোভাবে কাশীতেও যেন বরাহনগরমঠ-জীবনের পুনরভিনয় সংসাধিত হইল। অদ্বৈতাশ্রমবাসী জনৈক সাধুর দিন-পঞ্জিকায় আমরা মহাপুরুষজীর তৎকালীন দৈনন্দিন জীবনের একটি নিছক ছবি দেখিতে পাই—"একটি ব্যাঘ্রাজিন ও কম্বল ছিল তাঁহার বিছানা। কাশীর ঐ দুর্জয় শীতের সময়ও খোলা হলঘটিতে একটি ধুনি জ্বালিয়ে খড়ের উপর বাঘের ছালটি পেতে কম্বলখানি গায়ে দিয়ে তিনি শুতেন। কোন কোন দিন এমন কি রাত দু'টার সময়ই উঠে হাতমুখ ধুয়ে তিনি ঐ ধুনির পাশে ধ্যানে বসতেন। ভোরবেলা ধ্যান থেকে উঠে ঠাকুর তুলতেন। ঠাকুরঘর থেকে ফিরে এসে গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ্ ও স্তবাদি অনেকক্ষণ পাঠ করতেন। পরে আশ্রমের কাজকর্ম দেখাশুনা করে স্নানাদি সেরে নিজেই ঠাকুরপূজা করতেন। ঠাকুরের জলখাবার সামান্য বাতাসা ও চারটি পেড়া। যা রান্না হ'ত তাই ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে সকলে প্রসাদ পেতেন। সবদিন পেটভরা খাবার জুটত না—বিশেষ করে রাত্রে। মহাপুরুষজীর খাওয়া-দাওয়ার কোন আলাদা ব্যবস্থা ছিল না—সকলে যা খেত তিনিও তাই খেতেন।

তিনি আশ্রমের বাইরে বেরুতেন না, সামনের রোয়াকেই সামান্য পায়চারী করতেন আর আপন মনে গুন গুন করে গান গাইতেন। সর্বদাই আপনভাবে বিভোর হ'য়ে থাকতেন—কাথাবার্তাও বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে বলতেন না। আশ্রমে কোনপ্রকার শব্দ হ'ত না—পরস্পরের মধ্যে কথা বলতে হ'লে চেঁচিয়ে না বলে, যার সঙ্গে কথা বলার দরকার তার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলার রীতি ছিল। বিকেল বেলাও অনেকক্ষণ ধ্যান করতেন। সন্ধ্যারতি শেষ করে রাত্রে ভোগনিবেদন করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ধ্যানে বসে থাকতেন। সবসময়েই এত গম্ভীর ও ভাবস্থ হয়ে থাকতেন যে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতেও ভয় হ'ত। আশ্রমের চাকর-বামুনকে কোন-রকম হুকুম করা হ'ত না। তিনি বলতেন, 'তোমরা ওদের চাকর মনে করবে কেন? ভাববে, আমাদেরই সহায়ক।"

আশ্রম-স্থাপনের প্রথম বৎসরেই তুরীয়ানন্দ ও সারদানন্দ কিছুদিন তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনে আশ্রমের আধ্যাত্মিক আবহাওয়া আরও নিবিড়তর হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ দিনে হোমাদি অনুষ্ঠিত হইত। মহাপুরুষজী হোমাদি করার উপর বিশেষ জোর দিতেন—বলিতেন, "হোম করলে স্থানটিতে আধ্যাত্মিক ভাব আরও জেগে উঠবে।"

১৯০৩ সালের জুলাই মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কনখলের পথে সুবোধানন্দ সহ কাশী অদ্বৈতাশ্রমে প্রায় এক মাস কাল অবস্থান করেন। শ্রীগুরুদেবের বিরহবিধুর সমপ্রাণ তিনজন ভ্রাতা পরস্পরের সহিত আধ্যাত্মিক ভাব-বিনিময়ে সেই সময় খুব তন্ময়ভাবে একত্রে কাটাইয়াছিলেন।*

* অদ্বৈতাশ্রমে একবার চুরি হইয়াছিল। অন্যান্য জিনিষের সহিত আশ্রমের

কাশী অদ্বৈতাশ্রম

এদিকে এক বৎসরের মধ্যেই ভিঙ্গাররাজ-প্রদত্ত পাঁচশত টাকা প্রায় নিঃশেষিত হইবার পরে অদ্বৈতাশ্রম-জীবনে কঠোরতা ও অভাবের মাত্রা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু মহাপুরুষজী তাঁহার মনকে পার্থিব দুঃখ ও অস্বচ্ছলতার স্পর্শ হইতে বহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। 'যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ' ভাব-অবলম্বনে দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় মনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি বাহ্যিক অভাবের তীব্র পেষণের ভিতর নির্বিকারচিত্তে বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়াছিলেন। সেই সময় আশ্রমবাসীদিগকেও তাঁহারই মত স্বল্পে তুষ্ট থাকিতে হইত। নূতন ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে ঐ প্রকার কঠোর জীবন অবশ্য খুব কষ্টকর ছিল। তৎকালীন জনৈক ব্রহ্মচারী পরবর্তীকালে বলিয়াছিলেন, "ক্ষুধার জ্বালায় আমরা পাশের পেয়ারা-বাগানে গিয়ে পেয়ারা খেতাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যের ধৈর্য্য, সংযম ও বিশ্বাসাদি আরও বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয় মহাপুরুষজীকে সেই সময় এক মহাবিপদে ফেলিয়াছিলেন। অদ্বৈতাশ্রমে একটি অজ্ঞাত-কুলশীল যুবক কর্মিরূপে যোগদান করে। নিত্য বাজার করা প্রভৃতি কাজের ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। সে সময়ে আশ্রমের অনেক দিনের বাড়ীভাড়া বাকী পড়িয়া যাওয়ায় মহাপুরুষজী অতিকষ্টে প্রায় একশত টাকা বাড়ীভাড়ার জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ টাকা একটি ভাঙ্গা বাক্সে রাখা ছিল। উক্ত কর্মীটি টাকার সন্ধান জানিতে পারিয়া

নিত্যপূজিত ঠাকুরের অস্থির কৌটাটিও অপহৃত হয়। খোঁজাখুঁজির ফলে কয়েকদিন পরে অদ্বৈতাশ্রমের পাশের জঙ্গলাকীর্ণ জমিতে (বর্তমান সেবাশ্রম) চোরের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে ঐ কৌটাটি পাওয়া গেল। তাহাতে মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের অস্থি যখন ওখানে গিয়াছে তখন ও-সব জায়গাই তাঁর হয়ে যাবে।"

এক রাত্রে সমস্ত টাকা লইয়া পলায়ন করে। পরদিন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকলের সন্দেহ হইল এবং দেখা গেল যে, যেখানে টাকা রাখা ছিল সেখানে একটিমাত্র পয়সা পড়িয়া আছে। সেই এক পয়সা দিয়া তখনকার মত ঠাকুরের বাতাসাভোগ দেওয়া হইল। এদিকে বাড়ীওয়ালাও বাড়ীভাড়া চাহিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু তখন আশ্রমের কপর্দকশূন্য অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিতে না পারায় বাড়ীওয়ালা দারোয়ান পাঠাইয়া মহাপুরুষজীকে তাহার গদীতে লইয়া যায় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহাকে আটক রাখিয়া একটা মিটমাট করিবার পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। এই সকল লাঞ্ছনা ও অপমান তিনি নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। অথচ যাহার দুষ্কৃতির জন্য তাঁহাকে এতটা বিপদগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল তাহার উপর বিন্দুমাত্র ক্রোধ বা বিরক্তি-ভাব তাঁহার মনে আসে নাই। শ্রীভগবানের ইচ্ছা মনে করিয়া তিনি ঐ অবস্থাতে সম্পূর্ণ অবিচলিত ছিলেন। পরবর্তীকালে ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি স্মিতমুখে বলিয়াছিলেন, "ছেলেটার অভাব হয়েছিল তাই টাকা নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার এতটু ধর্মবুদ্ধি ছিল—তাই তো একটি পয়সা রেখে গিয়েছিল; তাতেই ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হল। কাজ তো আটকায় নি!"

তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই বলা যাইতে পারে—

"ধৈর্যং যস্য পিতা, ক্ষমা চ জননী, শান্তিশ্চিরা গেহিনী
সত্যং সূনুরেব, দয়া চ ভগিনী, ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং, দিশোঽপি বসনং, জ্ঞানামৃতং ভোজনম্
এতে যস্য কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাৎ ভয়ং যোগিনঃ।" [১]

---

১ ধৈর্য যাঁহার পিতা, ক্ষমা জননী, শান্তি গৃহিণী, সত্য পুত্র, দয়া ও সংযম

এই অভাব ও কৃচ্ছ্রতামধ্যেও গরীব-দুঃখীদিগের জন্য মহাপুরুষজীর প্রাণ আর্দ্র হইয়া যাইত। তিনি প্রতিবেশী গরীব ছেলেদের শিক্ষার জন্য অদ্বৈতাশ্রমে একটি অবৈতনিক পাঠশালা খুলিয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[২] অনেক গরীব পরিবারকেও যথাসাধ্য সাহায্যদানে তাহাদের অভাবমোচনের চেষ্টা করিতেন এবং স্বামিজীর ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে তাঁহার বক্তৃতাদি হিন্দী ভাষাতে ছাপাইয়া বিতরণের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

কাশীতে মহাপুরুষজীর অবস্থানের ফলে তথাকার সেবাশ্রমের সেবকগণও তাঁহার সংস্পর্শে নূতন উৎসাহ ও প্রেরণা পাইতেন এবং সেবাশ্রমের কাজকর্মও সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইত। তিনি যদিও আশ্রমের বাহিরে কদাচিৎ যাইতেন এবং সর্বসমক্ষে প্রচারকার্যে অবতীর্ণ

ভগিনী ও ভ্রাতা, ভূমিতলকে যিনি শয্যা এবং দিক্‌সমূহকে বসন করিয়াছেন, জ্ঞানরূপ অমৃত যাঁহার ভোজন—হে সখে! এইরূপ কুটুম্ব ও সম্বন্ধযুক্ত যোগীর ভয় কি?

২ জনৈক ভক্তকে ঐ অবৈতনিক পাঠশালার সাহায্যকল্পে ১৯০৭ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে কাশী হইতে লিখিত অনুরোধপত্রের একাংশ—"তোমরা এখানকার Free School for Young Boys (দরিদ্র বালকদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়) সম্বন্ধে একটু মনে রাখিও; ইহাতে এখানে অনেক দরিদ্র বালক কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিতেছে। কতকগুলি বেঞ্চ আদি প্রস্তুত করিবার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। তোমরা ঠাকুরের এই সব কার্যে সহানুভূতি কর—এইজন্য তোমাকে লিখিতেছি। স্বামীজীর এ সকল কার্য বড়ই প্রিয়। ১ম ধর্মদান, ২য় বিদ্যাদান, ৩য় প্রাণদান, ৪র্থ অন্নদান—কলিতে এই দানধর্মই প্রধান। ৺কাশীতে ঠাকুরের এই চার প্রকার কার্য কিছু কিছু হইতেছে এবং আরও হইবে। আশা করি তোমরা সহায় হও। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিও।"

হন নাই, তথাপি তাঁহার ধর্মজীবনের প্রভাব ক্রমশঃ বহু কাশীবাসীর উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। থিয়োসফিকাল সোসাইটির অনেক সভ্য এবং কাশীর তৎকালীন প্রথিতনামা পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহার দর্শন, পূতসঙ্গ ও আশীর্বাদ-প্রার্থী হইয়া অদ্বৈতাশ্রমে আসিতেন। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য, মহামহোপাধ্যায় কৈলাস-চন্দ্র শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী ও বাসুদেব শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশীর সন্ন্যাসি-মহলেও তাঁহার প্রভাব কম ছিল না। তাহা ছাড়া কাশীনিবাসী অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক এবং শিক্ষিত যুবকও তাঁহার সাহচর্যের ফলে ধর্মজীবনে প্রেরণা পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। যুবকগণের কেহ কেহ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন।

তৎকালে মহাপুরুষজী শ্রীভগবানের সান্নিধ্য এত নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিতেন যে, দৈবাৎ কোনও দিন ঐ আনন্দানুভূতি কিঞ্চিৎ ব্যাহত হইলে একান্ত অধীর হইয়া পড়িতেন আর বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিতেন, "চন্দ্র[১], দিনটা বৃথায় গেল; আজ তাঁর দর্শন পেলাম না—তাঁর জন্য একটু চোখের জলও বেরুল না।" তাঁহার গভীর ভাবুকতা, নিঃসঙ্গ ধ্যানমগ্ন ভাব সকলের প্রাণের অন্তঃস্তল স্পর্শ করিত। অনেক সময় বিভোর প্রাণের অমৃত-রস সিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে গাহিতে শোনা যাইত—

১ অদ্বৈতাশ্রমের তৎকালীন জনৈক ব্রহ্মচারী—তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্বামী নির্ভরানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহাপুরুষজী পাঁচ বৎসর পরে তাঁহারই উপর অদ্বৈতাশ্রমের কর্মভার অর্পণ করেন। তিনি প্রায় ৩৫ বৎসর কাল ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

তুমি নাহি দিলে দেখা, কে তোমায় দেখিতে পায়।
তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায়॥
তুমি পূর্ণ পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার,
ওহে নাথ! সাধ্য কার ধ্যানেতে ধরে তোমায়॥
মনেরে বুঝাই কত, তুমি বাক্যমনাতীত,
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত তোমারে দেখিতে চায়॥
দিয়ে দীনে দরশন, করহে দুঃখ মোচন,
ওহে লজ্জানিবারণ! শীতল কর হৃদয়॥

স্বভাবতঃ তিনি খুবই গম্ভীর প্রকৃতির কঠোরী সন্ন্যাসী হইলেও সেই রুদ্র আবরণের মধ্যে বাস করিত স্নেহময়ী জননীর কোমল প্রাণ। আশ্রমবাসিগণের প্রতি তাঁহার ভালবাসার সীমা ছিল না। ঐ ভালবাসা সমভাবে পরিবেশিত হইত—তাহাতে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী, প্রবীণ-নবীনের ভেদ ছিল না। তিনি সকলকেই সমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং প্রয়োজনমত সেবা করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন। একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, এরা সব জাত সাপের বাচ্চা; ঠাকুরের আশ্রয়ে যারা এসেছে তারা কেউ কম নয়।"

অনুমান ১৯০৪ সালের শীতের সময় ভোরবেলা বেলুড় মঠ হইতে জনৈক নবাগত ব্রহ্মচারী অদ্বৈতাশ্রমে উপস্থিত হন। মহাপুরুষজী তখনই তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালিয়া চা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে সযত্নে খাওয়াইলেন। আশ্রমে আরও সাধু থাকা সত্ত্বেও কাহাকেও ঐ সেবার ভার না দিয়া ব্রহ্মচারীটির বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি যে নিজেই চা প্রভৃতি তৈয়ার করিলেন; ঘটনা সামান্য হইলেও উহার পিছনে আমরা ধরিতে পারি সকলের প্রতি মহাপুরুষজীর আন্তরিক গভীর ভালবাসা। এই প্রকারে

কত ছোটখাট ঘটনা প্রতিদিনই অদ্বৈতাশ্রমের আশ্রমজীবনে ঘটিত, যাহার স্মৃতি তৎকালীন আশ্রমবাসিগণের প্রাণে মহাপুরুষজীকে চিরজাগরূক রাখিয়াছে।*

১৯০৬ সালের জুন মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বাস্থ্যোন্নতিমানসে স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে লইয়া পুণ্যধাম নীলাচলে গমন করেন। উহার কয়েক দিন পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখিবার জন্য মহাপুরুষজী কাশী হইতে রথযাত্রার পূর্বে পুরীধামে উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুকাল পরমানন্দে কাটাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দও তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। স্বামী অভেদানন্দ সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ২৩শে আগষ্ট পুরীতে পৌঁছিলে ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি ষ্টেশন হইতে তাঁহাকে স্বাগত করিয়া 'শশিনিকেতন' ভবনে আনিয়াছিলেন। ইহার দুই-তিন দিন পরে মাদ্রাজ হইতে রামকৃষ্ণানন্দও পুরী পৌঁছিলেন। ছয় জন গুরুভ্রাতা বহুদিন পরে একত্র মিলিত হওয়ায় সকলেরই প্রাণ আনন্দে ভরপূর হইয়াছিল। গুরুভাইদের সঙ্গে সাত দিন মহানন্দে কাটাইয়া অভেদানন্দ পুরী ত্যাগ করেন এবং তাহার কয়েক দিন পরে শিবানন্দও কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন।

পরেশনাথ পাহাড়ের নীচে চিড়কি নামক গ্রামে গোবিন্দ ভট্টাচার্য নামক সাঁতরাগাছির জনৈক ভক্তের একখানি বাড়ী ছিল। ঐ গ্রামের পার্শ্ব হইতেই পরেশনাথে উঠিবার রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ ভক্তের

* ১৯০৬ সালে ছয় হাজার টাকায় অদ্বৈতাশ্রমের বাড়ী ও জমি খরিদ করা হয়। পার্শ্ববর্তী জমিও সেবাশ্রমের জন্য ক্রয় করা হইয়াছিল। গোবিন্দবাবু অদ্বৈতাশ্রমের জমির জন্য কিছু অর্থসাহায্য করেন।

আমন্ত্রণে মহাপুরুষজী ১৯০৭ সালে কাশী হইতে একবার গিরিডি হইয়া চিড়কিতে যান। তাঁহার সঙ্গে স্বামী শঙ্করানন্দ ও উক্ত ভক্তটি ছিলেন। সেখানে কিছুদিন বাস করার ফলে মহাপুরুষজীর শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল।

অদ্বৈতাশ্রমে পাঁচ বৎসরের অধিককাল অবিচ্ছিন্ন কঠোরতার ফলে মহাপুরুষজীর সুদৃঢ় স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন হিতৈষিবর্গ ও ডাক্তার-গণের পরামর্শে সুযোগ্য ব্যক্তির উপর আশ্রমের কার্যভার ন্যস্ত করিয়া তিনি ১৯০৭ সালের শেষভাগে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ঘটনাপ্রবাহে

কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহাপুরুষজী ১৯১২ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বেলুড় মঠেই অধিকাংশ সময় ছিলেন। তাঁহার অনাড়ম্বর কঠোর জীবন, শান্ত সমাহিত ভাব, অমায়িক ব্যবহার মঠবাসিগণের মহা আকর্ষণীয় হইয়াছিল। বেলুড় মঠেও তিনি অনেক সময় গঙ্গার ধারে বাঘের ছালখানি বেঞ্চির উপর পাতিয়া রাত কাটাইয়া দিতেন। শারীরিক সুখ ও আরাম সম্বন্ধে চিরকালই ছিল তাঁহার উদাসীনতা। জনৈক সন্ন্যাসী একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "১৯০৮ সালে যখন আমি প্রথম মঠে যোগদান করি তখন দেখেছি মহাপুরুষজী মঠের কাজকর্ম দেখতেন; অথচ সর্বদাই নিজের ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। আর কি কঠোর জীবনই তাঁর ছিল! পরণে সামান্য হাঁটুপর্যন্ত কাপড়, খালি গা, খালি পা—ঐ ভাবে মঠে বেড়াতেন। কখনও গঙ্গার ধারে বেঞ্চের উপর এমন তন্ময় হয়ে বসে থাকতেন যে তাঁকে দেখে মনে হত—বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধই নেই। উদাস দৃষ্টি—সামনে দিয়ে লোক চলে যাচ্ছে অথচ তিনি যেন কাউকে দেখতেই পাচ্ছেন না।" ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকে মহাপুরুষজীর বৈরাগ্যময় জীবনকাহিনী মাত্র শুনিয়াছিলেন; এখন তাঁহার পূতসঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহারা চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইলেন। তখন ঠাকুরপূজা ও মঠের যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশুনার ভার ছিল স্বামী প্রেমানন্দের উপর। তিনি অসুস্থ হইলে অথবা কর্মোপলক্ষে কলিকাতায় বা অন্যত্র গেলে মহাপুরুষজীই ঠাকুরপূজা ও মঠের অন্যান্য কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করিতেন।

ঠাকুরের পূজা করা সম্বন্ধে তিনি পরবর্তী কালে একদিন বলিয়াছিলেন—"দেখ, আমরা যখন পুজো করতাম সে ছিল শুধু ভাবের পুজো। এত আড়ম্বর আমাদের কিছুই ছিল না। পুজো করতে বসে ভাবতাম, তিনি দক্ষিণেশ্বরে যেমন নিজ খাটটিতে বসে থাকতেন তেমনি প্রত্যক্ষভাবেই এখানেও রয়েছেন; সেই ভাবেই তাঁর পা দুখানি ধুইয়ে মুছিয়ে, তাঁকে স্নানাদি করিয়ে কাপড়-চোপড় পরান হত। তারপর ফুলচন্দন দিয়ে সাজিয়ে ফলমূলমিষ্টান্নাদি খেতে দিতাম, পরে আবার অন্নব্যঞ্জনাদি নিবেদন করে দিতাম।···মন্ত্রতন্ত্র বিধিমত কিছু কিছু থাকলেও তার ওপর আমাদের তেমন ঝোঁক থাকত না এবং পুজোয় আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না। তিনি আমাদের প্রাণের ঠাকুর, তিনি চান প্রাণের ভালবাসা, আত্মনিবেদন।"

জনৈক পাশ্চাত্ত্যদেশীয় সাধু প্রসঙ্গক্রমে একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি যখন প্রথম আমেরিকা হতে আসি তখন একদিন মহাপুরুষ মহারাজ মঠের পুরানো চা-বারান্দায় (পশ্চিমের বারান্দায়) বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। আর সব সাধুভক্তও সেখানে ছিলেন। আমায় তিনি ডেকে সস্নেহে পাশে বসালেন এবং গড়গড়ার শব্দ সম্বন্ধে কৌতুক করে বল্লেন যে ওর ভেতর ব্যাঙ্ আছে। পরে কি করে গড়গড়া টানতে হয় দেখিয়ে আমায় গড়গড়ায় তামাক খেতে দিলেন। ব্যাপারটা আমি তখন সাধারণ-ভাবেই গ্রহণ করেছিলাম; কারণ আমাদের সমাজে ধূমপান একটা মামুলী ব্যাপার—তাতে গুরুলঘু-বিবেচনার আবশ্যক নেই। আর নিছক কৌতুক ছাড়া উহার অন্য কোন তাৎপর্য যে থাকতে পারে তাও আমার তখন মনে হয় নি। কিন্তু পরে হিন্দুসমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বুঝলাম, মহাপুরুষজী সেদিন শুধু যে আমাদের পাশ্চাত্ত্য-রীতি মেনে নিয়ে আমার

প্রতি গভীর স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন তা নয়, ঐ একই গড়গড়াতে ধূমপান করিয়ে তিনি আমাকে সমাজে তুলে নিয়েছিলেন।"

ঘটনাটি সামান্য কিন্তু উহা ঐ সাধুর প্রাণে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল এবং মহাপুরুষজীর হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ দিয়াছিল।

অন্য এক সময়ে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁহার হিন্দু বন্ধুদের সহিত বেলুড় মঠে আসেন। মহাপুরুষজী অমায়িক ব্যবহারে তাঁহাকে এতটা আপন করিয়া লইয়াছিলেন যে, ঐ ভদ্রলোক অতঃপর প্রায়ই মঠে আসিতেন। একদিন তিনি মঠে প্রসাদও পাইলেন। মঠের চাকররা মুসলমান বলিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাতা মুক্ত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাপুরুষজী স্বহস্তে সেই পাতা গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া ঝাঁটা লইয়া স্থানটি পরিষ্কার করেন।

অন্য একদিন মাদ্রাজের একজন খৃষ্টান ভদ্রলোক মঠে আসিলেন। মহাপুরুষজীর সপ্রেম ব্যবহার ও আদরযত্নে তিনি এতই অভিভূত হইয়াছিলেন যে, বিদায়গ্রহণকালে সজলনয়নে বলিয়াছিলেন, "মাদ্রাজ ছেড়ে এত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু সব জায়গায়ই খৃষ্টান বলে আমায় অবজ্ঞা ও মহা দূরছাই করেছে! এমন ভালবাসা, এত যত্ন আমি আর কোথাও পাই নি—এ আমার কল্পনারও অতীত!"

কয়েকদিন মাত্র সামান্য অসুখে ভুগিয়া ১৯০৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর স্বামী অদ্বৈতানন্দ (বুড়ো গোপাল) শ্রীগুরুদেবের নাম করিতে করিতে গুরুভ্রাতা ও সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-পরিবৃত হইয়া বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। মঠপ্রাঙ্গণে গঙ্গাতীরেই তাঁহার পূত দেহের সৎকার করা হইয়াছিল। গোপালদার দেহত্যাগে মহাপুরুষজী খুবই ব্যথিত হইয়াছিলেন। বরাহ-

নগর মঠস্থাপনের সময় হইতে তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করেন। পরস্পরের মধ্যে একটা নিবিড় ভালবাসা ছিল। গোপালদা তপস্যাদির জন্য কাশী গমন করিয়া যখন পীড়িত হন, তখন মহাপুরুষজী তাঁহার জন্য কতটা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেখিতে পাওয়া যায় আমবাজার মঠ হইতে ১৬।৮।১৮৯৬ তারিখে লিখিত একখানি চিঠিতে—"আমাদের বৃদ্ধ স্বামী, যিনি বারাণসীপুরী সেবা করিতেছেন, পায়ে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন লখিয়াছেন। দুইবার অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইয়াছে—তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সংবাদ লইবেন এবং কোনরূপ সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না। পত্রপাঠ-মাত্র সংবাদ লইবেন। তিনি কুচবিহারের ৺কালীবাটীর পশ্চাদ্ভাগে বাবু সাগরচন্দ্র সুরের বাটিতে আছেন—বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। আপনি সংবাদ লইয়া একখানি পত্র লিখিবেন—আপনার পত্রের প্রতীক্ষা করিতে থাকিলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-আত্মগোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে স্বর্গীয় ভালবাসা ছিল, তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ। একে অন্যকে শ্রীগুরুদেবের একটি রূপ মনে করিয়া তদনুরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করিতেন। মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন, "আমাদের ভেতর পরস্পরের প্রতি যে ভালবাসা ছিল তা ঠাকুরেরই শিক্ষার ফল। তিনি নিজে আমাদের ভালবেসে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন।"

১৯০৯ সালের মাঝামাঝি কিছু দিনের জন্য মহাপুরুষজী দার্জিলিংএ গিয়ে কয়েকমাস নির্জনবাসের পরে পুনরায় মঠে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

১৯১০ সালে শিবরাত্রির দিন তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুরের পত্নী

লেডি মিণ্টো বেলুড় মঠ পরিদর্শন করিতে আসেন। ঐ প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন, "তখন পূজা করি। ...অত বড় ঘরের বৌ, কিন্তু কি বিনীতা, কি মিষ্টভাষিণী! ওঁদের বিশ্বাস ছিল, স্বামিজী প্রথম এই সংঘ আরম্ভ করেন। তাঁদের আমি কথাপ্রসঙ্গে বললাম, 'এ সংঘ আমরা সৃষ্টি করি নি। ঠাকুরের অসুখের সময় এই সংঘ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন। সেই সময় তিনি নিজে স্বামিজী এবং আর আর সকলকে শিক্ষা দিয়ে কি করে এই সংঘ গঠন ও চালনা করতে হবে শিখিয়েছিলেন। সেই হল মঠের গোড়াপত্তন।' এই কথা প্রথম আমার কাছে শুনে লেডি মিণ্টো বিস্মিতা হলেন।"

১৯১০ সালের প্রথমভাগে মহাপুরুষজী কাশ্মীরে ৺অমরনাথদর্শনমানসে বেলুড় মঠ হইতে রওনা হন এবং কনখলে আসিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ, প্রেমানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ ও ব্রহ্মচারী গুরুদাস[১] সহ কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করেন। রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত রেলগাড়ীতে আসিয়া তথা হইতে সকলেই টাঙ্গায় শ্রীনগর গিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীনগরে কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়া তথা হইতে মার্তণ্ড (মাটন—পাণ্ডাদিগের গ্রাম) হইয়া অমরনাথ যান। মাটনের পাণ্ডার খাতায় এখনও সন-তারিখ সহ মহাপুরুষজীর দস্তখত দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীর সরকারের তরফ হইতে তাঁহাদের তাঁবু প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অমরনাথদর্শনানন্তর শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা প্রথমে বাড়ীভাড়া করিয়া থাকেন, পরে ঝেলামবক্ষে কিছুদিন হাউস-বোটে কাটাইয়া পরে ক্রমে ক্রমে কাশ্মীরের নানা দ্রষ্টব্য স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরভ্রমণে তাঁহাদের প্রায় তিন মাস লাগিয়াছিল। মহাপুরুষজী কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া কাশীতে

১ স্বামী অতুলানন্দ

আসেন এবং অসুস্থ হইয়া কিছুদিন সেবাশ্রমে থাকেন। একটু সুস্থ হইবার পরেই বেলুড় মঠে চলিয়া আসিলেন। মাস দুই পরে তিনি পুনরায় কঠিন রক্তামাশয়রোগে আক্রান্ত হন। মঠে কিছুতেই রোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া প্রেমানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইদিগের আগ্রহে সুচিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতায় উদ্বোধন কার্যালয়ে আসিয়া রহিলেন। সেই সময় নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে অন্যের কিছু কিছু সেবা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মহাপুরুষজী চিরকালই স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। অন্যের সেবা করাতেই ছিল তাঁহার আনন্দ, অপরের সেবা নেওয়া তাঁহার একান্তই স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। এমন কি, যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত এবং বৃদ্ধ, তখনও অন্যের সেবাগ্রহণ করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতে দেখা যাইত। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনও এত অনাড়ম্বর ছিল যে, তাঁহার কোন প্রকার সেবা করার সুযোগ পাওয়াটা তৎকালীন মঠের সাধুগণ পরম সৌভাগ্য মনে করিতেন।

কলিকাতায় কিছুদিন চিকিৎসার ফলে রোগের উপশম হইলে মহাপুরুষজী পুনরায় বেলুড় মঠে ফিরিয়া গেলেন। বিশেষ করিয়া ঐ রক্তামাশয়রোগের পর হইতে তিনি আহারাদি খুবই বাঁধাবাঁধি নিয়মে করিতে লাগিলেন। ইহার পরে তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত, দীর্ঘ চব্বিশ বৎসরকাল তিনি 'খাওয়া জীবনধারণের জন্য, জীবনধারণ খাওয়ার জন্য নহে (Eat to live, not live to eat)—এই নীতি অতি কঠোরভাবে পালন করিয়াছিলেন। দেখা যাইত, অতি উপাদেয় নানাজাতীয় চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সামনে উপস্থিত থাকিলেও তিনি ঐসকল খাবার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া নির্বিকার-

চিত্তে অতি সাধারণ ঝোলভাত খাইয়া ভোজন সমাপ্ত করিতেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অতি প্রীতমনে যে স্বাদহীন ঝোল তিনি খাইতেন, তাহাকে স্বামী সারদানন্দ কৌতুক করিয়া নাম দিয়াছিলেন 'মহাপুরুষের ঝোল'। তিনি কখনও কখনও বলিতেন, "অনেক রকম খাবার-দাবার সামনে থাকিলে সে দিন পেটভরে খাওয়াই হয় না। সব যেন কেমন গুলিয়ে যায়।"

১৯১১ সালে রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসে একটি দারুণ শোকাবহ বৎসর। ৮ই ফেব্রুয়ারী স্বামিজীর প্রিয় শিষ্য সদানন্দ অকালে দেহত্যাগ করেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-গতপ্রাণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জীবনমধ্যাহ্নে কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে অনেকদিন ভুগিয়া ২১শে আগষ্ট বাগ-বাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে শ্রীগুরুপদে মিলিত হন। তাঁহার পূতদেহ বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে দাহ করা হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই রামকৃষ্ণ-জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র কক্ষ্যচ্যুত হইল। ১৩ই অক্টোবর স্বামিজীর প্রিয়শিষ্যা নিবেদিতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চরণে চরম আত্মনিবেদন করিয়া নিজসাধনোচিত লোকে প্রস্থান করিলেন। রামকৃষ্ণানন্দের অকাল দেহত্যাগে মহাপুরুষজী খুবই শোকসন্তপ্ত হইয়া-ছিলেন। শশী মহারাজ যখন উদ্বোধনে রোগশয্যায় শায়িত তখন মহাপুরুষজী প্রায়ই বেলুড় মঠ হইতে গিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গাদি করিতেন এবং তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতেন। দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল এবং ক্রমে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঠাকুর তাঁহার প্রিয় সেবককে আর মরজগতে রাখিবেন না। শশী মহারাজের ঐ প্রকার কঠিন অসুখে ভুগিয়া দেহত্যাগসম্বন্ধে মহাপুরুষজী একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তাঁর লীলা বোঝা

ভার। অমন যে শশী মহারাজ ঠাকুরের কত সেবাই না করেছিলেন—অথচ তাঁকে এত রোগযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর পাঁঠা তিনি যে করেই কাটেন—লেজেও কাটতে পারেন আবার ঘাড়েও কাটতে পারেন। ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার লীলা! শশী মহারাজের ঠাকুরসেবা একটা দেখবার জিনিষ ছিল। তাঁর সেবা দেখেই মনে হত যে তিনি জীবন্ত দেবতার সেবা করছেন। একনিষ্ঠ সেবা কাকে বলে তা শিখতে হলে, বাবা, শশী মহারাজের জীবন দেখ।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রতি তাঁহার কত গভীর শ্রদ্ধা এবং নিবিড় ভালবাসা ছিল, তাহা সম্যক্‌ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে মহাপুরুষজীর আর একটি উক্তিতে—"স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রেম ও পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি ছিলেন। দেহমনের এইরূপ পবিত্রতা বিরল দেখা যায়। তাঁহার জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার যে ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল তাহা অসীম ও অসাধারণ। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মহাবীরের যে ভক্তি ছিল, তাহার সহিতই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের গুরুভক্তির তুলনা হইতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে শ্রদ্ধা করিতেন। গুরুভ্রাতাগণের প্রতি তাঁহার প্রেম পূজার তুল্য ছিল। তাঁহার নিকট উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র ভেদ ছিল না। সকলের কল্যাণের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। প্রসারিত বাহুতে সকলকেই তিনি আলিঙ্গন করিতেন এবং ভালমন্দ-নির্বিশেষে সকলকে তাঁহার করুণা বিতরণ করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে সেবা করা এবং প্রত্যেকের অন্তঃস্থিত দেবত্ব-বিকাশের সাহায্য করাই ছিল তাঁহার জীবনব্রত। এই ব্রতের বেদীতে তিনি নিজেকে বলিদান দিয়াছিলেন। যাহা অপরকে করিতে বলিতেন

তাহা তিনি স্বয়ং সর্বাগ্রে করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজের জন্য তিনি ইহজগতে আগমন করেন। সমগ্র প্রাণ দিয়া তিনি ইহজীবনে ৺ঠাকুর-সেবা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণানন্দ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীগুরুমহারাজের পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীগুরুর সেবা ব্যতীত তিনি অন্য কাজ করিতেন না। তিনি গুরুগতপ্রাণ ছিলেন। দক্ষিণভারতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে যে বিরাট কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ভিত্তি স্থাপিত হয় রামকৃষ্ণানন্দজীর বুকের রক্তে। যত দিন যাইবে ততই লোকে তাঁহার প্রেম ও প্রভাব বুঝিতে পারিবে।"

যদিও মহাপুরুষজী কাশী অদ্বৈতাশ্রম-পরিচালনার দায়িত্বভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি বেলুড় মঠে অবস্থানকালেও তিনি স্বামিজীর বিশেষ ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত ঐ আশ্রমের কাজ নানাভাবে প্রয়োজনমত সাহায্য করিতেন। তাহার ফলে আশ্রমটি ক্রমে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মঠের অনেক সাধুই শিবপুরীতে অবস্থিত ভজনসাধনের অনুকূল ঐ অশ্রেমে থাকিয়া নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবন সমৃদ্ধ করিবার সুযোগ পাইলেন।

এদিকে কনখলে কল্যাণানন্দের একনিষ্ঠ সাধনা, ঐকান্তিক চেষ্টা ও কর্মকুশলতার ফলে আর্তনারায়ণ-সেবাকার্য অতি সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া ক্রমে বহুল প্রসার লাভ করিতেছিল। কল্যাণানন্দের বিশেষ অনুরোধে ১৯১২ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের পরে মার্চ মাসের শেষে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ ও তুরীয়ানন্দ কনখল সেবাশ্রমে গমন করেন। তিনজন সিদ্ধ মহাপুরুষের একত্র মিলনে পরস্পরের মধ্যে কত আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রসঙ্গ ও ভাবের আদান-প্রদান হইত। ধ্যান,

ভজন, সৎপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতিতে কনখল সেবাশ্রম যেন জমিয়া উঠিল! সমবেত সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণের প্রাণ আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ থাকিত। সেই বৎসর স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঐ পূত সতীক্ষেত্রে প্রতিমায় দশভুজার আরাধনার আয়োজন করিয়াছিলেন। যুগাবতারের তিনজন লীলাসহচরের অবস্থানের ফলে পূজার আনন্দ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

কনখলে প্রায় সাত মাস কাটাইয়া অক্টোবর মাসের শেষভাগে শ্যামাপূজার অব্যবহিত পূর্বে মহাপরুষজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ সহ কাশীধামে আগমন করেন। পূজার কয়েক দিন পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও কাশীতে আসিয়াছিলেন এবং আশ্রমের নিকটে এক ভক্তগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। ঠাকুরের পরম ভক্ত মাষ্টার মহাশয়ও তখন কশীতে উপস্থিত ছিলেন। মহাপুরুষজীর অদ্বৈতাশ্রমস্থাপন ও তথায় কঠোর তপস্যা সার্থক হইয়াছিল শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণে। যুগাবতারের এতগুলি পার্ষদের একত্র সমাবেশে, সর্বোপরি মাতাঠাকুরাণীর উপস্থিতিতে সেইবার কাশী অদ্বৈতাশ্রমে শ্যামাপূজা যেন বাস্তব চিন্ময়ীদেবী-পূজাতে পরিণত হইয়াছিল।[১]

---

১ কাশী অদ্বৈতাশ্রম হইতে ২৫।১১।১৯১২ তারিখে লিখিত মহাপুরুষজীর পত্রে জানিতে পারা যায়—"তোমার পত্র এখানে পাইয়াছিলাম কিন্তু অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা-প্রযুক্ত যথাসময়ে উত্তর দেওয়া হয় নাই। এ আশ্রমে এবার শ্যামা ও জগদ্ধাত্রী-পূজা প্রতিমায় অতি আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীমাও আশ্রমের অতি নিকটে একটি বাটীতে রহিয়াছেন—পূজার সময় তিনি প্রতিমার সন্নিকটে ক্ষণকালের জন্য উপস্থিত হইয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাইতেন, তাহাতে মূর্তি যেন সজীব হইয়া উঠিত এবং ভক্তদের চিত্তে উৎসাহ, আনন্দ ও পবিত্রতার স্রোত বহিয়া যাইত।..."

সেই সময় মহাপুরুষজী সর্বদাই যেন ভাবতন্ময় হইয়া থাকিতেন। একদিন অদ্বৈতাশ্রমে অনেক বলিয়া কহিয়া মহাপুরুষজীকে ফটো তুলিবার জন্য রাজী করা হইল। তিনি যুক্তকরে আসনে বসিবার পরে জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহার পার্শ্বে একটি কমণ্ডলু রাখিলেন। ফটোগ্রাফার ফটো তুলিবার আয়োজন করিতেছেন, ইতোমধ্যে মহাপুরুষজী ঐ আসনেই গভীর ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন—ভ্রূনিবদ্ধ দৃষ্টি, বাহ্যিক কোন হুঁশ নাই। তাঁহার ঐপ্রকার অবস্থা দেখিয়া সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়! অগত্যা স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহাপুরুষ, একটু ঠিক হয়ে বসুন—ফটো তুল্‌বে যে!" এইভাবে বারংবার বলিতে বলিতে মহাপুরুষজী সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "য়্যাঁ—য়্যাঁ, কি বল্‌ছ?" পরে ছবি তোলা হইয়াছিল।

শ্যামাপূজার পরে অদ্বৈতাশ্রমে জগদ্ধাত্রীপূজাও মহানন্দে অনুষ্ঠিত হইল। সে বৎসর স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ ও তুরীয়ানন্দ তিনজনেই কাশীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব পর্যন্ত ছিলেন।

মে মাসের মাঝামাঝি মহাপুরুষজী স্বামী তুরীয়ানন্দ সহ পুনরায় কনখল গমন করিলেন। তখন মাষ্টার মহাশয়ও কনখলে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহাদের আগমনসংবাদ পাইয়া হরিদ্বার ও হৃষীকেশ-অঞ্চলের অনেক খ্যাতনামা সন্ন্যাসী তাঁহাদিগের সঙ্গে ব্রহ্মবিচার ও শাস্ত্রালোচনাদি করিতে আসিতেন।

আলমোড়া

আলমোড়ায়

শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহী ভক্ত পণ্টুবাবু নিজপুত্রের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এই সময় আলমোড়ায় আসিয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। মহাপুরুষজী কনখলে আছেন জানিতে পারিয়া পণ্টুবাবু তাঁহাকে আলমোড়া যাইবার জন্য আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিলেন। তিনিও তদনুসারে ১৬ই জুন আলমোড়ায় উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনে পণ্টুবাবুর মুহ্যমান প্রাণে যেন নবচেতনার সঞ্চার হইল। মহাপুরুষজী নিজ ভজন-সাধনের অবসর-সময়ে পণ্টুবাবুর সহিত সৎপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রালাপ ও ঠাকুরের কথাবার্তা বলিয়া তাঁহার হতাশ ও নিরানন্দ প্রাণে আনন্দদান করিতেন।

মহাপুরুষজীর আগমনসংবাদে আলমোড়ার ভক্তগণ ক্রমে তাঁহার নিকট সমবেত হইতে লাগিলেন। অনেক যুবকভক্তও সেই সময় তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি কখনও জনমানবশূন্য পাহাড়ে একাকী চলিয়া যাইতেন এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় কিছুদিন কাটাইয়া পুনরায় আলমোড়ায় ফিরিয়া আসিতেন। কখনও বা পাতালদেবী [১] প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইতেন।

আলমোড়ায় অবস্থানকালে মহাপুরুষজী শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয়কে কয়েকখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে ২৭।১০।১৩ তারিখের

---

১ আলমোড়া শহরের উপকণ্ঠে নির্জন প্রদেশে অবস্থিত একটী দেবীমন্দির। স্বামী সারদানন্দও ঐ স্থানে কিছুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।

চিঠিতে রহিয়াছে, "আপনার চিঠি পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি—বিশেষ করিয়া আপনি মঠেই বাস করিবার সংকল্প করিয়াছেন জানিয়া। আপনার ন্যায় শ্রীপ্রভুর একজন প্রিয় সন্তানকে মঠের অঙ্গরূপে পাইয়া আমরা সকলেই বিশেষ আনন্দিত। ইহাতে মঠবাসীদের এবং আপনার উভয়পক্ষেরই মহাকল্যাণ হইবে। আপনার পরিবারবর্গের এবং কলিকাতাস্থ ছাত্র ও শিক্ষিত-সমাজের সম্মুখেও উহা এক উচ্চাদর্শ স্থাপন করিবে। আপনার শুভ সংকল্পের সংবাদে যে কি পরিমাণ আনন্দিত হইয়াছি তাহা এইপ্রকার একটি ক্ষুদ্রপত্রে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। আপনি কিছুদিন মঠে বাস করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে মঠসংক্রান্ত যাবতীয় কাজের কত বড় দায়িত্ব আপনার উপর নির্ভর করিতেছে।"

কয়েকমাস পরে পল্টুবাবুরা আলমোড়া হইতে চলিয়া আসেন কিন্তু মহাপুরুষজী ঐস্থানেই রহিয়া গেলেন। তিনি ঐসময় কি ভাবে তথায় থাকিতেন তাহা গল্পচ্ছলে একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "চিলকাপেটা হাউসের[১] আউট হাউসটাতে[২] থাকতাম—ওখানেও একটি পাহাড়ী কুকুর কোত্থেকে জুটে গিয়েছিল। কুকারে নিজেই রান্না করে খেতাম—ডালভাত আর একটা ঝোল। ডালের জলটা আমি খেতাম, আর ঘন ডাল আর ভাত মেখে কুকুরটাকে দিতাম। ও বেটাও তাই খেয়ে ওখানে পড়ে থাকত। শীতের সময় বড় ঠাণ্ডা—চারিদিকে বরফ পড়ে। আমি কুটীরের ভিতরেই থাকতাম, নেহাৎ দরকার না হলে বেরুতাম না। পাশের বাগানে একজন মালী

১ আলমোড়ায় যে বাড়ীতে মহাপুরুষজী থাকিতেন তাহার নাম।

২ বাহিরের ছোট বাড়ী।

ছিল—কোন কিছু দরকার হলে তাকে দিয়ে আনিয়ে নিতাম। বেশ থাকতাম ওখানে, কোন কষ্ট হত না— আনন্দে ছিলাম।" ঐ সময়ের কয়েকখানি চিঠিতে তাঁহার মনের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, আর জানিতে পারা যায় তাঁহার অহংশূন্যভাব কত গভীর ছিল— "তুমি আমার জীবনসম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ—আমার জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে—তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণদর্শন ও তাঁহার কৃপালাভ—সেও তাঁহার নিজগুণে! আমার এমন কোন গুণ ছিল না যদ্দ্বারা তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারি। তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন—এইমাত্র ঘটনা জীবনে।" অন্য চিঠিতে আছে, "আমি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত দাস—এইমাত্র জানি। তিনি দয়া করিয়া যখন তাঁর স্মরণ করান তখন তাঁর স্মরণ করি, যখন পাঠ করান তখন পুস্তকাদি পাঠ করি বা কাহারও কাহারও সহিত ধর্মকথা আলাপ করি—এই আমার কাজ। ভরসা একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা—সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আছে; আর এজীবনে আমার কিছুই নাই এবং কিছুর আকাঙ্ক্ষাও নাই তাঁর কৃপায়। আমি এখন প্রভু যেখানে রাখিবেন সেখানেই থাকিব—নিজের কর্তৃত্ব কিছুই নাই; প্রভু যেরূপ করাবেন তাই করিব।"

যে-সকল ভক্ত মহাপুরুষজীর দেবোপম জীবনের স্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্তু মহাপুরুষজীর ভিতর গুরুবুদ্ধি আদৌ ছিল না। এই সময়কার একখানি চিঠিতে দেখিতে পাওয়া যায়, "আমার শিষ্য ত্রিজগতে কেহ নাই—আমি প্রভুর দাস। ...প্রভু যেভাবে আমাকে শিক্ষিত করিয়াছেন তাহাতে আমার

চিঠিতে রহিয়াছে, "আপনার চিঠি পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি—বিশেষ করিয়া আপনি মঠেই বাস করিবার সংকল্প করিয়াছেন জানিয়া। আপনার ন্যায় শ্রীপ্রভুর একজন প্রিয় সন্তানকে মঠের অঙ্গরূপে পাইয়া আমরা সকলেই বিশেষ আনন্দিত। ইহাতে মঠবাসীদের এবং আপনার উভয়পক্ষেরই মহাকল্যাণ হইবে। আপনার পরিবারবর্গের এবং কলিকাতাস্থ ছাত্র ও শিক্ষিত-সমাজের সম্মুখেও উহা এক উচ্চাদর্শ স্থাপন করিবে। আপনার শুভ সংকল্পের সংবাদে যে কি পরিমাণ আনন্দিত হইয়াছি তাহা এইপ্রকার একটি ক্ষুদ্রপত্রে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। আপনি কিছুদিন মঠে বাস করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে মঠসংক্রান্ত যাবতীয় কাজের কত বড় দায়িত্ব আপনার উপর নির্ভর করিতেছে।"

কয়েকমাস পরে পণ্টুবাবুরা আলমোড়া হইতে চলিয়া আসেন কিন্তু মহাপুরুষজী ঐস্থানেই রহিয়া গেলেন। তিনি ঐসময় কি ভাবে তথায় থাকিতেন তাহা গল্পচ্ছলে একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "চিলকাপেটা হাউসের[১] আউট হাউসটাতে[২] থাকতাম—ওখানেও একটি পাহাড়ী কুকুর কোত্থেকে জুটে গিয়েছিল। কুকারে নিজেই রান্না করে খেতাম—ডালভাত আর একটা ঝোল। ডালের জলটা আমি খেতাম, আর ঘন ডাল আর ভাত মেখে কুকুরটাকে দিতাম। ও বেটাও তাই খেয়ে ওখানে পড়ে থাকত। শীতের সময় বড় ঠাণ্ডা—চারিদিকে বরফ পড়ে। আমি কুটীরের ভিতরেই থাকতাম, নেহাৎ দরকার না হলে বেরুতাম না। পাশের বাগানে একজন মালী

১ আলমোড়ায় যে বাড়ীতে মহাপুরুষজী থাকিতেন তাহার নাম।

২ বাহিরের ছোট বাড়ী।

ছিল—কোন কিছু দরকার হলে তাকে দিয়ে আনিয়ে নিতাম। বেশ থাকতাম ওখানে, কোন কষ্ট হত না— আনন্দে ছিলাম।” ঐ সময়ের কয়েকখানি চিঠিতে তাঁহার মনের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, আর জানিতে পারা যায় তাঁহার অহংশূন্যভাব কত গভীর ছিল— “তুমি আমার জীবনসম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ—আমার জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে—তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণদর্শন ও তাঁহার কৃপালাভ—সেও তাঁহার নিজগুণে! আমার এমন কোন গুণ ছিল না যদ্দ্বারা তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারি। তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন—এইমাত্র ঘটনা জীবনে।” অন্য চিঠিতে আছে, “আমি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত দাস—এইমাত্র জানি। তিনি দয়া করিয়া যখন তাঁর স্মরণ করান তখন তাঁর স্মরণ করি, যখন পাঠ করান তখন পুস্তকাদি পাঠ করি বা কাহারও কাহারও সহিত ধর্মকথা আলাপ করি—এই আমার কাজ। ভরসা একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা—সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আছে; আর এজীবনে আমার কিছুই নাই এবং কিছুর আকাঙ্ক্ষাও নাই তাঁর কৃপায়। আমি এখন প্রভু যেখানে রাখিবেন সেখানেই থাকিব—নিজের কর্তৃত্ব কিছুই নাই; প্রভু যেরূপ করাবেন তাই করিব।”

যে-সকল ভক্ত মহাপুরুষজীর দেবোপম জীবনের স্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্তু মহাপুরুষজীর ভিতর গুরুবুদ্ধি আদৌ ছিল না। এই সময়কার একখানি চিঠিতে দেখিতে পাওয়া যায়, “আমার শিষ্য ত্রিজগতে কেহ নাই—আমি প্রভুর দাস। …প্রভু যেভাবে আমাকে শিক্ষিত করিয়াছেন তাহাতে আমার

জীবনে কখনও গুরুবুদ্ধি আসিতে পারিবে না এবং তাহা তাঁর কাছে আমি কখনই প্রার্থনা করি না, কারণ সে বুদ্ধি মনে আসেই না। প্রভুই এযুগে সকল জীবের গুরু ও ইষ্ট—আমরা কেবল জীবের যাহাতে তাঁর উপর বিশ্বাস-ভক্তি হয় এবং যাহাতে উহা বৃদ্ধি হয় সেজন্য আন্তরিক প্রার্থনা তাঁর চরণে করিব।”

ঐ সময় মহাপুরুষজী আলমোড়াতে একাদিক্রমে প্রায় দেড় বৎসর ছিলেন। ১৯১৪ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশীধামে অদ্বৈত আশ্রমে প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীমাতার আরাধনা করেন এবং সেই উপলক্ষ্যে মহাপুরুষজীকে তথায় আসিবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। মহাপুরুষজীও কাশীতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু ঘটনাচক্রে পাহাড় হইতে নীচে নামিবার কুলি না পাওয়ায় তখন আসা ঘটে নাই। অতঃপর ৬ই নভেম্বর তিনি কাশীতে আসেন। ঐ সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত প্রেমানন্দ ও তুরীয়ানন্দ প্রভৃতিও কাশীতে ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিলনে মহাপুরুষজী খুবই আনন্দিত হইলেন।

মহাপুরুষজীর কাশী-আগমনের সংবাদে তাঁহার দর্শনমানসে বাংলাদেশ হইতে চারিজন ভক্ত ঐ সময় কাশীতে আসেন। তাঁহার আশ্রমের নিকটে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে জনৈক একদিন প্রাণের আর্তি জানাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপুরুষজীকে বলিলেন, “মহারাজ, জীবনে কত পাপ করেছি! আপনি মহাপুরুষ, কৃপা করে আমার গতিবিধান করুন।” মহাপুরুষজী ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “তুমি কি পাপ করেছ? মদ খেয়েছ? বা অন্য কোন পাপ কার্যে আসক্ত হয়েছ?” ভক্তটি তদুত্তরে ঐ প্রকার কোন পাপ করেন নাই বলাতে মহাপুরুষজী গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

"তবে তুমি আর কি পাপ করেছ, বাবা? তুমি ঠাকুরের কথা শোন নি? ঠাকুর বলতেন—পাপ তুলোর পাহাড়। পাহাড়প্রমাণ তুলো যেমন সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গেই অচিরে ভস্মীভূত হয়, তেমনি ভগবানের কৃপাকণালাভে পাহাড়প্রমাণ পাপও চকিতে ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার কোন ভয় নেই। আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জাগ্রত জীবন্ত যুগাবতার। তোমাদের কৃপা করবেন বলেই তো তিনি এসেছিলেন। আমি বল্‌ছি, তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করে তোমায় কোলে তুলে নেবেন। তাঁকে ডাক, তাঁর নাম কর। পতিতপাবন রামকৃষ্ণ-নাম করে যাও, আর কিছু করতে হবে না।" মহাপুরুষজী এমন তেজের সহিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন যে, সমবেত সকলেই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কৃপাপ্রাপ্ত ঐ ভক্তটির জীবন ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া পরবর্তী কালে ভগবদানন্দে মধুময় হইয়া গিয়াছিল।

একদিন অদ্বৈতাশ্রমের জনৈক জ্বরাক্রান্ত ব্রহ্মচারীর কাপড় পাইখানায় যাইবার সময় নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই সময়ে মহাপুরুষজীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তিনি লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। মহাপুরুষজী তখনই সেই ব্রহ্মচারীকে সস্নেহে কলঘরে লইয়া গেলেন এবং নিজের হাতে তাঁহাকে ধোয়াইয়া ধীরে ধীরে বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন। কিছু পরে ব্রহ্মচারী নিজের কাপড়খানি পরিষ্কার করিবেন মনে করিয়া কলঘরের দিকে গিয়া দেখেন যে, মহাপুরুষজী নিজেই উহা পরিষ্কার করিতেছেন। তখন প্রাণের আবেগে ব্রহ্মচারী অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন, "আপনি কেন আমার ময়লা কাপড় ধুচ্ছেন?" মহাপুরুষজী সস্নেহে বলিলেন, "তাতে আর হয়েছে কি? তোর অসুখ করেছে—যা শুয়ে থাক্ গে।" ঘটনাটি বলিতে বলিতে সেই সাধুর এখনও চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠে।

মহাপুরুষজী কিছুকাল কাশীতে কাটাইয়া অল্পদিনের জন্য বেলুড় মঠে

আসিয়াছিলেন। কাশী হইতে ২৮।১১।১৪ তারিখে বেলুড় মঠের জনৈক ব্রহ্মচারীকে লিখিত পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—"আমার শরীর এখানে তত মন্দ নাই—বাবুরাম মহারাজও ভাল আছেন প্রভুর কৃপায়।...হরি মহারাজকে খুব সম্ভব আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। আমার বোধ হয় মিহিজামে কিছুদিন থাকিব এবং জামতাড়ায় জায়গাটার একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে হইবে।

"তুমি এবং তোমরা যারা প্রভুর আশ্রয়ে, তাঁর ভক্তদের আশ্রয়ে আসিয়াছ—নিশ্চয়ই আধ্যাত্মজগতে পূর্ণতালাভ করিবে। তোমাদের জন্য বাস্তবিক আমরা দায়ী—ইহা নিশ্চয়ই ধারণা রাখিও।"

এই চিঠিখানিতে মহাপুরুষজী যে দায়িত্বপূর্ণ কথাটি লিখিয়াছেন তাহা স্তোকবাক্য নহে—তাঁহার প্রাণের কথা। সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের সঙ্গে কতটা যুক্ততা আসিলে কেহ বলিতে পারেন, 'তোমাদের জন্য বাস্তবিক আমরা দায়ী'—তাহা বিশেষভাবে প্রাণিধানের বিষয়। বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী মহা অশান্তি ও নৈরাশ্য-ভারাক্রান্ত প্রাণে একদিন মহাপুরুজীকে অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এতদিন বৃথাই কেটে গেল, এখনও ভগবানলাভ হল না। এক এক সময় দারুণ অবিশ্বাস মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এতকাল আপনাদের যে-সব উপদেশবাক্য শুনেছি সে সবেও সন্দেহ এসে যায়।" শুনিয়া মহাপুরুষজীর সমগ্র মুখমণ্ডল উজ্জ্বল রক্তিমাভ হইয়া উঠিল; তিনি একটু উত্তেজিত হইয়া তেজের সহিত বলিলেন, "দেখ বাবা, ঠাকুর যদি সত্য হন্ তো আমরাও সত্য। যা বলছি, ঠিক ঠিক বল্‌ছি, আমরা লোক ঠকাতে আসি নি। যদি আমরা ডুবি তো তোমরাও ডুববে; কিন্তু তাঁর কৃপায় জেনেছি যে, আমরা ডুবব না, আর তোমরাও ডুববে না।"

আলমোড়ায়

বেলুড় মঠে অবস্থানকালে ১৯১৫ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি ও বিরাট উৎসবের পরে রাঁচির ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে ঠাকুরের উৎসব করিবার জন্য মহাপুরুষজী কয়েক দিনের জন্য তথায় গিয়া সকলকেই খুব আনন্দ দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কৃপাপ্রাপ্ত রাঁচির ঐ ভক্তবৃন্দের ভক্তি ও আন্তরিকতা তাঁহাকে খুবই মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার রাঁচিগমন সম্বন্ধে সেই সময়ে উপস্থিত রাঁচির জনৈক ভক্ত লিখিয়াছেন, "তিনি ৩।৪ দিন মাত্র এখানে ছিলেন। কিন্তু এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমাদের প্রাণে যে স্বর্গীয় আনন্দ দান করিয়াছিলেন তাহা আজ পর্যন্ত আমাদের জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে, সেই পুণ্যস্মৃতি আজিও চিত্তে পুলক আনিয়া দিতেছে। তিনি এখানে তিথিপূজার দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন। পূজায় মন্ত্রোচ্চারণের আড়ম্বর ছিল না—পূজার আসনে বসিয়া অনেকক্ষণ গভীর ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন; পরে অতি যতনে দুটি অর্ঘ্য সাজাইয়া একটি ঠাকুরের ও অপরটি শ্রীশ্রীমার চরণে অর্পণ করিলেন। তার পরেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম! কিন্তু যখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলাম চোখ দুটি আরক্তিম হইয়া গিয়াছে—মুখমণ্ডলে অপূর্ব দিব্যশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে! এই সময়ে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী অগ্রসর হইয়া মহারাজকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি চান?' বৃদ্ধা কাতরকণ্ঠে বলিলেন, 'মুক্তি।' উত্তরে বলিলেন, 'আচ্ছা, হবে। আমি ঠাকুরকে বল্‌ব।' কণ্ঠস্বর গম্ভীর, কিন্তু কী করুণামাখা!

"উৎসবের দিন পূজা ও ভোগরাগাদির পর দরিদ্রনারায়ণসেবা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেই সময় আমরা

সকলে ঝড়ের প্রবল গতির সঙ্গে সমানতালে উদ্দাম নৃত্যসহ স্বামিজী-রচিত 'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা' গানটি গাহিতে থাকি। মহাপুরুষজীও ভাবস্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং পরে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা গাইছিলে—আমার মনে হচ্ছিল যেন জার্মান শেল পড়ছে (তখন জার্মানযুদ্ধ হচ্ছিল)। তোমাদের সঙ্গে আমিও নাচি।'

"উৎসবের পরদিন তিনি আমাদিগকে লইয়া নিকটস্থ প্রান্তরে এক আম্রবৃক্ষের নীচে উপবেশন করিয়া সকলকে নানা উপদেশ দান করেন এবং একটি ভজন-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। দোলপূর্ণিমার দিন তপোবনে গমন করিয়া খুব ভাবস্থ হইয়া রাম-সীতা ও জগন্নাথদেবের দর্শন করেন এবং শ্রীমূর্তির সম্মুখে হাতে করতাল লইয়া, 'রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়' গানটি এমন মধুরভাবে কীর্তন করিয়াছিলেন যে, আজও তাহা আমাদের কানে লাগিয়া রহিয়াছে—আর সে কি তন্ময়তা! পরে মহাপুরুষজী ঠাকুর ও মা'র কথা খুব ভাবের সহিত বলিতেছিলেন। আমাদের মধ্যে জনৈক ভক্ত খুবই দুঃখ করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরের নামই তো শুন্‌ছি, তাঁকে দেখ্‌বার সৌভাগ্য তো আমাদের হ'ল না, মহারাজ!' তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'সে কি! He who hath seen the Son, hath seen the Father. I and my Father are one. (যাহারা ভগবানের পুত্রকে দেখিয়াছে, তাহারা ভগবৎপিতাকেও দর্শন করিয়াছে। আমি এবং আমার পিতা একই)।' উত্তর শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর এখনও কানে ধ্বনিত হইতেছে।"

রাঁচি হইতে মঠ হইয়া মহাপুরুষজী আলমোড়ায় আসিলেন, সঙ্গে হরি মহারাজ। ২৮।৭।১৫ তারিখে রাঁচির জনৈক ভক্তকে যে চিঠি লিখিয়া-

ছিলেন, তাহাতে ঐ ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহার কতটা নিবিড় সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়—"কি জানি, প্রভুর ইচ্ছায় যতদিন তোমাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে ততদিন হইতেই তোমাদের বড়ই আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। তোমরা শ্রীশ্রীমার দয়া পাইয়াছ—ইহাই মূল কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই তাঁর কৃপায় তোমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অচলা ভক্তি লাভ করিয়াছ এবং তাঁর পার্ষদরা তোমাদের বড়ই ভালবাসেন। আমার এইরূপ ধারণা হইয়া গিয়াছে যে তোমরা বড়ই আপনার লোক। সবই শ্রীশ্রীমায়ের খেলা।

"শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা তোমাদের উপর সর্বদা বর্তমান এবং সেই জন্যই আমারও তোমাদের সঙ্গে এত ভাব। তোমরা যে গাছের গোড়ায় জল দিচ্ছ, কাজেই শাখাপ্রশাখায় তাহা পৌঁছিবে।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ দীর্ঘকাল যাবৎ বহুমূত্ররোগে ভুগিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য ও সাতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য মহাপুরুষজী খুবই উদ্বিগ্ন হইলেন। কোন স্বাস্থ্যকর শীতল স্থানে বায়ু-পরিবর্তনে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে ভাবিয়াই মহাপুরুষজী তাঁহাকে আলমোড়ায় সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। ঐ সময় প্রিয় গুরুভ্রাতাকে সুস্থ করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা ও যত্নের অন্ত ছিল না। তিনি নিজেই অনেক সময় বাজার হইতে হরি মহারাজের জন্য সুপথ্যাদি লইয়া আসিতেন এবং সেবককে তাহা প্রস্তুত করিবার যথাযথ নির্দেশ দিতেন।

বহুবৎসর পূর্বে স্বামিজী মহাপুরুষজীকে হিমালয়ে একটি আশ্রম-স্থাপনের জন্য বলিয়াছিলেন। এইবার হরি মহারাজকে সঙ্গে লইয়া আলমোড়ায় আসিবার পরেই মহাপুরুষজীর প্রাণে স্বামিজীর আদেশকে

কার্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল এবং ধীরে ধীরে তিনি ঐ কার্যে ব্রতী হইলেন। ১৮৮৯ সাল হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত মহাপুরুষজী বহুবার আলমোড়ায় আসিয়াছিলেন এবং অনেক সময় তথায় দীর্ঘদিন তপস্যায় কাটাইয়াছিলেন—সেই সূত্রে আলমোড়া ও পার্শ্ববর্তী বহু স্থানের লোক তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। বদ্রী সা, মোহনলাল সা প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোক তাঁহার সাহচর্য ও ধর্মজীবনের স্পর্শে আসিয়া প্রভূত আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রমস্থাপনের প্রস্তাবে স্থানীয় ভক্তগণের অত্যন্ত উৎসাহ হইল। সকলের সমবেত চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই আশ্রমের জন্য জমি সংগৃহীত হইল এবং আশ্রমস্থাপনের কাজও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্বামী তুরীয়ানন্দও ক্রমে পূর্বাপেক্ষা সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

ঐ বৎসর পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে এবং বাঁকুড়া জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষে বহুলোক অকালে প্রাণ হারাইতেছিল। রামকৃষ্ণ মিশন ঐ সকল স্থানে সেবক প্রেরণ করিয়া যথাসাধ্য সেবাকার্য চালাইতেছিলেন; কিন্তু ঐ ব্যাপক দুঃখ, দারিদ্র্য ও অভাবের বিরুদ্ধে অর্থাভাববশতঃ মিশনের সেবকগণ বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। দেশময় ঐ হাহাকার ও আর্তনাদের খবরাদি বেলুড় মঠ ও খবরের কাগজ প্রভৃতি হইতে জানিতে পারিয়া মহাপুরুষজীর হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। তখনকার একটি চিঠিতে তিনি লিখিতেছেন, "দেশের বড়ই দুরবস্থা। অন্নাভাবে লোক দেহত্যাগ করিতেছে—কি সর্বনাশ! প্রভু দয়া করিয়া এ কষ্ট নিবারণ করুন—ইহাই আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা তাঁর চরণে।...তোমায় একখানি কাপড় পাঠাইতেছি। তোমার পরিধেয় বস্ত্র নাই শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইয়াছে—আমার একখানি অধিক কাপড় আছে।"

অন্য চিঠিতে আছে—"কি আর লিখিয়া জানাইব! প্রাণের কথা প্রাণেশ্বরই জানেন। জীবের মঙ্গল, সর্বপ্রকারে মঙ্গলচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা মনে আসেই না। অধিক কি লিখিব—প্রভু এই সব জানেন।... প্রভু জগতে আসিয়াছেন, যেরূপেই হউক জগতের কল্যাণ হইবেই হইবে—নিশ্চয় জানিও।"

এই সময়ে তাঁহার বিশাল হৃদয় জীবদুঃখে যে কি পরিমাণ কাঁদিতেছিল তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৮।১০।১৫ তারিখে আলমোড়া হইতে লিখিত চিঠিতে—"আমাদের এখানকার ধ্যানভজন প্রভুর কৃপায় কেবল জগতের, জীবের কল্যাণকামনা ছাড়া আর কিছুই বা কোন রকমই নাই। প্রভুর নাম বা ধ্যান করিতে বসিলেই কেবল 'প্রভু! জগতের কল্যাণ করুন, আপনি করুণার অবতার'—এই ভাবনাই আসে। বাবা, এই আমার এখনকার ধ্যান-জ্ঞান।"

যে একাত্মবোধ শ্রীরামকৃষ্ণকে গঙ্গাবক্ষে কলহরত নৌকার মাঝিদের পরস্পরের প্রহারের বেদনা অনুভব করাইয়াছিল বা ফুল তুলিবার সময় ফুল-গাছের সামান্য ছাল ছিঁড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার প্রাণে পীড়া দিয়াছিল, যে বিশ্ব-অনুকম্পায় দ্রবহৃদয় হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "একটি প্রাণীর মুক্তির জন্য যদি লক্ষ জন্মও নিতে হয় তাতেও প্রস্তুত"—সেই সর্বাত্মবোধই যেন শিবানন্দেরও প্রাণে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তী জীবনে ঐভাব জীবকল্যাণরূপে কত ব্যাপক ও বিশালভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, প্রতিদিন প্রতিকাজে কতভাবে যে জীবের সর্ববিধ দুঃখমোচনের জন্য তিনি সদা ব্যগ্র থাকিতেন—তাহার নিদর্শন আমরা পরে পরে দেখিতে পাইব।

শ্রীভগবানই 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ

প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্'—এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত শিবানন্দের 'জগদ্ধিতায়' কার্যের ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তিনি মাতৃগতপ্রাণ শিশুর ন্যায় জগজ্জননীর নিকট জগতের দুঃখনিবারণের জন্য আকুল ক্রন্দন করিতেন। সন্তান যেমন মায়ের নিকট আবদার করে, এমন কি জোর পর্যন্ত করিয়া থাকে, তেমনি ভাবে তিনিও তাঁহার 'পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা—সর্বস্বধন' শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট জীব-জগতের কল্যাণের জন্য জোর করিতেন। তাঁহার 'আমি'র স্থান বহুকাল পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ জুড়িয়া বসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীভগবানের উপর সর্ববিষয়ে নির্ভরশীল হইয়া শুদ্ধ ভক্তিভাব আশ্রয় করিয়া যতদিন স্থূলদেহে ছিলেন ততদিন নানাভাবে জীবকল্যাণে রত থাকিতেন। তৎকালে তিনি 'জনম-মরণের সাথী'র সঙ্গে কতটা ওতপ্রোত-ভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্তরের ভক্তটির ভাব কি প্রকার, তাহা সুন্দররূপে পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায় একখানি চিঠিতে—"সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হইবে, কি না হইবে—এ সকল ভাবনা অজ্ঞান হইতে হয়। ভক্তেরা ওরূপ চিন্তা করে না। যারা প্রভুপদে জীবন অর্পণ করিয়াছে—তারা প্রভুর ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ফিরে আসা-না-আসা সব তিনিই জানেন। যাওয়াও তাঁর কাছে, থাকাও তাঁর কাছে। ফিরে যদি আসতে হয় সেও তাঁর সঙ্গে। তিনি জীবনে-মরণে সাথী।"

শ্রীভগবানের আধুনিক প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ, যুগপ্রয়োজন-সাধনের জন্য যুগাবতারের অন্তরঙ্গরূপে তিনিও জগতে আসিয়াছেন এবং সে মহদ্ধর্ম-প্রচারে তাঁহারও যে কর্তব্য আছে ইত্যাদি বিষয়ে তিনি পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার কথা-বার্তা ও চিঠিপত্রাদিতে ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়—"প্রভুর শরীরধারণ কেবল জীবকে ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান দিবার জন্য। তিনি যুগা-

বতার—এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁতে বিশ্বাস, ভক্তির জন্য প্রার্থনা করিলেই হৃদয়ে শান্তি ও আশা পাইবে। আমার এই কথা ধারণা করিবে —আমি তাঁর পদাশ্রিত দাস, আমি তাঁর ইচ্ছায় তোমায় এইরূপ উপদেশ দিতেছি—এই বিশ্বাস করিবে।...শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ লইলে তার পরিত্রাণের ভাবনা নাই, নিশ্চয় জানিবে।

"প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবের হিতের জন্য সাঙ্গোপাঙ্গসহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। তুমি এই আধারকে যতই ভালবাসিবে তাহা প্রভুতেই পৌছিবে এবং ইঁহার প্রতি ভালবাসাও তাঁহার কাছে পাইবে।

"এই পর্যন্ত জানিয়া রাখ যে তিনি আমাকে সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন—আর অধিক জানিবার দরকার নাই।"

আলমোড়ায় অবস্থানসময়ে ধ্যানজপের পরে সকালবেলা মহাপুরুষজী ও হরি মহারাজ দুইজনেই এক সঙ্গে বসিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গাদি করিতেন। একদিন সকালবেলা হরি মহারাজ ধ্যানান্তে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া চুপচাপ বসিয়া আছেন। খানিকপরে মহাপুরুষজীও ধ্যান করিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁর মুখচোখে এক প্রশান্ত আনন্দের দীপ্তি। হরি মহারাজও অবাক হইয়া মহাপুরুষজীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে ভক্তি-ভক্তের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। অতঃপর মহাপুরুষজী খুব তন্ময়ভাবে গাহিয়াছিলেন—

"আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া-গঙ্গা-বারাণসী॥" ইত্যাদি

---

১ এই ঘটনাটি স্বামী রাঘবানন্দের নিকট প্রাপ্ত। মহাপুরুষজী ও হরি মহারাজ যখন আলমোড়াতে অবস্থান করিতেছিলেন, রাঘবানন্দও তখন আলমোড়ায় ছিলেন এবং ঐ সময়কার অনেক ঘটনা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

গানের শেষে "ওরে, চতুর্বর্গ করতলে, ভাবিলে যে এলোকেশী" এই অংশ তিনি মত্ত হইয়া বারংবার গাহিতে লাগিলেন। সে কী তন্ময়তা!

ঐ সময়ে আলমোড়াতে মহাপুরুষজী খুবই ব্যস্ত থাকিতেন। নিজ ভজন-সাধনের অবসরসময়ে সমবেত ভক্তগণের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ ও শাস্ত্রালোচনাদি, নূতন আশ্রমের আয়োজন এবং হরি মহারাজের স্বাস্থ্যোন্নতির সর্ববিধ ব্যবস্থা করা তাঁহার নিত্যকর্ম ছিল। হরি মহারাজ ক্রমে সুস্থ বোধ করিতেছিলেন, ইহাতেই তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ ও তৃপ্তি। স্থানীয় ভক্তগণ ক্রমে হরি মহারাজের ভাগবত জীবনের স্পর্শে আসিয়া মুগ্ধ হইলেন; তিনিও ভক্তগণের সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রায় ৭।৮ মাস কাটিয়া গেল। ঐ বৎসর কাশী অদ্বৈতাশ্রমে প্রতিমায় ৺শ্যামাপূজার আয়োজন হইতেছিল। আশ্রমবাসী ও কাশীর ভক্তগণ মহাপুরুষজীকে ঐ পূজার আনন্দে যোগদান করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছিলেন; সকলের বিশেষ অনুরোধে তিনি ৺কালীপূজার ঠিক পূর্বদিন (৫।১১।১৫) সন্ধ্যায় কাশীতে পৌঁছিলেন; হরি মহারাজ আলমোড়াতেই রহিয়া গেলেন। মহাপুরুষজীর আগমনে সকলের প্রাণে পূজার আনন্দ বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। 'পূজা খুব সাত্ত্বিকভাবে মহানন্দে সুচারুরূপে' সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু কাশীতে[১] আসিয়াই

---

১ ঐ সময়ে কলিকাতা হইতে জনৈক ভক্ত মহাপুরুষজীর পূতসঙ্গলাভমানসে কাশী যাইবার মনস্থ করিয়া বেলুড় মঠে ঠাকুর দর্শন করিতে আসেন। বাবুরাম মহারাজকে তাঁহার কাশী যাইবার সংকল্পের কথা জানাইতে তিনি আবেগভরে বলিয়াছিলেন "তুমি কাশী যাচ্ছ, তারকদাকে আমার প্রেমালিঙ্গন জানিয়ে বলো, হয় তিনি মঠে আসুন, নয় তো আমাকেই তাঁর কাছে টেনে নিয়ে যান। দূরে দূরে থাকা আর সইতে পাচ্ছি নে।"

তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কয়েকমাস সমতল ভূমিতে কাটাইয়া পুনরায় তাঁহার আলমোড়া যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার সুদীর্ঘ বৎসরের তপস্যা-স্মৃতি-জড়িত প্রিয় স্থান আলমোড়ায় আর যাওয়া হয় নাই। ২৭।১২।১৫ তারিখে স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—"আমি মঠে বোধ হয় জানুয়ারী মাসের প্রথমে যাইব। মহারাজ জরুরী চিঠি লিখিয়াছিলেন—আমিও বলেছি, ক্রমে ক্রমে যাচ্ছি।"

মঠ-পরিচালনায়

কাশীতে স্বামিজীর জন্মোৎসব পর্যন্ত কাটাইয়া মহাপুরুষজী প্রয়াগ হইয়া বেলুড় মঠে আসেন ৬।১।১৬ তারিখে। তিনি পথে একবেলা মিহিজামে কাটাইয়াছিলেন। ঐ বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে সমবেত বহু সাধু ও ভক্তের সহিত অনেক দিন পরে দেখাশুনা হওয়ায় তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। উৎসবের কিছুদিন পরেই ভক্তগণ-কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাকে বাবুরাম মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব করিবার জন্য মিহিজামে যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার একখানি চিঠিতে ঐ উৎসব উপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণ-সেবার চমৎকার বর্ণনা রহিয়াছে—"একজন প্রভুর ভক্ত মিহিজামে পরি-বর্তনের জন্য গিয়াছেন। তাঁদের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে সেখানকার সাঁওতালদের ভোজন দিয়া সেবা করেন, তাই সেই উপলক্ষে আমাদের লইয়া যান এবং প্রায় আটশত গরীব সাঁওতাল-নারায়ণকে খিচুড়ী, আলুর দম, আলু-কুমড়ার একটি তরকারী, রাঙ্গা আলুর চাটনি, দধি ও বুঁদে দ্বারা সেবা করা হয় এবং ভোজনান্তে সকলকে পরিতোষ করিয়া তেল মাথান হয় (উহাতে তাহারা ভারী খুসী), আর ২।১ পাতা দোক্তা তামাক দেওয়া হয়। তাতে তারা আরও খুসী—অতি সরল লোক তারা। যা হোক, আমাদের খুব আনন্দ হইয়াছিল। তাদের ওরূপ করিয়া কেহই কখনও খাওয়ায় নাই—তারা বড়ই খুসী হইয়াছিল প্রভুর ইচ্ছায়।"

মঠ-পরিচালনায়

স্বামী প্রেমানন্দ দীর্ঘকাল একাই মঠের যাবতীয় কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। এদিকে মঠ ও মিশনের কাজ এবং মঠে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণের সংখ্যা ও ভক্তসমাগম দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল—বাবুরাম মহারাজের একার পক্ষে সব দিক দেখাশুনা করা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিল, তাহা ছাড়া তাঁহার স্বাস্থ্যও ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তিনি উদরাময়-রোগে ভুগিতেছিলেন এবং চিকিৎসাদির জন্য অনেক সময় তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইতেছিল। অথচ শরীরবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হইয়া তিনি শ্রীগুরুমহারাজের ভাবপ্রচারে মত্ত থাকিতেন। সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও তাঁহাকে বাংলার নানাস্থানে উৎসবাদিতে যোগদান করিতে যাইতে হইত। এখন মহাপুরুষজীকে কাছে পাইয়া এই সকল কাজে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে মঠে রাখিবার ইচ্ছা বাবুরাম মহারাজের প্রবল হইল। মিহিজাম হইতে ফিরিয়া মহাপুরুষজী মঠেই রহিলেন এবং মঠের কাজকর্ম দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। মাঝে কার্যোপলক্ষে একমাসের জন্য তাঁহাকে দার্জিলিং যাইতে হইয়াছিল।

সেই বৎসর মঠে মহাসমারোহে প্রতিমায় মহামায়ার আরাধনা হয়। মহাপুরুষজী এই প্রথম মঠে ৺দুর্গাপূজায় যোগদান করিতে পারিয়া খুবই আনন্দ পাইয়াছিলেন। পূজার সময় অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে বাবুরাম মহারাজ আরও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন পরে কাশী সেবাশ্রম-কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া হাসপাতালের নূতন বাড়ীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবার জন্য মহাপুরুষজী বাবুরাম মহারাজকে সঙ্গে লইয়া কাশী যান। কাশী হইতে লিখিত তাঁহার ৮।১১।১৬ তারিখের পত্রে জানা যায়—"আমি ও প্রেমানন্দ স্বামী গত শনিবার মিহিজাম আসি, পরে রবিবার আবার যাত্রা করিয়া সোমবার এখানে আসিয়াছি। এখানে

সেবাশ্রমের নূতন জমির উপর পাঁচটি নূতন গৃহ নির্মিত হইয়াছে, তাহারই গৃহপ্রবেশ-উপলক্ষে যাগযজ্ঞাদি হইয়াছিল গতকল্য। সেই জন্যই আমাদের এখানে আসা।"

মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণায় ভুগিতেছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে বায়ুপরিবর্তনের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে এক ভক্তের বাড়ীতে পাঠান হইয়াছিল। কাশী হইতে ৩০।১১।১৬ তারিখে মহাপুরুষজী ভক্তগৃহে অবস্থিত সেই পীড়িত ব্রহ্মচারীকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন উহা খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—"তুমি খুব সাবধানে প্রভুর স্মরণ-মনন করিয়া থাকিবে। ত্যাগীদের পক্ষে গৃহী ভক্তদের বাড়ীতে থাকা বড়ই কঠিন। যেরূপ লিখিতেছি ঠিক সেইরূপ থাকিবে। মেয়েদের স্তোত্রাদি শিখাইবার তোমার আবশ্যক নাই এবং তাদের সহিত মিশিবারও দরকার নাই। তুমি যথা-সম্ভব পাঠাদি ও ধ্যানজপাদি লইয়া থাকিবে এবং কোন ভক্তের সঙ্গে দেখা হইলে কথনও কথনও সৎচর্চা করিবে।"

বায়ুপরিবর্তনের ফলে কাশীতে স্বামী প্রেমানন্দের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে[১] স্বামী তুরীয়ানন্দও কাশীতে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। আলমোড়ায় তাঁহার বহুমূত্ররোগের বিশেষ উপকার হইতেছিল না বলিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে নামিয়া আসিতে হইয়াছিল। স্বামিজীর জন্মতিথি আগতপ্রায় দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। হরি মহারাজ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন ভাবিয়া মহাপুরুষজী আরও কিছুকাল

---

১ কাশী অদ্বৈতাশ্রম হইতে ২১।১২।১৬ তারিখে লিখিত মহাপুরুষজীর চিঠিতে আছে—"হরি মহারাজ আলমোড়া হইতে আসিয়াছেন। আসিয়া অবধি সর্দিতে ভুগিতেছেন। তিনি একটু আরাম হইলে আমরা সকলে মঠে যাইব।"

কাশীতে রহিয়া গেলেন। তাঁহারা উভয়ে মিহিজাম হইয়া ঠাকুরের জন্মতিথির কয়েকদিন পূর্বে মঠে ফিরিয়াছিলেন। উহা ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

ইতঃপূর্বেই স্বামী ব্রহ্মানন্দও দক্ষিণভারত হইতে মহাপুরুষজীকে বেলুড় মঠে থাকিয়া মঠের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূর্ব অনুরোধ অনুযায়ী এখন হইতে মঠের কাজকর্ম দেখাশুনা করিবার ভার অধিকাংশই মহাপুরুষজী গ্রহণ করিলেন; তাহাতে বাবুরাম মহারাজের প্রচুর সহায়তা হইতে লাগিল। মহাপুরুষজীর জীবনের যেন একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল, যিনি প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল অনেক সময়েই প্রব্রজ্যা ও নির্জনবাসে কাটাইয়াছিলেন—কোন প্রকার গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজে জড়িত হইতে যেন দ্বিধা বোধ করিতেন, এইবার তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে ঠাকুরের কাজে ষোল-আনা আত্মনিয়োগ করিলেন। এখন হইতে দীর্ঘ সতের বৎসর তিনি তীর্থভ্রমণ বা নির্জনবাস ভুলিয়া গিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় প্রভুর দ্বারে বেলুড় মঠে পড়িয়া রহিলেন; ঠাকুরের কার্য-উপলক্ষ ছাড়া তিনি আর কোথাও যান নাই। অনেক বৎসর পূর্বে স্বামিজী শিবানন্দকে নির্জনবাস হইতে বিরত করিয়া কর্মে প্রবর্তিত করিবার জন্য একদিন সপ্রেমে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন—"তারকদা, আপনাকে তপস্যায় যেতে দেব না।" কিন্তু শিবানন্দের মনের অবস্থা এমনই ছিল যে, তিনি স্বামিজীর ঐ অনুরোধ তখন রক্ষা করিতে পারেন নাই।

জনৈক সন্ন্যাসী একদিন তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মহাপুরুষজী স্মিতমুখে বলিয়াছিলেন, "সে-সব পুরনো খবর শুনে

আর কি হবে? এক সময় খুব করা গেছে। এখন তো ঠাকুর আমাদের এ কর্মবৃত্তান্তে টেনে এনেছেন। তাঁর যুগধর্মপ্রচারের জন্য এইরূপই প্রয়োজন হয়েছে। তাই এখন এই বুড়ো বয়সে আমাদের দ্বারাও ঠাকুর তাঁর কাজ কিছু কিছু করিয়ে নিচ্ছেন। আমরা তো ভেবেছিলাম যে, তপস্যা করে জীবন কাটিয়ে দেব—করেছিলামও তাই; কিন্তু ঠাকুর তা করতে দিলেন কোথায়?"

ঐ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসবের কয়েক দিন পরেই পূর্ববঙ্গের ভক্তগণকর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামী প্রেমানন্দ ঐ অঞ্চলে গমন করেন। তিনি প্রায় তিন মাসকাল পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে উৎসব, বক্তৃতা ও সৎপ্রসঙ্গাদি দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবপ্রচার-কালে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনিয়মের ফলে জ্বরাক্রান্ত হইয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন। অসুখ ক্রমেই কঠিনাকার ধারণ করিল। চিকিৎসকগণ উহা কালাজ্বর বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। বাবুরাম মহারাজের অসুখের জন্য মহাপুরুষজী খুবই চিন্তিত ও ভগ্নপ্রাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সুচিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার ফলে স্বামী প্রেমানন্দ ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে চলিলেন এবং দেড়মাস পরে অন্নপথ্য পাইয়া উদ্বোধন কার্যালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই-তিন মাস সামান্য সুস্থ থাকিয়া তিনি পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা এবং অন্যান্য উপসর্গও বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে পুনরায় শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ দক্ষিণভারতের শাখাকেন্দ্রসমূহ এবং নানাস্থান-পরিদর্শনান্তে সেই সময় ৺পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। মঠে স্বামী তুরীয়ানন্দের বহুমূত্ররোগের কিছুতেই উপশম হইতেছিল না; সমুদ্রের হাওয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর হইতে পারে মনে করিয়া তিনি

মঠ-পরিচালনায়

১৯১৭ সালের জুন মাসের প্রথম ভাগে রাখাল মহারাজের নিকট পুরী গমন করিলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁহার রোগের উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ সময়ে খোকা মহারাজও খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বনগ্রামে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়াই জ্বরাক্রান্ত হন—জ্বর ১০৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। হরি মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ এবং খোকা মহারাজ—একসঙ্গে তিনজনের কঠিন অসুখের জন্য মহাপুরুষজীকে সেই সময় ভীষণ উদ্বিগ্নপ্রাণে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া মঠের কাজকর্ম চালাইতে হইয়াছিল। মঠের স্বাস্থ্যও তখন খুব খারাপ—অনেকেই জ্বরে ভুগিতেছিল।

কয়েক দিন পরে রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজ পুরী হইতে হরি মহারাজকে এক প্রকার মুমূর্ষু অবস্থায় কলিকাতায় উদ্বোধনে লইয়া আসিলেন। এই সময়ে বাবুরাম মহারাজের পূর্ব্বেকার অসুখও পুনরায় বাড়িয়া দিনে দুইবার করিয়া জ্বর হইতেছিল। অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন বলরামবাবুর বাড়ীতে রহিয়াছেন। কলিকাতায় স্বাস্থ্যোন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসকগণের পরামর্শে (১৯১৮ সালে) মার্চ মাসের মাঝামাঝি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি বৈদ্যনাথ গমন করেন।

মহাপুরুষজী হরি মহারাজকে দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে উদ্বোধনে যাইতেন। এদিকে বৈদ্যনাথেও স্বামী প্রেমানন্দের রোগের উপশম হইতেছিল না বলিয়া তাঁহার চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা করিবার জন্য মহাপুরুষজী নিজে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বৈদ্যনাথে গেলেও এবং ওখানে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির কোনই আশা নাই দেখিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দ্দেশে তাঁহাকে কিছুদিন পরে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। দেওঘরে শেষটায় বাবুরাম মহারাজ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন এবং উহা ক্রমে

নিউমোনিয়াতে পরিণত হয়। দেড় বৎসর যাবৎ তিনি ক্রমাগত কঠিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। এখন দুর্বল শরীর সে প্রবল ব্যাধির প্রকোপ সহ্য করিতে পারিল না। কলিকাতায় বলরামবাবুর বাড়ীতে আসার চতুর্থ দিবসে ৩০শে জুলাই (১৯১৮) তিনি নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে মিলিত হইলেন।

বাবুরাম মহারাজের দেহত্যাগে সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। মহাপুরুষজী তাঁহার নিজের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, "বাবুরাম মহারাজ চলে যেতে মনের ভেতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। অনেক সময় মনে হত, চলে যাই হিমালয়ে— সগুণ অবস্থাতে আর থাকব না—ঠাকুরের নির্গুণ ভাব আশ্রয় করে সমাধিস্থ হয়ে থাকব।" কিন্তু সমুহ কর্তব্যের অনুরোধে তিনি হৃদয়ের শোকাবেগ দমন করিয়া ধীরে ধীরে মঠের কাজে মনোনিবেশ করিলেন এবং সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দকে সান্ত্বনা দিয়া শ্রীপ্রভুর কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন।

স্বামী প্রেমানন্দের সহিত মহাপুরুষজীর সম্বন্ধ কত নিবিড় ও মাধুর্যময় ছিল, তাহা আলমোড়া হইতে লিখিত তাঁহার নিম্নের দুইখানি পত্র হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

আলমোড়া হইতে ১৯।৯।১৫ তারিখে লিখিত চিঠিতে মহাপুরুষজী বাবুরাম মহারাজকে লিখিতেছেন—

"প্রিয়তম বাবুরাম মহারাজ (প্রেমানন্দ),

প্রেমের ধারা কি এদিকে এখন বন্ধ হয়ে গেল? এ উচ্চ হিমালয়ে কি প্রেমানন্দের প্রেমধারা উঠতে পাচ্ছে না? তবে গঙ্গা আদি সমস্ত নদী এই কঠিন প্রস্তরময় উচ্চ হিমালয় হইতে নামিতেছেন; সুতরাং আমরা

তাঁহাদের ভক্ত হয়ে কি করে আর এতদিন চুপ করে থাকতে পারি? তাই আজ চিঠি না লিখে থাকতে পারলুম না। মনে করেছিলাম ৺পুরীধাম থেকে তুমি ফিরেছ—এবার চিঠি পাব ; তাও তো এতদিন হয়ে গেল! যা হোক, শারীরিক কেমন আছ? তুমি মঠ থেকে চলে যাবার পর আর মঠে কোন চিঠিপত্র পাই নাই। ইতি। দাস—তারক।"

মহাপুরুষজীর চিঠি পাইয়া বাবুরাম মহারাজ যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহারই উত্তরে তিনি পুনরায় লিখিতেছেন (আলমোড়া, ১২।১০।১৫)—

"প্রিয়তম বাবুরাম মহারাজ,

তোমার সুদীর্ঘ পত্রে সবিস্তার সংবাদ পেয়ে বড়ই কৃতার্থ হইয়াছি। ইহাই তোমার দয়া ও প্রেমের পরিচায়ক। অনেকদিন এরূপ পত্র তোমার কাছ থেকে না পেলে মনটা শুকিয়ে যায়। ঠাকুরের কৃপার কাছে গণ্ডি-ফণ্ডি, বেড়া-ট্যাড়া সব ভেঙ্গে যায়। তাঁর কৃপাবারির বেগ অতি প্রবল। নীচের ধারাও উপরে ঠেলে ওঠে। এখন যে pumping system (জলপাম্পের কলকব্জা) চলেছে, তাহা স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করেছে। বিজ্ঞান ও স্বভাবের সহিত সংগ্রাম চলেছে। তোমাদের প্রেমবারি এ পাহাড়—অতি দুর্গম দুরূহ অবিদ্যার পর্বতকে উল্লঙ্ঘন করে জীবকে ধন্য করে। ইতি। দাস—তারক।"

স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের অদর্শনের পর মঠে গেলে কে আর তেমন ভালবাসিয়া কথা বলিবে, কে আর আমাদের যত্নাদি করিবে—ইহা ভাবিয়া অনেক ভক্ত মঠে আসা বন্ধ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষজীও তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। একদল যুবকভক্ত—সকলেই কলেজের ছাত্র—নিয়মিত-ভাবে বাবুরাম মহারাজের কাছে আসা-যাওয়া করিত। তিনিও

তাহাদিগকে খুব ভালবাসিয়া যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে শ্রীপ্রভুর চরণে জীবনোৎসর্গ করিয়া তাঁহার ত্যাগের পতাকা বহন করিবার যোগ্য হইতে পারে, সেইভাবে তাহাদিগের ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেন। মহাপুরুষজী লক্ষ্য করিলেন যে সেই যুবকগণও মঠে আসা বন্ধ করিয়াছে। ৩।৪ মাস পরে তাহারা একদিন সন্ধ্যাবেলায় মঠে আসিয়া ঠাকুরঘরে আরতিদর্শনানন্তর কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় মহাপুরুষজী তাহাদের নিকট আসিয়া খুব আবেগভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আজকাল আর মঠে আস না কেন? তা আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা কেন আসা বন্ধ করেছ। তোমরা আগে যেমন মঠে আসতে এখনও তেমনি এসো। জেনো, বাবুরাম মহারাজ তোমাদের যেমন ভালবাসতেন, আমিও তোমাদের তেমনি ভালবাসি।" এমন প্রাণস্পর্শী ভাবে মহাপুরুষজী সে কথাগুলি বলিলেন যে, উহা যুবক-ভক্তগণের হৃদয়কে আলোড়িত করিল। তাহারা ভাবিতেই পারে নাই যে, মহাপুরুষজীর অমন গম্ভীর প্রকৃতির অন্তরালে এতটা কোমল স্নেহপ্রবণতা থাকিতে পারে। সেই সময় হইতে তাহারা পূর্বের ন্যায় মঠে যাতায়াত করিতে লাগিল এবং মহাপুরুষজীর স্নেহ-পীযূষে বর্ধিত হইয়া পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহাদের জীবন ধন্য করিয়াছিল।

এই সময়ে মহাপুরুষজীর দৈনন্দিন জীবনটি সকল দিক দিয়াই বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ ছিল। তিনি বলিতেন এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন যে, বেলুড় মঠই যুগাবতারের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎপত্তিকেন্দ্র; ঐ স্থান হইতেই আধ্যাত্মিক শক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র সংঘকে এবং সংঘের ভিতর দিয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিবে। বেলুড়মঠ-জীবনকে আদর্শ

করিয়াই শাখাকেন্দ্রের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ নিজেদের ধর্মজীবন গঠিত করিবে, আর দেশদেশান্তরের অগণিত ভক্তগণও ধর্মজীবনের অনুপ্রাণনা পাইবে বেলুড় মঠ হইতেই। সেইজন্য মহাপুরুষজী প্রথম হইতেই মঠে পূজাপাঠ, ধ্যানভজন ও স্বাধ্যায়ের দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। ঠাকুরের সেবাপূজা ও ভোগরাগাদির প্রতি তাঁহার খুব লক্ষ্য ছিল, কখনও কখনও নিজে পূজা করিতেন।

ব্রাহ্মমুহূর্তে ঠাকুরঘর-খোলার সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহাকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখা যাইত। এমনও হইয়াছে যে, পূজারী একটু দেরী করিয়া ঠাকুরঘর খুলিতে আসিয়াছেন, কিন্তু মহাপুরুষজী তাঁহার মৃগচর্মের আসনখানি বগলে করিয়া মন্দিরদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। বার মাস সমানভাবে তিনি উহা করিয়া যাইতেন। ঠাকুরঘরের ভিতর এককোণে বসিয়া তিনি প্রায় বেলা ৭টা পর্য্যন্ত ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। ঠাকুরঘর হইতে নিজের প্রকোষ্ঠে আসিলে মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীরা একে একে তথায় সমবেত হইতেন। তিনিও সাধনভজন অথবা অন্য কোন ভগবৎ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া সকলের মন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে তুলিয়া দিতেন। তাহা ছাড়া প্রত্যেকের সবরকম খোঁজ-খবর লইতে তিনি খুব আনন্দ অনুভব করিতেন। গোসেবা, ফলফুল ও তরিতরকারীর বাগান, মঠের ও পাড়া-প্রতিবাসীদের স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার ছিল সমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সকালবেলা তাঁহার ঘরে মঠবাসীদের ঐ সম্মিলনটি সকল দিক দিয়াই খুব উপভোগ্য ছিল। উহাতে একদিকে যেমন উচ্চ ধর্ম-প্রসঙ্গাদি হইত, অন্যদিকে তেমনি পরস্পরের মধ্যে ভাবের বিনিময়, মেলামেশা, ঠাকুরের সংসারের নানা কথাবার্তা, বিভিন্ন কেন্দ্রের সাধুদের খবরাখবর নেওয়া প্রভৃতিতে বেশ মনে হইত যে সকলেই ঠাকুরের বিরাট

পরিবারভুক্ত। পরে একটু বেলা হইলে মহাপুরুষজী বাহির হইতেন মঠের যাবতীয় কাজকর্মের তত্ত্বাবধানে। হাতে কিছু খাবার লইয়া[১] গোয়ালে যাইতেন গরুগুলি দেখিবার জন্য—বাগানে গিয়া নিজের হাতে ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু তরিতরকারী তুলিয়া আনিয়া কখনও বা নিজেই কুটিতে বসিতেন। মঠের মেথর, কুলি-মজুর—সকলের সঙ্গেই সুখদুঃখের কথাবার্তা এমনভাবে বলিতেন, যেন তিনিও তাহাদের একজন। আফিসে গিয়া মঠ ও মিশন-সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান, বিশেষ কাজ-কর্মে পরামর্শ ও উপদেশদান এবং সমাগত ভক্তগণকে আদর-আপ্যায়ন ইত্যাদিতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। তৎকালীন একটি ঘটনা হইতে মহাপুরুষজীর অন্তরের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। ডাক্তারখানার ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল তিনি বলেন, "তখন বর্ষাকাল। চারদিকেই অসুখ-বিসুখ—বিশেষকরে ম্যালেরিয়া। মঠের দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীর সংখ্যা খুবই বেড়েছে। এদিকে আমার সহকারী কম্পাউণ্ডারও অসুস্থ। আমি একা সব কাজ করে উঠতে পাচ্ছিলাম না; মহাপুরুষজী এসে বললেন, 'য—, তোমার একার পক্ষে বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি একটু help (সাহায্য) করব?' আমি বললাম, 'সে কি মহারাজ! আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে চালাতে পারি একলাই।'

---

১ গরুবাছুরের প্রতি তাঁহার কত ভালবাসাই ছিল! তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। মঠের মাঠে চোরকাঁটার দরুণ গরুগুলির ঘাস খাইবার অসুবিধা হইত—সেজন্য মহাপুরুষজী নিজে দাঁড়াইয়া চোরকাঁটা পরিষ্কার করাইতেন। গরুগুলির অসুখ হইলে তাঁহার ভাবনার আর অন্ত ছিল না। জনৈক পশুচিকিৎসক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি গরুর সেবা করছ—এতেও ঠাকুরেরই সেবা হচ্ছে। মাঠের গাছপালা, ঘর-বাড়ী, গরু-বাছুর সব কিছুই ঠাকুরের।"

মঠের ভাইদের অসুখ হলে তাঁর আর ভাবনার অন্ত ছিল না—২।৩ বার করে রোগীদের খবর তাঁকে দিতে হত। আহা! তিনি আমাদের জন্য কত ভাবতেন! আর কি ভালবাসাই ছিল সকলকার উপর!" এইভাবে মঠের ছোট-বড় যাবতীয় কাজেই তাঁহার সাধ্যমত যোগদানের ফলে সকলেই প্রত্যেক কাজটি ঠাকুরের সেবাজ্ঞানে করিতে শিখিত।

চিঠিপত্রাদি তখন তিনি নিজেই লিখিতেন। মঠে অবস্থিত সাধুদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার ন্যায় বিভিন্ন কেন্দ্রের এবং তপস্যাদিতে রত সাধুবৃন্দের সহিতও তাঁহার এমনই গভীর আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিগত যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল যে, সকলেই তাঁহার নিজহাতের চিঠি আশা করিতেন। তাহা ছাড়া নানাস্থানের ভক্তমণ্ডলীর ধর্মজীবন গড়িয়া তুলিবার জন্যও তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন—চিঠি-পত্রাদির দ্বারা তিনি প্রত্যেকের ধর্মজীবনের সমস্যাদি সমাধান করিয়া সকলকে প্রেমসূত্রে শ্রীগুরুপদে সংলগ্ন করিয়া রাখিতেন। ভক্তদের ব্যক্তিগত জীবনের কত প্রকার সমস্যার সমাধান যে তাঁহাকে করিতে হইত তাহার ইয়ত্তা নাই—অনেক ভক্তের সাংসারিক দুঃখকষ্ট ও অসচ্ছলতার প্রতিকারেও তিনি তৎপর ছিলেন।

বৈকালবেলা ভক্তসমাগম অপেক্ষাকৃত বেশী হইত বলিয়া মহাপুরুষজীকে ঐ সময় ভক্তদের সঙ্গে প্রসঙ্গাদিতে ব্যস্ত থাকিতে হইত। অতঃপর সন্ধ্যার পূর্বে একবার সারা মঠ ঘুরিয়া যাবতীয় কাজকর্মের খোঁজখবর করিতেন। সান্ধ্য আরাত্রিকে তিনি নিত্য যোগদান করিয়া পরে ঠাকুরঘরে বসিয়াই অনেকক্ষণ ধ্যানান্তে যখন নিজপ্রকোষ্ঠে আসিতেন তখন মঠের কোন কোন সাধু ভজনসাধন সম্বন্ধে তাঁহার নিকট উপদেশ

গ্রহণ করিতেন। ঐ সকল প্রসঙ্গ খুবই উচ্চভাবোদ্দীপক। তাঁহার দৈনন্দিন জীবন খুব সাদাসিধা ছিল। ১৯২১ সাল পর্যন্ত তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র হিসাবে ছিল দুই টুকরা থানকাপড়, গায়ের জন্য একটি ফতুয়া ও চাদর, আর পায়ে চটিজুতা। কলিকাতা বা অন্যত্র যাইবার সময় জামা জুতা প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। আহারাদিরও কোন পৃথক ব্যবস্থা তিনি পছন্দ করিতেন না, সকলের সঙ্গে বসিয়া ঠাকুরের প্রসাদগ্রহণেই ছিল তাঁহার তৃপ্তি। তাঁহার জীবন একদিকে যেমন উচ্চ আদর্শের প্রেরণা আনিয়া দিত, অন্য দিকে তাঁহার ভালবাসা ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার সকলকেই তাঁহার বড় আপনার জন করিয়া লইত।

বাবুরাম মহারাজের দেহত্যাগে সকলেই ভগ্নোৎসাহ ও ভগ্নপ্রাণ ছিলেন, তাহার উপর ঐ সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দও খুবই পীড়িত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে সেই বৎসর মঠে প্রতিমায় ৺শারদীয়া পূজা অনুষ্ঠিত না হইয়া ঘটে-পটেই মহামায়ার আরাধনা হইয়াছিল।

মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা ধ্যানভজনের সঙ্গে যাহাতে স্বাধ্যায় দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারেন সেজন্য মঠে নিয়মিতভাবে গীতা, উপনিষদ্ ও বেদান্ত-গ্রন্থাদি-অধ্যাপনার জন্য একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। মহাপুরুষজী শাস্ত্রাদিপাঠে সকলকে খুব উৎসাহ দিতেন এবং ইহার অনুকূল ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়াছিলেন। নিত্য শাস্ত্রাদি-পাঠ ছাড়া রাত্রে আহারাদির পরে একটি সাধারণ ক্লাসে ধর্মগ্রন্থাদি-পাঠ হইত। মঠের প্রত্যেকেই ঐ ক্লাসে যোগদান করিয়া আলোচনাদি করিতেন।

১ ঐ সকল প্রসঙ্গের কিয়দংশ 'শিবানন্দ-বাণী'—১ম ও ২য় ভাগে বাহির হইয়াছে।

মঠ-পরিচালনায়

ঠাকুর খুব ভজন-প্রিয় ছিলেন; প্রার্থনা-সঙ্গীতাদি সাধনার বিশেষ অঙ্গ, সেজন্য মঠে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধ্যান-জপের পরে বিভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী-বিষয়ক ভজন-কীর্তন হইত। এইভাবে জপ-ধ্যান, পূজা, পাঠ, শাস্ত্রচর্চ্চা, ভজন-কীর্তনাদিতে মঠের আধ্যাত্মিক ভাবধারা বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

বেলুড় ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের স্বাস্থ্য সেই সময় খুবই খারাপ ছিল—বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে। মঠে তখন ২২।২৪ জনের বেশী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সাধারণতঃ থাকিতেন না। ভাদ্রমাস হইতে কার্তিকমাস পর্যন্ত মঠ একটি ছোটখাট হাসপাতালে পরিণত হইত—রোগীদের ঘর সকল সময়েই ভর্তি। অনেক সময় এমনও হইয়াছে যে, মঠের নিত্যকার কাজকর্ম চালানই মুস্কিল। মঠের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মহাপুরুষজী খুবই সচেষ্ট হইলেন। মঠের আর্থিক অবস্থা আদৌ স্বচ্ছল ছিল না। উপযুক্ত পথ্যের অভাবে রোগীরা দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিতে পারিত না; সেজন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করিয়া রোগীদের জন্য বিশেষ পথ্যাদির যোগাড় করিতেন এবং উহা অনেক সময় নিজেই প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ১৯১৯ সালে ম্যালেরিয়ার সময় জনৈক সেবককে মহাপুরুষজী অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সাগু, বার্লি, সটি, এরারুট, নিরামিষ ও আমিষ ঝোল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী নিজে রান্না করিয়া শিখাইয়াছিলেন। রোগীরা যখন পথ্য করিতে বসিত তখন মহাপুরুষজী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সকলকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন।

মঠে তখন সকল কাজে গঙ্গাজলই ব্যবহৃত হইত—মঠের সাধুব্রহ্মচারীরাই বাঁকে করিয়া গঙ্গা হইতে বহিয়া আনিতেন। ফটকিরি প্রভৃতির দ্বারা পরিষ্করণ সত্ত্বেও বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে ঐ জল খাওয়ার

ফলে অনেককেই নানাপ্রকার পেটের অসুখে ভুগিতে হইত—অথচ অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। উহার প্রতিকারকল্পে সকলের বিশেষ চেষ্টার ফলে মঠে কলের জল আসিল ১৯২১ সালে।

নিয়মিত সময়ে আহারাদির ব্যবস্থার জন্য মহাপুরুষজী সেই সময় মঠে নিয়ম করিয়াছিলেন যে, বেলা ১২টার মধ্যে ঠাকুরের ভোগরাগাদি হইয়া যাইবে এবং সকলে ঠিক সময়ে প্রসাদ পাইবে। যাঁহারা প্রসাদ-প্রার্থী তাঁহাদিগকে তাহার পূর্বে সময়মত আসিয়া প্রসাদ পাইবার বিষয় জানাইতে হইত। একদিন দ্বিপ্রহরের পরে সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, এমন সময় একজন আগন্তুক ব্রাহ্মণ প্রসাদপ্রার্থী হইয়া মঠে আসিলেন। অসময়ে প্রাসাদের কোন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয় তাঁহাকে বলা হইলে ব্রাহ্মণ হতাশপ্রাণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেলেন। ঐ ঘটনা উল্লেখ করিয়া মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, কলিতেও ঠিক ঠিক ব্রাহ্মণ আছেন—আর ব্রহ্মশাপও মানতে হয়। এই মঠেই তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ব্রাহ্মণটি যখন আমতলা থেকে উঠে যাচ্ছিলেন আমি তখন নীচের বেঞ্চিতে বসে। তিনি কেবলই বলছিলেন, 'ব্রাহ্মণকে কেউ দুটো খেতে দিলে না। এতে কি ভাল হবে?' এই বলে দুঃখ করতে করতে যখন উঠে গেলেন, দেখলাম তাঁর চোখ দিয়ে যেন একটা আগুনের হলকা বেরিয়ে গেল। আমার মনের ভেতরটায়ও তখন খ্যাঁচ করে যেন একটা তীর বিঁধে গিয়েছিল। মনে হল—না, কাজটা ভাল হল না। তখনই একজনকে পাঠালাম ব্রাহ্মণটিকে ফিরিয়ে আনবার জন্য; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তার তিন দিন পরেই গোয়ালঘরে আগুন লাগে।

গোয়ালের ক্ষতি হয়েছিল; কিন্তু গরুগুলির কিছুই হয় নি। তখন বুঝলাম যে—এ ব্রহ্মশাপ।" ঐ ঘটনার পর হইতে মহাপুরুষজীর আদেশে মঠ হইতে কেহ অভুক্ত অবস্থায় ফিরিত না। অন্নপ্রসাদ ফুরাইয়া গেলেও মুড়ি-চিঁড়া, ফল-মিষ্টি প্রভৃতি দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করা হইত।

জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীকে মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি কাজকর্মের ভেতর তো তেমন থাকি নি তাই লোকজনের সঙ্গে তাদের মনের মতন করে কথা বলতে পারি নে।" বাস্তবিকই সকল সময় তিনি 'মনের মতন' কথা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার বাচনিক সত্যনিষ্ঠাও এত দৃঢ় ছিল যে তিনি অনেকক্ষেত্রে আপাত-অপ্রিয় হইলেও 'সত্যই' বলিতেন। তাহা ছাড়া 'মন-মুখ এক' করাকে শ্রেষ্ঠ সাধনারূপে অতিশ্রদ্ধার সহিত নিজজীবনে প্রতিফলিত করার মধ্যেও তাঁহার সন্ন্যাসজীবনের মাধুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও মহাপুরুষজীর ঐ প্রকার ব্যবহার সহজদৃষ্টিতে কঠোর বলিয়া মনে হইত, তথাপি ঐ বাহ্য কাঠিন্যের পশ্চাতে তাঁহার সদাকল্যাণকামী প্রাণের স্পর্শে এবং স্বভাবসুলভ ভালবাসায় সকলেরই মনঃপ্রাণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত থাকিত।

১৯১৯ সালের প্রথম ভাগে বাঁকুড়া জিলার নানাস্থানে এবং সাঁওতাল পরগণায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এই সংবাদে মহাপুরুষজী খুবই বিচলিত হইয়া পড়েন। তিনি বেলুড় মঠ হইতে ঐ সকল স্থানে সেবক প্রেরণ করিয়া শত শত নরনারায়ণের প্রাণ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেবাব্রতীদিগকে উৎসাহদান করিয়া তিনি যে-সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে একদিকে যেমন

সেবাধর্মের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি আর্তের জন্য তাঁহার প্রাণের গভীর সহানুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছে—"আন্তরিক প্রার্থনা করিতেছি, তোমার হৃদয়ে সদাসর্বদা প্রভুর শ্রীমূর্তি জাগরূক থাকুক এবং সেই বলে তোমরা তাঁর দীন-দরিদ্র মূর্তিদের সেবা যথাসাধ্য করিতে সমর্থ হও। অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি, ও অঞ্চলে বৃষ্টি হউক এবং জলকষ্ট দূর হউক। দুঃখের সংবাদ শুনে শুনে প্রাণে যে কি কষ্ট অনুভব হয় তাহা প্রাণেশ্বরই জানিতেছেন। উপায় তাঁহার কৃপা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না।"

অন্য চিঠিতে আছে—"ওখানকার কাজ শেষ করিয়া পরে কোন নির্জনস্থানে বসিয়া তাঁর নাম করিতে ইচ্ছা হইতেছে – অতি উত্তম। মনে এ ভাব আসার কারণ—এই শুভকাজ করিতেছ বলিয়া। ইহা তোমার উপর প্রভুর কৃপার পরিচয়—নিঃস্বার্থভাবে তাঁর কাজ করার এই ফল।"

এই সকল দুঃখ-যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ তাঁহার চিত্তের অন্তস্তল হইতে মাঝে মাঝে গভীর বিশ্বাসের বাণী ও সামাজিকতথ্যপূর্ণ ভবিষ্যতের বিবিধ ইঙ্গিত আত্মপ্রকাশ করিয়া সেবকদিগকে চমৎকৃত করিত এবং তাহাদের প্রাণে আনিয়া দিত অদম্য উৎসাহ; আর তাহাদের ঐ সেবাকার্যের পশ্চাতে যে একটা বিরাট শক্তি ও উদ্দেশ্য বর্তমান, তাহা দেখাইয়া দিয়া তাহাদের মনকে উচ্চস্তরে লইয়া যাইত। সাঁওতাল পরগনায় সেবারত সন্ন্যাসীদিগকে লিখিত নববর্ষের আশীর্বাদপত্রে রহিয়াছে—"আশীর্বাদ করি নববর্ষ তোমাদের সকলকে—সমগ্র ভারতকে এবং সমগ্র জগৎকে শান্তি প্রদান করুক। প্রভুপদে তোমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিনদিন অচল অটল হইতে থাকুক। শান্তি—প্রকৃত শান্তি ধর্মের দ্বারাই সম্ভব। প্রকৃত পার্থিব কল্যাণও ধর্ম ভিন্ন

স্থায়ী হয় না। প্রভুর জীবনে সর্বধর্ম-সমন্বয়রূপ নব ভাব—এই যুগের যাহা উপযুক্ত এবং যাহা তিনি জীবনে আচরণ করিয়াছিলেন এবং সমগ্র জগৎ যাহা এখন পাঠ করিয়া জানিতেছে—তাহা যে ক্রমে সমাজে আচরিত হইবে (কি উপায়ে হইবে তাহা কেহই জানে না) তার সন্দেহ নাই। অনেকেই উহা অসম্ভব বিবেচনা করে; ঈশ্বরাবতারের কার্যে অসম্ভব সম্ভব হয়। তাহা না হইলে আর ঈশ্বরের কার্য কি? প্রভুর ইচ্ছায় জীবিত থাকিলে আরও অসম্ভব সম্ভব হইবে দেখিবে এবং আশ্চর্য হইবে—বলিবে, 'জয় প্রভুর জয়, যুগাবতারের জয়' আর আনন্দে নৃত্য করিবে।"

মঠে ভক্তসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ঐ ভক্তবৃন্দের মধ্যে নানাশ্রেণীর লোক থাকিত—পুরুষ, স্ত্রী, যুবা, বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র। মহাপুরুষজী আধার-অনুযায়ী সকলকেই নিজ নিজ সাধনপথে সাহায্য করিতেন; তাহাদের মধ্যে আবার কাহাকেও বা ভবিষ্যতে শ্রীযুগাবতারের বার্তাবাহিরূপে মনোনীত করিয়া ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনুপ্রেরণা দিতেন।

ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইত; এ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবের দিগ্‌দর্শন পাওয়া যায় একটি চিঠিতে—"আমার গুরুবুদ্ধি কখনও হয় না। আমার জীবনসর্বস্ব প্রভু রামকৃষ্ণ—আমি তাঁর চিরদাস, সন্তান, শিষ্য। সুতরাং আমি কখনও কাহারো গুরু হইতে পারি না। তবে ইহাও আমি বলি, যদি কেহ প্রভুকে প্রাণ-মন-দেহ দিয়া ভালবাসিতে চায়, আমার এবং আমাদের সে বড়ই আপনার এবং তার যাহাতে প্রভুপদে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি বৃদ্ধি হয় সেজন্য আন্তরিক প্রার্থনা করি। তাঁর পাবন নাম জীবের ভবসাগর

পার হইবার একমাত্র মন্ত্র। তাঁর মধুর জীবন্ত মূর্তি জীবের ধ্যেয়—তাঁর পবিত্র চরিত্র-পাঠ-আলোচনাই শাস্ত্রাধ্যয়ন—তাঁর গুণগান করাই কীর্তন—তার ভক্তসঙ্গ করাই সাধুসঙ্গ। এই আমার মন্ত্রদান—এই আমার শিক্ষা।"

শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতিতে সেই বৎসর (১৯১৯) মঠে প্রতিমায় ৺দুর্গাপুজার আয়োজন হইয়াছিল। আনন্দময়ী আসিবেন—আনন্দপরিপূর্ণ প্রাণে মঠের সকলেই একনিষ্ঠভাবে পূজার আয়োজনে ব্যস্ত—আগমনীর মধুর গানে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত। এমন সময় সংবাদ আসিল যে পূর্ববঙ্গের বহুস্থান ভীষণ ঝড়বৃষ্টি ও বন্যায় বিধ্বস্ত—সহস্র সহস্র নরনারী আশ্রয়হীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন—শত শত লোক মৃত ও মৃতপ্রায়। ঐ মর্মন্তুদ সংবাদে সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মিশনের তরফ হইতে খবরের কাগজে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়া মঠ হইতে অবিলম্বে একদল সেবক ঐ অঞ্চলে প্রেরিত হইল। পঞ্চমীর দিন বিকালবেলা 'মহামায়ীকী জয়' ধ্বনি করিয়া একখানি নৌকায় সেবকগণ মঠের গঙ্গার ঘাট হইতে বরিশাল, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পথে কলিকাতার দিকে রওনা হইল।

পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। কয়দিন মহাপুরুষজী যেমন আনন্দে ভরপুর, তেমনি অক্লান্তভাবে কর্মে মত্ত হইয়া পূজার সমস্ত কাজকর্ম দেখাশুনা করিয়াছিলেন। মহাষ্টমীর দিন কলিকাতা হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠে আসিলেন এবং দ্বাদশী পর্যন্ত ছিলেন। নবমীর দিন আসিলেন স্বামী সারদানন্দ। নবমীর রাত্রে দেবীর সম্মুখে ভজনগানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ এবং সারদানন্দ তিন জনেই যোগদান করিয়াছিলেন। একটা দিব্য গম্ভীর আহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল—খুবই জমজমাট ভাব। ভজন চলিতে লাগিল। পরে 'খ্যাপার হাটবাজার,

মা তোদের খ্যাপার হাটবাজার' ইত্যাদি গানটি যখন গীত হইতেছিল তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য সকলেও ভাবে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন এবং প্রাণে প্রাণে দেবীর আবির্ভাব অনুভব করিতেছিলেন। পরে রাখাল মহারাজের আদেশে যখন—

সমরে নাচেরে কার এ রমণী, নাশিছে তিমিরে তিমিরবরণী।
হুহুংকার-রবে মগনা তাণ্ডবে, চমকে দমকে যেন রে দামিনী।
অট্টঅট্ট হাসি, সমর-উল্লাসী, দিতিসুত নাশে দনুজদলনী।
অসুর সংহারে, অসির প্রহারে, বরাভয় করে সৃজন-পালিনী।
বামা ভয়ংকরা, ভীষণে মধুরা, হরমনোহরা মানসমোহিনী।
সংসার-অরণ্যে অনন্যশরণ্যে, শ্রীরামপ্রসাদশরণদায়িনী।

—এই গানটি গাওয়া হইতেছিল তখন সকলেই একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। ভাবের আতিশয্যে 'আহা! আহা!' বলিতে বলিতে প্রথমে স্বামী ব্রহ্মানন্দ দাঁড়াইয়া পড়িলেন, দেখিতে দেখিতে মহাপুরুষজী এবং শরৎ মহারাজও উঠিয়া দাঁড়াইলেন আর তিন জনে মুদিতনয়নে তালে তালে করতালি দিয়া মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সঙ্গেসঙ্গে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী, সমবেত ভক্তবৃন্দ—কেহ তানপুরা, কেহ বা অন্য অন্য বাদ্যযন্ত্র হাতে করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ ও সারদানন্দের সমবেত ভাবময় নৃত্য! মনে হইতেছিল যেন তিনটি দেববালক মাতৃনামগানে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কী মধুর দৃশ্য! কী তন্ময় মাতোয়ারা ভাব! সকলেই স্বর্গীয় আনন্দে ভাসিতেছিলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেই আনন্দ-নৃত্যগান চলিয়াছিল।

বাবুরাম মহারাজের অদর্শনের বেদনা কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইবার পূর্বেই মহাপুরুষজীর মন আর এক দারুণ আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল—

শ্রীশ্রীমায়ের কঠিন অসুখের সংবাদে। তিনি কয়েকমাস যাবৎ জয়রাম-বাটীতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন। জ্বরের সামান্য একটু বিরাম হইতেই তাঁহাকে অস্থিচর্মসার ও অতিদুর্বল অবস্থায় কোনপ্রকারে বাগবাজারে আনা হইল। ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯২০) কলিকাতায় আসিয়াও প্রতি-দিনই তাঁহার জ্বর হইতেছিল। কবিরাজী, ডাক্তারী প্রভৃতি নানাপ্রকার চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগের উপশম দেখা গেল না। অক্লান্ত সেবা, চিকিৎসা, ঠাকুরের পার্ষদ-সন্তানগণ এবং সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-ভক্তমণ্ডলীর ব্যাকুল প্রার্থনা—সবই ব্যর্থ হইল। সমগ্র রামকৃষ্ণ-সংঘ ও সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২৭ সন (১৯২০ সালের ২০শে জুলাই) রাত্রি ১-৩০ মিঃ সময় শ্রীশ্রীমা স্বস্বরূপে লীন হইয়া গেলেন। পর দিবস বিবিধপুষ্পমাল্যাদিতে ভূষিত, গঙ্গাস্নাত শ্রীশ্রীমায়ের সেই পূতদেহ সাধুভক্তগণ স্কন্ধে বহন করিয়া বেলুড় মঠে লইয়া আসিলেন। মহাপুরুষজী, শরৎ মহারাজ, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি[১] ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্তানগণ কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুজলসিক্ত শত শত মাতৃহারা ভক্তগণের সহিত ঐ শবযাত্রার অনুগমন করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে যে স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের পঞ্চভৌতিক শরীর সৎকার করা হইয়াছিল, তথায় পরে স্বামী সারদানন্দের চেষ্টায় মন্দির নির্মিত হয়। বেলুড় মঠে বর্তমান শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির এবং জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির স্বামী সারদানন্দের মাতৃসেবাযজ্ঞের শেষ আহুতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননীর তিরোধানে অগণিত ভক্তবৃন্দ শোকে আত্মহারা! মহাপুরুষজী নিজশোকানল অতিকষ্টে চাপিয়া রাখিয়া মাতৃহীন সাধুভক্ত-বৃন্দকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। উদ্বোধনের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন;

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দেহত্যাগের সময় ভুবনেশ্বর মঠে ছিলেন।

উহা তাঁহার বাসের জন্যই নির্মিত হইয়াছিল। সেজন্য মহাপুরুষজী শেষ জীবনে সকল সময়েই উদ্বোধন কার্যালয়কে 'মায়ের বাড়ী' বলিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণকে তিনি আপনার হইতেও আপনার জন মনে করিয়া ভালবাসিতেন—কত সেবা-যত্ন, আদর-আপ্যায়ন করিতেন তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অন্যের পক্ষে অনুমান করা কঠিন। শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সব কিছুই মহাপুরুষজীর অতি প্রাণের জিনিষ ছিল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি কত গভীর তাহা কখনও ভাষায় একটু-আধটু প্রকাশ হইয়া পড়িত। মহাপুরুষজী একদিন বলিয়াছিলেন—"তিনি যে কি ছিলেন তা একমাত্র ঠাকুরই জানতেন; আর স্বামিজী কতকটা বুঝেছিলেন। স্বামিজী পাশ্চাত্ত্য দেশে যাবার পূর্বে একমাত্র মাকে বলেছিলেন এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে সমুদ্রপারে পাড়ি দিয়েছিলেন। মাও তাঁকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'বাবা, তুমি দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো, তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।' হয়েও ছিল তাই। মায়ের আশীর্বাদে স্বামিজী বিশ্ব-বিজয়ী হয়েছিলেন। স্বামিজী কখনও এও বলতেন, 'মা ঠাকুরের চাইতেও বড়'—এত গভীর ছিল তাঁর শ্রদ্ধা মার উপর! ঠাকুর বলেছিলেন, 'নহবতে যে আছে সে যদি কোনও কারণে কারও উপর বিরূপ হয় তো তাকে রক্ষা করা আমারও সাধ্যাতীত।'...মা তো সকলেরই মা ছিলেন। তাঁর কত দয়া, কত ক্ষমা, আর কি অদ্ভুত সহ্যগুণ ছিল! মাকে আমরাই বা কতটুকু জেনেছি? তবে তিনি কৃপা করে এটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সাক্ষাৎ জগন্মাতা। তাঁর স্বরূপ যে কি তা তিনি দয়া করে বুঝিয়ে না দিলে বুঝবার উপায় নেই।"

অন্য এক সময় শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথিতে সকাল হইতেই মহাপুরুষ-

জীর মুখে 'মা মা' রব শুনা যাইতেছিল—যেন মাতৃগতপ্রাণ একটি শিশু! করজোড়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছিলেন—"মা, মা, মহামায়া! জয় মা, জয় মা! আমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান, বিবেক, অনুরাগ, ধ্যান, সমাধি দিন। ঠাকুরের এ সংঘের কল্যাণ করুন—সমগ্র জগতের কল্যাণ করুন, জগতে শান্তিবিধান করুন।" পরে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিয়াছিলেন—"আমাদের ভক্তি নেই, তাই এসব দিনের ঠিক ঠিক মাহাত্ম্য বুঝতে পারি নে। আজ কি যে-সে দিন! মহামায়ার জন্মদিন! জীবজগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং মহামায়া আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষলীলা বোঝা বড় শক্ত। তিনি কৃপা করে না বোঝালে কে বুঝবে? কি সাধারণভাবে তিনি থাকতেন! আমরা তাঁকে কি বুঝব? একমাত্র ঠাকুরই মাকে ঠিক ঠিক জেনেছিলেন।··· আমাদের মায়ের নাম সারদা। ঐ মা-ই স্বয়ং সরস্বতী। তিনি কৃপা করে জ্ঞান দেন—জ্ঞান অর্থাৎ ভগবানকে জানা—ঐ জ্ঞান হলেই ঠিক ঠিক পাকা ভক্তি সম্ভব। জ্ঞান না হলে ভক্তি হয় না। শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক জিনিষ—মায়ের কৃপা হলেই তা হওয়া সম্ভব। মা-ই জ্ঞান দেবার মালিক।"

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অদর্শনের বেদনা যাহাতে প্রতি ভক্ত-হৃদয়ে শ্রীভগবানের বিরহব্যথা স্থায়ী করে, সেই অভাববোধ যাহাতে সাধুভক্ত-দিগকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিকে চালিত করিয়া প্রত্যেকের প্রাণে বিবেক-বৈরাগ্যের ভাব জাগাইয়া দেয়, সেজন্য মহাপুরুষজী সকলকে নানাভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ১০।৮।২০ তারিখের একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—"যে ভক্ত তাঁর অভাবে যত দুঃখ অনুভব করিবেন তিনি তাঁকে তত বেশী দেখিতে পাইবেন ও হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিবেন,

কারণ তিনি সাধারণ মানবী নন, সাধিকা নন, সিদ্ধাও নন; তিনি নিত্যসিদ্ধা —সেই আদ্যাশক্তির এক অংশ-প্রকাশ।...সুতরাং তাঁর কৃপা যাঁরা পাইয়াছেন, তাঁর সেই অহৈতুকী মাতৃস্নেহ যাঁরা অনুভব করিয়াছেন তাঁরা ধন্য হইয়াছেন। সর্বভূতের অন্তরাত্মা সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, সেই জগজ্জননী অহৈতুকী-স্নেহপরশ হইয়া যে ভক্তকে একবার শ্রীকরকমল দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন—তাঁর চৈতন্য হইয়াছে বা হইবেই হইবে, ইহা আমার পূর্ণ বিশ্বাস।" শ্রীশ্রীমা জগজ্জননী, তিনি ধ্যানগম্যা, মনকে নিরোধ করিয়া অন্তরতম প্রদেশে ডুবাইয়া দিতে পারিলেই সেই জগন্মাতার দর্শন সম্ভব —এইভাবে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এই বৎসর মঠে 'অতি ভক্তিভাবে, গাম্ভীর্য ও আনন্দের সহিত' প্রতিমায় ৺দশভূজার আরাধনা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা মানবীদেহত্যাগের পর এবার যেন সাক্ষাৎ দেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়া ভক্তগণের মস্তকে দশভুজে আশীর্বাদ বর্ষণপূর্বক তাহাদের শোকাশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত করিয়াছিলেন। পূজার আনন্দে সকলেরই প্রাণমন ভরপুর —পূজামণ্ডপে সমবেত সন্ন্যাসিগণের চণ্ডীপাঠ বড়ই উদ্দীপনা আনিয়া দিয়াছিল।

ভবানীপুর অঞ্চল হইতে কতিপয় যুবকভক্ত মহাপুরুষজীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া মঠে নিয়মিতভাবে আসা-যাওয়া করিতে লাগিল এবং উহার ফলে ধীরে ধীরে তথায় একটি ভক্তসংঘ গড়িয়া উঠিল। ভবানীপুরের জনৈক বিশিষ্ট ভক্ত নিজ মৃত পুত্রের স্মৃতি-রক্ষার্থ শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রম-স্থাপনের জন্য একটি বাড়ী দিতে প্রস্তুত হইলেন। মহাপুরুষজী ঐ শুভ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আশ্রমস্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

১৯২০ সালের ১৭ই নভেম্বর আদিগঙ্গার তীরে উক্ত বাড়ীতে আশ্রম স্থাপিত হইল। যথোচিত পূজানুষ্ঠানের পরে মহাপুরুষজী ঠাকুরকে সিংহাসনে বসাইয়া প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। দাতার মৃত পুত্রের নামানুসারে আশ্রমের নাম রাখা হইল 'গদাধর আশ্রম' ; ঐ উপলক্ষে নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমে কয়েকদিনব্যাপী আনন্দোৎসব চলিল। মহাপুরুষজীও আঠার-উনিশ দিন তথায় বাস করায় বহুলোক তাঁহার পূতসঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিল। একদিন সান্ধ্য আরতি ও জপ-ধ্যানাদির পর তিনি জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "দেখ, বহুজন-হিতায় ঠাকুর এখানে বসেছেন। ঠাকুর বড়ই ভজনপ্রিয়; এখন রোজ আরতির পর খানিকক্ষণ ভজন-কীর্তন চালাও। দাও তো দেখি আমার খোলটা। আর 'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন'—এই গানটি গাও।" ভক্তটি কীর্তন আরম্ভ করিলেন, মহাপুরুষজী খোল বাজাইতে লাগিলেন এবং মাঝেমাঝে "এমন রূপ আর হেরি নাই রে" ইত্যাদি আখর দিয়া স্বয়ং সঙ্গেসঙ্গে গাহিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষজীর আকর্ষণে দক্ষিণ-কলিকাতার বহু বিশিষ্ট লোক আশ্রমে সমবেত হইতেন। তিনিও ভগবৎপ্রসঙ্গাদি দ্বারা সকলের প্রাণে ধর্মভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। অতঃপর একজন সুযোগ্য সন্ন্যাসীর উপর আশ্রমপরিচালনার ভার দিয়া তিনি বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।[১]

১ শ্রীশ্রীমায়ের জীবদ্দশাতেই গদাধর-আশ্রমবাড়ীটার দানপত্র করা হইয়াছিল। মা ঐ সময়ে বাগবাজারে অন্তিম রোগশয্যায় শায়িতা। আশ্রম-স্থাপন হইবে শুনিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "৺কালীক্ষেত্রে আদিগঙ্গার তীরে ঠাকুরের আশ্রম হবে—বেশ হবে। সেরে উঠে ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকব।"

মঠ-পরিচালনায়

১৯২১ সালে স্বামিজীর উৎসবের দিন[১] সস্ত্রীক মহাত্মা গান্ধী পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মহম্মদ আলি এবং আরও কতিপয় সহ-কর্মীকে সঙ্গে করিয়া বেলুড় মঠ দর্শন করিতে আসেন। মহা-পুরুষজী তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ঠাকুর ও স্বামিজীর ঘর প্রভৃতি দর্শন করাইয়াছিলেন। মহাত্মাজী ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিষপত্র এবং তাঁহার হাতের লেখা (যাহা বেলুড় মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে) বিশেষ আগ্রহসহকারে দেখেন। ঠাকুরের ব্যবহৃত মাতুরখানি তিনি শ্রদ্ধাসহকারে স্পর্শ করিয়াছিলেন। বিপুল জনতার বিশেষ আগ্রহে তিনি স্বামিজীর ঘরের সংলগ্ন দ্বিতলের বারান্দা হইতে নিম্নে গঙ্গাতীরে সমবেত জনগণকে হিন্দিভাষায় সময়োপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণও দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এখানে অসহযোগ-আন্দোলন বা চরখাপ্রচার করিতে আসি নি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন-অনুষ্ঠানে তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও নমস্কার জ্ঞাপন করবার জন্যই আজ এখানে এসেছি। আমি স্বামিজীর পুস্তকাবলী ভাল করে পড়েছি—তার ফলে পূর্বে দেশের প্রতি আমার যে ভালবাসা ছিল তা আরও অনেক বেড়েছে। যুবকদের কাছে আমার এই অনুরোধ—স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে বাস করিতেন এবং যেখানে দেহত্যাগ করেছেন, সেস্থানের ভাবধারা অন্ততঃ কিছুটা গ্রহণ না করে শূন্যহাতে আজ ফিরে যেও না।"

অন্য সময়ে গান্ধীজীর সম্বন্ধে মহাপুরুষ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "স্বামিজীর দেশপ্রীতিটা গান্ধীজীকে ভর করেছে। গান্ধীর চরিত্র সকলের অনুকরণীয়। দেশে দেশে ঐ রকম লোক জন্মালে তবে শান্তির একটা ব্যবস্থা হবে।"

১। 'উদ্বোধন', ১৩২৮, বৈশাখ-সংখ্যা এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত', ১৯২১, মার্চ-সংখ্যা।

ঐ বৎসর মাদ্রাজের ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-ছাত্রাবাস-বাড়ীর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে দক্ষিণ ভারতের সাধুভক্ত-গণের সমবেত আহ্বানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঐ গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য ১লা এপ্রিল মাদ্রাজ রওনা হইলেন। মহারাজের বিশেষ ইচ্ছায় মহাপুরুষজীও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহারা পথে ভুবনেশ্বরে ষোল দিন এবং ওয়ালটেয়ারে এক সপ্তাহ কাটাইয়া ২৫শে এপ্রিল মাদ্রাজে পৌঁছিলেন। কে জানে—হয়তো কোন দৈব ইঙ্গিতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীকে দক্ষিণ ভারতের ভক্তমণ্ডলী ও বিভিন্ন কেন্দ্রের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য এবং শ্রীশ্রীপ্রভুর মহিমা দিকে দিকে কতটা ঘোষিত হইয়াছে তাহা আরও নিবিড়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য তাঁহাকে এইবার সঙ্গে আনিয়াছিলেন! শিবানন্দ ইতঃপূর্বে শেষ মাদ্রাজে আসিয়াছিলেন ১৮৯৭ সালে—স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়া মঠে লইয়া যাইবার জন্য। এতদিনে যুগাবতারের ঐশী প্রভাব দক্ষিণ ভারতে আরও বিস্তার লাভ করিয়াছে—এখন ঘরে ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানরূপে পূজিত হইতেছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সেবাভক্তি ও ত্যাগোজ্জ্বল মহৎ জীবনের গৌরবস্তম্ভ-স্বরূপ মাদ্রাজ মঠ দেখিয়া এবং তাঁহার হাতেগড়া ভক্তগণের ভক্তির গভীরতার সহিত পরিচিত হইয়া মহাপুরুষজী পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত মহাপুরুষজীকেও পাইয়া সাধু এবং ভক্তগণের আনন্দ ও উদ্দীপনার সীমা রহিল না।

মাদ্রাজে আসিবার কয়েকদিন পরেই মহাপুরুষজী ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আক্রান্ত হন এবং সাত-আট দিন তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। দক্ষিণভারত-ভ্রমণকালে 'তারকদা'র যাহাতে কোনপ্রকার কষ্ট না হয়

সে বিষয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সদা সতর্কদৃষ্টি ছিল। তাঁহার প্রয়োজনীয় আরাম ও স্বচ্ছন্দতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার জন্য তিনি নিজ সেবকগণকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং নিজেও সর্ববিষয়ে তাঁহার খোঁজ-খবর করিতেন।

মে মাসের শেষে নূতন ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন হইয়া গেল। অতঃপর আরও কিছুদিন মাদ্রাজে মহানন্দে কাটাইয়া মহাপুরুষজী রাখাল মহারাজের সহিত ১৪ই জুন বাঙ্গালোর আশ্রমে আসিলেন। সহরের প্রান্তভাগে অবস্থিত নানা জাতীয় ফলফুলবৃক্ষলতাদি-শোভিত মনোরম আশ্রমটিতে আসিয়া সকলেই খুব তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনবার্তা শুনিয়া দলে দলে ভক্ত আশ্রমে আসিতে লাগিলেন। ১৮৯৩ সালে পরিব্রাজকরূপে মহাপুরুষজী যখন বাঙ্গালোরে প্রথম আসেন তখনকার পরিচিত অনেকেই তাঁহাকে পুনরায় পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন।

প্রায় দুই মাস বাঙ্গালোরে অবস্থানের পর তিনি কিছুদিনের জন্য মহীশূর প্রভৃতি স্থান দেখিতে গেলেন—স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাঙ্গালোরেই রহিলেন। ইতঃপূর্বে যখন মহাপুরুষজী বাঙ্গালোরে আসিয়াছিলেন তখন ইচ্ছা সত্ত্বেও নানাকারণে ঐ সকল স্থানে তাঁহারা যাওয়া ঘটে নাই। এইবার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এই সকল স্থান-দর্শনপ্রসঙ্গে বাঙ্গালোরে ফিরিয়া ১১।৯।২১ তারিখে জনৈক সন্ন্যাসীকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি মধ্যে কিছুদিনের জন্য মহীশূর গিয়াছিলাম। সেখানে এক উচ্চ পর্বতের শৃঙ্গে মহিষাসুর-বধকারিণী মা চামুণ্ডী দেবীর বৃহৎ মন্দির দর্শন করিয়াছি এবং জন্মাষ্টমীর দিন (যেদিন মহামায়ারও জন্মদিন) মন্দিরে ৺চণ্ডীপাঠ করিয়াছিলাম এবং প্রভুর কৃপায় পরমানন্দ লাভ

করিয়াছিলাম।[১] তথা হইতে আবার শ্রীমৎ রামানুজাচার্যের সেবিত শ্রীনারায়ণমূর্তি মহীশূর হইতে প্রায় ৩২ মাইল দূরে মেলকোট নামক স্থানে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আহা, কি অপূর্ব মূর্তি! সেই স্থানেই শ্রীরামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদ প্রথম প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা এখনও বিদ্যমান আছে। ইহা বৈষ্ণবদের একটি প্রধান কেন্দ্র। অতি রমণীয় স্থান এবং অতি উচ্চ ও পবিত্র ভাবোদ্দীপক। পূর্বোক্ত মা-র মন্দিরও ঐরূপ ভাবোদ্দীপক; প্রভুর কৃপায় উত্তম দর্শন হইয়াছে এবং ধন্য হইয়াছি।"

৺চামুণ্ডী দেবীকে দর্শনকালে দেবীর আবির্ভাব অনুভব করিয়া মহাপুরুষজী অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ 'দর্শন' তাঁহার মনে এমনই গভীর আনন্দ দিয়াছিল যে পরবর্তীকালেও মহীশূরের চামুণ্ডী দেবীর প্রসঙ্গে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন আর বলিতেন, "আহা! খুব জাগ্রতা দেবী। মায়ের কৃপায় আমার খুবই দর্শন হয়েছিল।" তিনি বেলুড় মঠে নিজের ঘরে ৺চামুণ্ডী দেবীর একখানি রূপার পাতে ক্ষোদিত মূর্তিও বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেন।

বেলুড় মঠ হইতে দূরে থাকিলেও দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে মহাপুরুষজী

---

১ কয়েকদিন পূর্ব হইতেই মন্দিরের বৈদ্যুতিক আলোকের সংযোগ নষ্ট হইয়াছিল—বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও ঐ সংযোগ স্থাপিত হইতেছিল না। মহাপুরুষজী মন্দিরের এক কোণে বসিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতেছিলেন কিন্তু অস্পষ্ট আলোকে তাঁহার পাঠের খুবই অসুবিধা হইতেছিল—এমন সময় হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিল; তিনিও নির্বিঘ্নে ৺চণ্ডীপাঠ সমাপ্ত করিলেন। আর সমবেত দর্শনার্থিগণও মন্দিরগর্ভ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হওয়ায় ভালরূপে দেবীদর্শন করিতে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল।

চিঠি-পত্রাদি দ্বারা মঠের যাবতীয় কাজকর্মের খবর লইতেন এবং যাহারা কাজ চালাইতেছিল তাহাদিগকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়া তাহাদের কর্মশক্তি বাড়াইয়া তুলিতেন। মঠের উপর তাঁহার টান কত গভীর ছিল, মঠের প্রত্যেক অঙ্গ, এমন কি পাচকব্রাহ্মণ, চাকর, গরুবাছুর, কুকুর-প্রভৃতি তাঁহার স্মৃতিতে সর্বদা কিরূপ জাগরূক থাকিত, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার একটি চিঠিতে—"এই নূতন জ্বরের সময় আসিল—প্রভুর কৃপায় কাহারো অধিক কিছু না হইলেই মঙ্গল—তা হবে না বলে মনে হয়। তোমাকে একলা অনেক কাজ করতে হচ্ছে—অবশ্য সময় সময় ওরূপ হয়ে পড়ে। তবে প্রভুর ইচ্ছায় কাজ আটকাবে না—কোন একটা উপায় হবেই। গরীব-দুঃখীদের তুমি সর্বদাই দেখ—আমরা জানি; প্রভুর দয়ারই লীলা আর দয়া ছাড়া ধর্ম কি আছে?...গরুগুলি সব ভাল আছে তো? প্রভাকর ও চাকরবাকর সব ভাল আছে? কুকুরগুলি সব কেমন আছে? বড়দাও ভাল আছে তো? আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তাদের দিও।...এবার মঠে মহামায়ার প্রতিমায় আরাধনা কি সম্ভব হবে? তোমরা যদি চেষ্টা করে তাঁর ইচ্ছায় উহা করিতে পার তো খুব আনন্দ হয়। শ—র খুবই ইচ্ছা মাদ্রাজ মঠে প্রতিমায় আরাধনা হয়—মহারাজেরও খুব মত! মহামায়ার ইচ্ছায় তোমরা মাকে প্রতিমায় আরাধনার জন্য খুব প্রার্থনা কর। তুমি ও তোমরা সকলে আমাদের আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমরা সব তাঁর পথে ধীরে ধীরে খুব অগ্রসর হও।"

বাঙ্গালোরে প্রায় চারি মাস কাল সকলকে প্রভূত আনন্দ দান করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও মহাপুরুষজী অন্যান্য সাধুবৃন্দ সহ মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন। মহারাজের আদেশে সেইবার মাদ্রাজ মঠে প্রতিমায় ৺শারদীয়া

পূজার আয়োজন হইল।[১] দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সাধু ও ভক্তগণ ঐ পূজোৎসবে যোগদান করিবার জন্য মাদ্রাজ মঠে সমবেত হইলেন। রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষজীর উপস্থিতিতে ঐ দুর্গাপূজা অভূতপূর্ব আনন্দোৎসবে পরিণত হইয়াছিল।

মাদ্রাজ হইতে ২১।১০।২১ তারিখে লিখিত মহাপুরুষজীর চিঠিতে জানা যায়, "তুমি আমার ও মহারাজের ৺বিজয়ার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে।...এখানে মায়ের পূজা অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এ দেশে এরূপ ব্যাপার সম্পূর্ণ নূতন—লোকজনে দেখিয়া শুনিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছে। সাত্ত্বিক-ভাবে শাস্ত্রবিহিত পূজায় এ দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীও খুব খুসী। আবার শ্যামাপূজাও প্রতিমায় হইবে মহারাজের ইচ্ছা—প্রতিমা কলিকাতা হইতে আসিবে। ৺শ্যামাপূজার কিছুদিন পরেই আমরা ভুবনেশ্বরে যাত্রা করিব এবং কিছুদিন সেখানে থাকিয়া মঠে যাওয়া এইরূপ কথা হইতেছে।"

মাদ্রাজ মঠে শ্যামাপূজাদিও সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। দক্ষিণ-ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দের প্রাণে প্রায় সাত মাস কাল নানাভাবে আনন্দ ও শান্তি পরিবেশন করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও মহাপুরুষজী ১৯শে নভেম্বর মাদ্রাজ পরিত্যাগ করেন এবং ২১শে ভুবনেশ্বর মঠে পৌছিলেন।

ভুবনেশ্বর প্রাচীন শৈবতীর্থ; ঐ স্থানের আধ্যাত্মিক আবহাওয়া অতি চমৎকার। ভজনসাধনের অনুকূল এই শিবক্ষেত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বহু যত্নে মঠটি নির্মাণ করিয়াছিলেন সমগ্র সংঘের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য।

১ দাক্ষিণাত্যে মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে এই সর্বপ্রথম প্রতিমায় ৺দশভুজার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিমা কলিকাতা হইতে রেলযোগে আনা হইয়াছিল।

মঠ-পরিচালনায়

ঐ মঠনির্মাণে তাঁহাকে কতটা কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা বেলুড় মঠে মহারাজের একদিনের একটিমাত্র কথাতে সুস্পষ্ট বোঝা যায়—"নিজের পেট কেটে ঐ ভুবনেশ্বর মঠ করেছি—তোরা সাধনভজন করে ভগবানলাভ করবি বলে।" মহারাজের হাতেগড়া ঐ মঠটি মহাপুরুষজীর খুব প্রিয় স্থান ছিল। ঐ পুণ্যস্থানে দুই গুরুভ্রাতা এক সঙ্গে মনের আনন্দে প্রায় দুই মাস কাটাইয়া ১২।১।২২ তারিখে বেলুড় মঠে পৌঁছিলেন। তাহার এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১৯শে জানুয়ারী স্বামিজীর শুভ জন্মতিথি। সেই বৎসর তাঁহার তিথিপূজা ও সাধারণ উৎসব একদিনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইতোমধ্যে স্বামী অভেদানন্দ অমেরিকা হইতে স্থায়িভাবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৯০৬ সালে ছয়মাসের জন্য তিনি শেষবার ভারতে আসিয়াছিলেন। দীর্ঘ পনর বৎসর পরে তাঁহাকে পাইয়া মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ এবং মঠের অন্যান্য সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন।

পূর্ববঙ্গের ভক্তগণ মহাপুরুষজীকে ঐ অঞ্চলে লইয়া যাইবার জন্য অনেকদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্য ও আন্তরিকতা দেখিয়া এইবার তিনি তাঁহাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। ১৩ই ফেব্রুয়ারী মহাপুরুষজী এবং স্বামী অভেদানন্দ কতিপয় সন্ন্যাসী ও ভক্তের সহিত ঢাকা অভিমুখে রওনা হইলেন। নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণ তাঁহাদিগকে বিপুল অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ঢাকা মঠ যেন ঐ সময় তীর্থে পরিণত হইয়াছিল—শত শত ভক্তযাত্রীর নিত্য মহোৎসব লাগিয়াই ছিল।

স্বামী অভেদানন্দ নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা সহরের নানাস্থানে বক্তৃতাদি

করিয়াছিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষণের ফলে সর্বত্র প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হইল। মহাপুষজীর নিকটও বহু ধর্মপিপাসুর সমাবেশ হইত। সমাগতদের মধ্যে যেমন থাকিতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপকবৃন্দ, তেমনি আবার উপস্থিত থাকিত দরিদ্র অজ্ঞ নরনারী। তাঁহার কাছে সকলেই সমান—প্রত্যেকেই তাঁহার উদার ভগবদ্বাণীতে আকৃষ্ট হইত। বহু নরনারী তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু তিনি শ্রীগুরুদেবের আদেশ পান নাই বলিয়া কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না—শিক্ষা মাত্র দিতে লাগিলেন। শহরের নানাস্থানেও সৎপ্রসঙ্গ, পাঠ, ভজন, কীর্তন নিত্যই চলিতেছিল—মহাপুরুষজী ঐ সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া সকলের ধর্মপিপাসা মিটাইতেন।

এইভাবে ঢাকাতে কিছুদিন রামকৃষ্ণবাণী প্রচার করিয়া ময়মনসিংহের ভক্তগণের একান্ত অনুরোধে নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাকে স্বামী অভেদানন্দসহ তথায় যাইতে হইল। তাঁহাদের শুভাগমনবার্তা চারিদিকে প্রচারিত হইবার ফলে দূর দূর স্থান হইতে বহু ধর্মজিজ্ঞাসু তাঁহাদিগের পুণ্যদর্শন ও সঙ্গলাভ করিবার জন্য আসিতে লাগিল। স্বামী অভেদানন্দ এক বিরাট জনসভায় শ্রীগুরুদেবের মহিমাকীর্তন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। দুই দিন পরেই তিনি কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু মহাপুরুষজী আরও কয়েকদিন তথায় থাকিয়া পুনরায় ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঢাকার ভক্তগণ এবার আরও ব্যগ্রভাবে মহাপুরুষজীকে দীক্ষার জন্য ধরিয়া বসিল। তাহাদের ব্যাকুলতায় তাঁহার প্রাণ খুবই আর্দ্র ও অস্থির হইয়াছিল। তিনি ঐ ভক্তগণের একটা উপায় করিয়া দিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের চরণে কাতর

প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। এতদিনে তাঁহার অন্তরাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কৃপাহস্ত উত্তোলন করিলেন। মহাপুরুষজী প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন, জগদ্গুরু যেন এই সকল মুমুক্ষু নরনারীর সাধনপথ নির্দেশ করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন। দীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে ঐ প্রকার প্রেরণা পাইয়া সংঘের নিয়মানুসারে মহাপুরুষজী সংঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সকল বিষয় জানাইয়া চিঠি লিখিলেন। রাখাল মহারাজ প্রত্যুত্তরে আনন্দ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছিলেন, "খুব দিন, প্রাণখুলে দীক্ষা দিন। আপনার কাছে যারা দীক্ষা পাবে তাদের তো জীবন ধন্য হয়ে যাবে।" এইভাবে ঠাকুরের নির্দেশ ও সংঘাধ্যক্ষের সম্মতি পাইয়া মহাপুরুষজী ঢাকাতে প্রায় একশত নরনারীকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।[১]

১ তিনি ঢাকাতে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে স্বামিজী, মহারাজ ও আমায় বলেছিলেন, 'কালে তোদের বহু লোককে দীক্ষা দিতে হবে।' আমি ঠাকুরকে বলেছিলাম যে আমি কিন্তু ওসব পারব না। শুনে ঠাকুর বললেন—'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। পরে দেখা যাবে—তুই এখন এত ভাবিস্ কেন?' ঠাকুরের কথা কি মিথ্যা হয়? সেই কতকালের কথা এতদিনে সত্য হল! কে জানত বাবা যে আমায় দীক্ষা দিতে হবে?"

যদিও ১৯০৯।১০ সাল হইতেই বহুভক্ত তাঁহাকে গুরুর আসনে বসাইয়া তাঁহার উপদেশানুসারে নিজেদের ধর্মজীবন গঠন করিতেছিল তথাপি মহাপুরুষজী ইতঃপূর্বে কাহাকেও আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রদীক্ষা দেন নাই। ঢাকাতেই তাঁহার প্রথম দীক্ষাদান। এই সম্বন্ধে তাঁহার এক পত্রে জানা যায়, "ঢাকাতে আমি প্রায় দেড় মাস ছিলাম। সেখানে অনেক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরেরর ইচ্ছায় তাঁহার নাম পাইয়াছে। সে সময় ঠাকুরের প্রেরণায় আমার ভিতরও একটা ভাব আসিয়াছিল।" কিন্তু তাহার পরে জনৈক দীক্ষাপ্রার্থীর পত্রের জবাবে তিনি বেলুড়মঠ হইতে ২৮।৬।২২ তারিখে লিখিয়া-ছিলেন, "দীক্ষা সম্বন্ধে ঠাকুরের এখন আর আমার উপর আদেশ নাই। আবার যখন হইবে—তখন বলিব।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই দিব্য প্রেরণার পূর্ণ পরিণতিতে মহাপুরুষজীর ভিতর দিয়া কিভাবে সহস্র সহস্র জীবন আধ্যাত্মিক সৌরভে আমোদিত হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে পাওয়া যাইবে।

কয়েকদিন পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কঠিন অসুখের সংবাদে সকলের প্রাণে যেন 'হরিষে বিষাদ' উপস্থিত হইল। সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইলেন, মহাপুরুষজীও গম্ভীর ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। একদিন রাত্রে ধ্যানান্তে তিনি বলিলেন, "মহারাজের কঠিন অসুখ, আমি আর এখানে থাকব না—কালই কলকাতায় যাব। সব ব্যবস্থা কর।" ঢাকায় আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল—মহাপুরুষজী কলিকাতায় ফিরিয়া অবিলম্বে মহারাজের রোগশয্যাপার্শ্বে উপনীত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "শিবানন্দ দাদা, এসেছ?" মহাপুরুষজী রোরুদ্যমানকণ্ঠে আবেগভরে বলিলেন, "মহারাজ, তুমি চলে গেলে আমরা কি করে থাকব? তুমি ইচ্ছা করলেই সেরে যাবে।" কলিকাতার সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণের চিকিৎসা, সেবকগণের প্রাণপাত সেবাদি সত্ত্বেও মহারাজের অসুখ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। মহারাজকে সুস্থ করিয়া তুলিবার জন্য সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাপুরুষজী চিরকালই মানুষ-বৈদ্যের চিকিৎসাতে খুব বেশী আস্থাসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "রাখে কৃষ্ণ, মারে কে? রাখবার মালিক একমাত্র ভগবান।" সেজন্য তিনি বলরাম-মন্দিরে বসিয়া নিত্য বহুক্ষণ গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট মহারাজের রোগমুক্তির প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। বলরাম-মন্দির হইতে ৩।৪।২২ তারিখে এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "এখন এখানেই আছি এবং মহারাজ যতদিন না উঠিয়া বসিতে পারেন ততদিন এখানেই থাকিব।"

কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। ব্রজের রাখালের নিত্যব্রজে

ফিরিবার সময় হইয়াছিল। ১০ই এপ্রিল, ১৯২২, রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র, স্বামিজীর আদরের 'রাজা', শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং অগণিত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণের ধন 'মহারাজ' মহা-সমাধিতে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিলেন।[১] পরদিবস নানা ঐশভাবের বিলাস-ভূমি তাঁহার পূতদেহ শত শত শোকাকুল সাধু ও ভক্তগণ-কর্তৃক বাহিত হইয়া বেলুড়মঠে গঙ্গাতীরে পবিত্র অগ্নিতে সমর্পিত হইল।[২]

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অভাব অপূরণীয়। স্বামিজীর দেহত্যাগের পর হইতে বিশ বৎসর কাল তিনি রামকৃষ্ণসংঘের পিতৃস্থানীয় ছিলেন। মঠ ও মিশনের বিস্তার ও পুষ্টিসাধনে তাঁহার অবদান যেমন অসাধারণ, তেমনই নিবিড় ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব সাধু ও ভক্তমণ্ডলীর উপর। মহাপুরুষজী মহারাজের নির্দেশকে ঠাকুরের নির্দেশ বলিয়াই গণ্য করিতেন। কি আধ্যাত্মিক, কি লৌকিক—ছোট-বড় সকল ব্যাপারেই মহারাজের সিদ্ধান্তই তাঁহার কাছে ছিল চূড়ান্ত। মহারাজের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মহারাজের শিষ্য এবং সেবক-বৃন্দকেও তিনি কী প্রীতির চক্ষে দেখিতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়!

১ মহারাজের দেহত্যাগের তিন দিন পূর্বে গভীর রাত্রে ধ্যানকালে মহাপুরুষজী ঠাকুরের দর্শন পাইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজের রোগমুক্তির কাতর প্রার্থনা জানাইতেই ঠাকুর মুখ ঘুরাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মহাপুরুষজীও পুনরায় খুব ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন। এইভাবে সেইরাত্রে তিন তিন বার ঠাকুরের গম্ভীর ও মৌন আবির্ভাব এবং রোগমুক্তির প্রার্থনায় কোন সাড়া না দিয়া মুখ ঘুরাইয়া মহারাজের অন্তর্ধান হওয়াতে মহাপুরুষজী স্থির বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঠাকুর তাঁহার মানসপুত্রকে আর মর্ত্যধামে রাখিবেন না। পরদিন জনৈক সেবককে হতাশপ্রাণে সজলনয়নে মহাপুরুষজী ঐ ঘটনা বলিয়াছিলেন।

২ সেই স্থানটির উপরই বর্তমান 'ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিমন্দির' নির্মিত হইয়াছে।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল একই আদর্শে অনুপ্রাণিত ও একপ্রাণ হইয়া একসঙ্গে বাস, কত উচ্চ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব-বিনিময়, আবার কত হাস্য-পরিহাস-আনন্দ, জীবনের প্রতি সমস্যার সুচিন্তিত সমাধান, 'মহারাজ তো আছেন' এই ভাবিয়া সর্ব বিষয়ে একান্ত নিশ্চিন্তভাব—এখন এ সকলেরই অভাবে মহাপুরুষজীর হৃদয়ের গভীর শূন্যতাবোধ আমরা সকলেই অনুমান করিতে পারি। "বড় মহারাজের দেহত্যাগের পর হইতে আমরা বড়ই মর্মাহত হইয়া পড়িয়াছি। কোন কাজকর্মে উৎসাহ ও উদ্যম একেবারে নাই"—ইহাই মহাপুরুষজীর মানসিক অবস্থার অস্পষ্ট ছবি।

উপস্থিত কর্তব্য—সকলের শোকসন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনার শীতল স্পর্শ আনিয়া দেওয়া। নিজের দুর্দমনীয় শোকাবেগ চাপিয়া মহাপুরুষজী সকলকে নানাভাবে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। মহারাজের বাস্তব স্বরূপ কি, তিনি যে দিব্যদেহে এখন আরও নিবিড়ভাবে সকলের কল্যাণবিধানে তৎপর—ইত্যাদি বিষয়ে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সকলকে আরও তীব্রভাবে শ্রেয়ঃসাধনে ব্রতী করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে লিখিত তাঁহার একখানি চিঠিতে জানা যায়, "ভগবানের স্মরণ-মনন সর্বদা করিলে মনে কিছুতেই নৈরাশ্য আসে না। মহারাজ দেহত্যাগ করিলেন; আমরা সকলেই দেহত্যাগ করিব, যাহার দেহ হইয়াছে সকলেই তাহা ত্যাগ করিবে—এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মহারাজ প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ যাঁহারা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়াছেন সকলেই দিব্য-শরীরে প্রভুর দিব্যরাজ্যে বর্তমান আছেন—ইহা নিশ্চয়। প্রভুকে ভাবিলে, তাঁহার স্মরণ-মনন করিলে প্রভু তো প্রীত হইবেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পার্শ্ববর্তী ভক্তেরাও প্রীত হন—ইহা নিশ্চয় জানিবে।"

সংঘাধ্যক্ষরূপে

স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর স্বামী শিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মনোনীত হইলেন১ (২রা মে, ১৯২২)। কত দীনভাব লইয়া তিনি ঐ বিরাট দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানিত পদে আসীন হইয়াছিলেন, তাহার আভাস তাঁহারই সামান্য কয়টি কথায় পাওয়া যায়—"আমি তো তাঁর (মহারাজের) চাকর—তাঁর পাদুকা মাথায় করে এখানে বসে আছি। ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যশাসন করেছিলেন, আমিও তেমনি মহারাজের পাদুকা মাথায় করে তাঁর কাজ চালাচ্ছি—তিনি যেমন বুদ্ধি দেন তেমন করছি।" কি অদ্ভুত নিরভিমানিত্ব! এই অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়া শিবানন্দের ভিতরকার স্বরূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অহংভাবরাহিত্যই শিবানন্দ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধুর্য। উক্ত প্রকার দৃষ্টি ও মনোভাব লইয়া তিনি

১ ১৯০১ সালে যখন বেলুড় মঠের ট্রাষ্ট ডিড্ রেজিষ্টারী হয়, তখন স্বামিজী শিবানন্দকে অন্যতম ট্রাষ্টী নির্বাচিত করিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে ৪ঠা মে 'রামকৃষ্ণ মিশন' রেজিষ্টারী হয় এবং ১৯১০ সালের ২৫শে আগষ্ট মহাপুরুষজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ হন। ১৯২২ সালের মার্চ মাসের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৮ সালে স্বামী প্রেমানন্দ দেহরক্ষা করিলে মিশনের কোষাধ্যক্ষের পদও তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। দুই বৎসর তিনি ঐ পদে ছিলেন। ১৯২৩ সালের মার্চ হইতে মে পর্যন্ত মিশনের হিসাবরক্ষার কার্যও তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল।

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল সংঘের প্রধান সেবকরূপে অক্লান্তভাবে কাজ করিয়াছিলেন।

দেশের জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া ভক্তমণ্ডলী স্বামী ব্রহ্মানন্দের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিপ্রদানের জন্য স্থানে স্থানে স্মৃতিসভার আয়োজন করিতেছিলেন। ঐ কার্যোপলক্ষে বসিরহাটের অধিবাসিবৃন্দ-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মঠের কতিপয় সন্ন্যাসিসহ মহাপুরুষজী ১৩ই মে (১৯২২) তথায় গমন করেন। ১৫ই মে বসিরহাট বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে তাঁহার সভাপতিত্বে ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি-সভার এক বিরাট অধিবেশন হয়। মহা-পুরুষজীর উপস্থিতে ঐ অঞ্চলের ভক্তদের প্রাণে খুবই উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার নির্দেশে বসিরহাটে স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকল্পে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় অথবা ধর্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানেও তিনি ভগবৎ-প্রসঙ্গ এবং রাখাল মহারাজের পূত জীবনকথা কীর্তন করিয়া সকলের প্রাণ ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত করেন। অতঃপর স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মস্থান সিকরাকুলীনগ্রাম দর্শন করিয়া ১৭ই মে মহাপুরুষজী মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

পরবর্তী রবিবার, ২৮শে মে সিকরাগ্রামে ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি-উৎসব হয়। ঐ উৎসবে মহাপুরুষজী শারীরিক অসুস্থতার জন্য যোগদান করিতে পারেন নাই, কিন্তু বেলুড় মঠ হইতে এগারজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের কয়েকমাস পরেই কাশীতে স্বামী তুরীয়ানন্দ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অবিলম্বে কলিকাতা হইতে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক প্রেরিত হইল। হরি মহারাজের অসুখের

সংবাদে মহাপুরুষজী অতিশয় গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "এ যাত্রায় হরি মহারাজ থাকেন কিনা সন্দেহ। সবই প্রভুর ইচ্ছা।" রাখাল মহারাজের দেহত্যাগের খবর শুনিয়া বেদনাভরা প্রাণে তুরীয়ানন্দ নিজেও বলিয়াছিলেন, "এ শরীরও আর এক বৎসরের বেশী থাকবে না।" এখন তাঁহার কঠিন পৃষ্ঠব্রণ অতীব বিষাক্ত হইয়া দিন দিন আরোগ্যের বাহিরে যাইতেছিল দেখিয়া সকলেই খুব হতাশ হইয়া পড়িলেন। মহাপুরুষজী প্রতিদিন হরি মহারাজেরও খবরের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন। প্রতিকারের সকল চেষ্টা ও আশা ব্যর্থ হইল; স্বামী তুরিয়ানন্দ জীর্ণ দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপদে মিলিত হইলেন। বেলুড় মঠ হইতে লিখিত মহাপুরুষজীর ২৬।৭।২২ তারিখের পত্রে জানা যায়—"আমাদের হরি মহারাজ গত শুক্রবার ২২শে জুলাই সন্ধ্যা প্রায় ৭ টার সময় পূর্ণজ্ঞানের সহিত বৈদিক মহাবাক্য ও শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আনন্দে মহাসমাধিতে লীন হইয়াছেন। স্থূল দেহের এই পরিণাম—দেহ সকলেরই নশ্বর। ···বুঝিতেই পারিতেছ আমাদের মনের ভিতরকার অবস্থা আজকাল কিরূপ। অবশ্য প্রভু চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন—ইহা ধ্রুব সত্য, নতুবা আমরা এতদিন থাকিতাম না।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের অনন্যসাধারণ ত্যাগবৈরাগ্য ও তপস্যাময় জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সাধু ও ভক্তমণ্ডলীর উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার অভাব সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষজী হরি মহারাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে অনেক কথাই বলিতেন। বেলুড় মঠে একবার হরি মহারাজের জন্মদিনে বলিয়াছিলেন,

—"হরি মহারাজ মহাপুরুষ লোক—শুকদেবের মত শুদ্ধসত্ত্ব, পবিত্র আর জ্ঞানী ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই গীতা, উপনিষদ্, বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ খুব পড়তেন—এসবই তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি মহাধ্যান-পরায়ণ, নির্জনতাপ্রিয়, যোগী ও তপস্বী পুরুষ ছিলেন। স্বামিজী ওঁকে একরকম জোর করে আমেরিকায় নিয়ে গেলেন। উনি যেমন নিষ্ঠাবান—সহজে কি যেতে চান? তবে স্বামিজীকে খুব ভালবাসতেন কিনা, তাই তাঁর কথা ফেলতে পারলেন না। তাঁর জীবনে এতটুকুও দোষ নেই—সবই গুণ; পূত, পবিত্র জীবন। যোগ, জ্ঞান, ভক্তি—সমস্তই তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল।"

অল্পকালের মধ্যে পর পর স্বামী প্রেমানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের তিরোধানে সাধু-ব্রহ্মচারী ও অগণিত ভক্ত নরনারীর প্রাণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, মহাপুরুষজীকে এখন অনেকাংশে সেই শূন্যস্থান পূরণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর যেন তাঁহার হৃদয়-মন অদ্ভুতভাবে রূপান্তরিত করিয়া দিতেছিলেন। প্রেমানন্দের প্রেম, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা ও স্নেহ এবং ব্রহ্মানন্দের গভীর আধ্যাত্মিকতা ও আকর্ষণী শক্তি তাঁহার ভিতর ক্রমশঃ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। মহাপুরুষজীর কিন্তু 'যন্ত্র-যন্ত্রি'-ভাবের এতটুকু ব্যতিক্রম নাই। "তিনি পাকা খেলোয়াড়—কানাকড়ি দিয়ে বাজীমাত করে দিতে পারেন। আমার কি আছে? না বিদ্যা-বুদ্ধি, না বলতে-কইতে পারি, না দেখতে-শুনতে ভাল, অথচ তিনি এই যন্ত্রটা দিয়ে তাঁর কাজ করে নিচ্ছেন"—এই বুদ্ধিতে শ্রীগুরুপদে আত্মনিবেদন করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু তাঁহার হৃদয়ে যেমন প্রেরণা দিতেন তিনি সেই ভাবে কাজ করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে

লাগিলেন। ইহাতে নিজের যে কোনপ্রকার কৃতিত্ব আছে, সে ভাব তাঁহার মনের কোণেও স্থান পাইত না। তাঁহার 'অহং'-এর স্থান অন্তর্বহিঃ শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন।

এখন হইতে তিনি সযত্নে সকলের সর্ববিধ বেদনা কোমল হস্তে অপসারিত করিয়া অকাতরে অমৃতবারি-সিঞ্চনে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। কি নবীন, কি প্রবীণ—মঠের প্রতি অঙ্গের ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ ও সুখ-দুঃখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া তিনি প্রয়োজনমত প্রত্যেকের সকল প্রকার অভাব মিটাইতে যত্নপর ছিলেন। সন্তানপ্রতিম সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগের ধর্মজীবন-গঠনে সতর্ক দৃষ্টি ও আপ্রাণ চেষ্টা, সপ্রেম ব্যবহার ও সেবাযত্নাদি, ভক্তগণের বিরহবিধুর প্রাণে সান্ত্বনাদান এবং নূতন নূতন জিজ্ঞাসুকে আধ্যাত্মিক পথে সহায়তা প্রভৃতি তাঁহার নিত্যকর্মে পরিণত হইল; আর তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল ঠাকুরের ভাবপ্রচার এবং স্বামিজী-প্রবর্তিত নানা জনহিতকর কর্মের প্রসার।

স্বামী অদ্ভুতানন্দের স্মৃতিকল্পে কাশী অদ্বৈতাশ্রমে মহাবীরের মন্দির ও স্মৃতিভবনের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে তত্রস্থ সাধু ও ভক্তবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে উহাদের প্রতিষ্ঠাকার্যের জন্য মহাপুরুষজী ১৯২৩ সালের জানুয়ারীর শেষভাগে কাশীযাত্রা করেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সনির্বন্ধ আমন্ত্রণে প্রথমে এলাহাবাদে গিয়া তথাকার আশ্রমে তিন-চারি দিন অতিবাহিত করিলেন। এলাহাবাদে অনেক ভক্ত ঐ সময় তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষালাভে ধন্য হন। একদিন ভক্তদিগের আগ্রহে তাঁহার ঝুসিতে তপস্যার কাহিনীও তিনি বলিয়াছিলেন। আর এক দিন নৌকাযোগে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সহিত ত্রিবেণীসঙ্গম দর্শন করিতে যান।

মহাপুরুষ শিবানন্দ

কাশী অদ্বৈতাশ্রমে মাঘী পূর্ণিমার দিন[১] (১৯২৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী) বিশেষ পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠানের পর মহাপুরুষজী স্বামী অদ্ভুতানন্দ-স্মৃতিভবন ও মহাবীর-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। সেই উপলক্ষে কনখল, পাটনা প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে অনেক সাধু ও ভক্ত কাশীতে সমবেত হন। অদ্বৈতাশ্রমে কয়েকদিনব্যাপী আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। স্বামী সারদানন্দও সেই সময়ে কাশীতে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই। স্মৃতিভবন-প্রতিষ্ঠার দিন মহাপুরুষজী কয়েকজন প্রার্থী ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

নিয়মিত ব্যায়ামাদি দ্বারা সকলে যাহাতে দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয়, সে বিষয়ে মহাপুরুষজীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং শরীরচর্চার জন্য সকলকে তিনি বিশেষরূপে উৎসাহিত করিতেন। কাশী সেবাশ্রমে ঐ সময়ে একটি ব্যায়ামাগার ছিল, অনেকেই কসরত ইত্যাদি করিতেন। মহাপুরুষজী একদিন আশ্রমবাসিগণের কুস্তি দেখিতে গিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শিবক্ষেত্রে মহাপুরুষজীর আগমনে এবং বহু সাধুসমাগমে উভয় আশ্রমের সাধুবৃন্দ ও স্থানীয় ভক্তগণ খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনিও গঙ্গাস্নান, ৺বিশ্বনাথদর্শন, আশ্রমে ভজন-কীর্তন ও ভগবৎ-প্রসঙ্গাদিতে কয়েকদিন অতীব আনন্দে কাটাইয়া স্বামী কল্যাণানন্দের বিশেষ আগ্রহে কনখল গমন করেন। কনখল পৌঁছিবার দুই-তিন দিন

---

১ স্বামী অদ্ভুতানন্দ ১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল কাশীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জন্মের সন বা তারিখ কাহারও জানা ছিল না। মহাপুরুষজীর নির্দেশে তখন হইতে মাঘী-পূর্ণিমার দিনেই তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

পরেই খুব বৃষ্টি হইয়া নিকটস্থ উচ্চপর্বতশিখর বরফে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। সেই বরফ দেখিয়া মহাপুরুজীর কী আনন্দ! হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "অনেক বৎসর বরফ দেখতে পাই নি, তাই ৺কৈলাসপতি তাঁর শুভ্র রূপ দেখিয়েছেন। আহা! কি সুন্দর! বরফ না থাকলে কি হিমালয় মানায়?"

একদিন তিনি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে যান। কুণ্ডের তীরে দাঁড়াইয়া খুব ভক্তিগদগদচিত্তে গঙ্গাকে প্রণাম ও স্তব করিয়া কুণ্ডের জল স্পর্শ করেন। পরে বলিয়াছিলেন, "আমরা যখন এসব স্থানে তপস্যা করতাম তখন এদিকটা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও মহানির্জ্জন ছিল—নিকটে জনমানব কোথাও দেখা যেত না। এখন তো সব সহরের মতন হয়ে গেছে—আগেকার সেই নির্জ্জনতা আর নেই।"

কনখল, ভীমগোড়া ও হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে তপস্যারত মঠের সাধুবৃন্দও মহাপুরুষজীর সঙ্গলাভের জন্য কনখলে আসেন। তিনি কনখলে কয়েকজনকে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দিয়াছিলেন। কনখলে পাঁচ-ছয় দিন কাটাইয়া মহাপুরুষজী শিবরাত্রির পূর্বে পুনরায় কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সেবার অদ্বৈতাশ্রমে ৺শিবরাত্রি খুবই জমিয়াছিল। চারি প্রহরে শিবের চারি পূজা এবং সারারাত্রি সমবেত সাধুবৃন্দের তন্ময় শিবনামগুণগান, তাণ্ডবনৃত্য আর হর হর বোম্ বোম্ ধ্বনিতে আশ্রম যেন কৈলাসপুরীতে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-পূজার দিন সকালে মহাপুরুষজী বেলুড় মঠে পৌঁছিলেন। মঠে সারাদিন বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, ভজন-কীর্তন, ভোগরাগ, ভক্তসমাগম ও প্রসাদবিতরণ চলিয়াছিল। সারারাত্রি কালীপূজার পর ব্রাহ্মমুহূর্তে বিরজাহোমানলে মহাপুরুষজী বার জনকে

পবিত্র সন্ন্যাসধর্মে এবং কয়েক জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন। পরবর্তী রবিবার সাধারণ উৎসব। সকলেই প্রাণমন ঢালিয়া ঐ বিরাট উৎসবকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নানা আয়োজনে ব্যস্ত। দেখিতে দেখিতে মঠপ্রাঙ্গণ একটী ক্ষুদ্র শহরে পরিণত—চারিদিক 'জয় গুরু মহারাজজীকী জয়' ধ্বনিতে মুখরিত, সর্বত্রই কর্মচাঞ্চল্য; কিন্তু উৎসবের পূর্বরাত্রি হইতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া পর দিন সকাল পর্যন্ত সমভাবে চলিতেছিল। উৎসবের রন্ধনশালায়ও জল প্রবেশ করিয়া রন্ধনাগ্নি নির্বাপিত হইবার উপক্রম। চারিদিকেই একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল—সকলেরই মুখে একটা বিষাদের কালিমা। মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে মহাপুরুষজীর ঘরে সমবেত হইলেন এবং 'কি করা যায়' তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মুহূর্তকাল ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া বৃদ্ধ তাপস মৃগচর্মের আসনখানি বগলে করিয়া জপমালাহস্তে ধীরে ধীরে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন; তথায় হৃদয়দেবতার চরণে কোন্ প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন তাঁহার মূর্তি যে দেখিয়াছে তাহারই স্মৃতিপটে উহা গভীরভাবে চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। মুখে-চোখে একটা স্বর্গীয় আভা, আর প্রাণের আবেগে ভাগবত হইতে—

'বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।

বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥' ইত্যাদি গুন গুন করিয়া গাহিতে গাহিতে ঠাকুরঘর হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। "বিষময় কালীয়-হ্রদজল ব্যালরাক্ষস, ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘবর্ষণ, ঝঞ্ঝা-

বাত ও বজ্রাগ্নি প্রভৃতি বিবিধ ভয় হইতে বারংবার তুমি ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছ। এখন এ আসন্ন বিপদ হইতে আমাদিগকেও ত্রাণ কর"—ইহাই বোধ হয় তাঁহার মনের ভাব। পরক্ষণেই নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া উৎকন্ঠিত সকলকে আশ্বাস দিয়া সুদৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "উৎসবের আয়োজন যেমনটি হচ্ছে ঠিক তেমনই করে যাও। তাঁর ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে।" তাঁহার সেই অভয়বাণী-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি গগন ছাইয়া ফেলিল। আর অত বড় দৈবদুর্বিপাকও ক্রমে শান্ত হইয়া গেল। উৎসব সেইবার নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। উৎসবান্তে সন্ধ্যাবেলায় মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর আজ যে বিভীষিকা দেখিয়েছিলেন, তাতে আমারই প্রথমটায় খুব ভয় হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টিটা হয়ে একদিকে বরং ভালই হয়েছে—গরমে লোকের তত কষ্ট হয় নি।"

ভুবনেশ্বর মঠে প্রতিমায় ৺বাসন্তীপূজা করিবার বিশেষ ইচ্ছা রাজা মহারাজের ছিল; কিন্তু ১৯২২ সালে মার্চ মাসের শেষভাগে তাঁহার কঠিন অসুখ এবং কয়েকদিন পরেই দেহত্যাগ হওয়ায় সেই বৎসর উহা ঘটিয়া উঠে নাই। সকলের সমবেত চেষ্টায় এবার (১৯২৩) স্বামী ব্রহ্মানন্দের ঈপ্সিত দেবী-আরাধনার আয়োজন হইতে লাগিল। ঐ ৺বাসন্তীপূজা এবং ভুবনেশ্বর মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহাপুরুষজী বেলুড় মঠ হইতে প্রায় চল্লিশ জন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীসহ তথায় গমন করেন। কলিকাতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র হইতেও বহু সাধুভক্তের সমাগম হইয়াছিল। এতজন সন্ন্যাসীর সম্মিলনে, বিশেষ করিয়া মহাপুরুষজীর উপস্থিতে ভুবনেশ্বর মঠে একটা জমজমাট পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি হইল। প্রাকৃতিকশোভাসমৃদ্ধ ঐ পবিত্র শিবক্ষেত্রে দাক্ষায়ণীর পূজা

খুব মানাইয়াছিল। পূজোপকরণের কোন ত্রুটি নাই, ৺মায়ের প্রতিমাখানিও অতি সুন্দর এবং দেবীভাবপূর্ণ, পূজাদিও এমন সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে, তাহা ভুবনেশ্বরের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পূজা-পাঠ, ভজন-কীর্তন, ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণের পরিতোষসহ সেবাদিতে মঠ বিরাট উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তিন দিন রথযাত্রার জনস্রোতের ন্যায় বহু দূর দূর স্থান হইতে দর্শকবৃন্দ পুণ্যবাসরে পূজোৎসবে যোগদান করিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইল। সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন যে রাজা মহারাজই আবির্ভূত হইয়া সকলের প্রাণে যেন এক অপার্থিব আনন্দের মন্দাকিনী-স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের যেমনটি ইচ্ছা ছিল এবং তিনি যাহা যাহা ভালবাসিতেন, তাঁহার পুণ্য উপস্থিতি স্মরণ করিয়া সে সমুদয়ের, এমন কি আমোদ-প্রমোদ-কৌতুকাদিরও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মহাষ্টমীর দিন বিশেষ পূজানুষ্ঠানের পর মহাপুরুষজী শুভক্ষণে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুকে নূতন মন্দিরে স্থাপন করেন। তিনি নবমীর দিন শ্রীমন্দিরে একাসনে বসিয়া বাইশ জন প্রার্থীকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন। আড়াই ঘণ্টা পর দীক্ষান্তে যখন ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তিনি যেন একটি নেশায় টলিতেছিলেন—চক্ষু নিমীলিত, মুখমণ্ডল রক্তিমাভ, জোর করিয়া যেন বাহিরের দিকে চাহিতেছেন! সেই ভাব সামলাইতে তাঁহার অনেকক্ষণ লাগিয়াছিল। "পূজার কয় দিন ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণে প্রায় সাত হাজার লোক প্রসাদ পাইয়াছিল।"

একাদশীর দিন একজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিলেন।

ঐ বিরজাহোমানুষ্ঠানে আচার্য ছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। ভুবনেশ্বর মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবন্ত উপস্থিতি নিবিড়ভাবে অনুভব করিয়া সেই সময় মহাপুরুষজী সর্বসমেত প্রায় দেড় মাস কাল তথায় মহানন্দে বাস করেন; বহু ভক্ত তাঁহার আধ্যাত্মিক স্পর্শে ধর্মজীবন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। কোন কোন দিন তিনি ভুবনেশ্বর-মন্দির দর্শন করিতে যাইতেন এবং প্রতিদিন রামেশ্বর শিবমন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিতেন। ঐ স্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁহার এক চিঠিতে জানা যায়—"ভুবনেশ্বর সাধন-ভজনের খুব অনুকূল স্থান। যে কয়দিন থাকিতে পারিবে ভালই হইবে।" মে মাসের প্রথম ভাগে মহাপুরুষজী বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

ঐ সময়ে কলিকাতার শাখাকেন্দ্রগুলি হইতে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে আশ্রমসকল পরিদর্শন করিতে যাইতেন। ১৯২৩ সালের শেষভাগে ৺জগদ্ধাত্রীপূজোপলক্ষে পাঁচ দিনের জন্য ভবানীপুর গদাধর আশ্রমেও গিয়াছিলেন।

সংঘের প্রত্যেক সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি মহাপুরুষজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদিকে তিনি যেমন সাধুগণকে উৎসাহ দিয়া 'জগদ্ধিতায়' কর্মে প্রণোদিত করিতেন, অন্যদিকে 'আত্মনো মোক্ষার্থং' সকলের জীবনগতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া যোগ ও কর্মের মিলনভূমিরূপে ভজন-সাধন এবং সেবার সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনগঠনের দিকেও লক্ষ্য রাখিতেন। সকলের ভিতরই কর্মের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, সেই কর্ম যাহাতে আত্মশোধনের সাধনায় রূপান্তরিত হয়, সেজন্য তিনি জনৈক কর্মীকে লিখিয়াছিলেন, "ভাদ্রমাসে collectionএ (অর্থ-সংগ্রহে) যাইতে হইবে, উত্তম কথা। যেথানেই যাও নিজের জপ-ধ্যান কখনই ছাড়িবে

না—সেটি করা চাই-ই চাই।" অপর কর্মীকে—"তোমার জপ-ধ্যানের সময়টা ঠিক রাখা উচিত—কারণ উহাই শক্তি। জপ-ধ্যানের সময় কমাইলে চলিবে না।" তাঁহার শিক্ষা তপস্বীকে ঠিক ঠিক তপস্বী এবং কর্মীকে প্রকৃত কর্মিরূপে গড়িয়া তুলিত।

চিত্তশোধনের উপায়ভূত নিষ্কাম কর্ম করিবার জন্য মনকে কি ভাবে গঠন করিতে হইবে, কাশীতে জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী—মহারাজ, আমার মনে হয়, আমাদের এখন কাজের চেয়ে ধ্যান-জপের উপর বেশী জোর দেওয়া উচিত।

মহাপুরুষজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ধ্যান-জপের importance (প্রাধান্য) অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কাজের কথা বলছ? ধ্যান-জপ বাদ দিয়ে ঠাকুর-স্বামিজীর ideal (আদর্শ) অনুযায়ী কাজ can never be done (কখনও করা যেতে পারে না)। Work and worship (কর্ম ও উপাসনা) একসঙ্গে চালাতে হবে।" 'Can never be done'—এই কথা কয়টি এমন জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যেন পর্বত টলিয়া যায়।

স্বামিজীর সমাধিমন্দিরের নির্মাণকার্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন। সকলের সমবেত চেষ্টায় ব্রহ্মানন্দের আরব্ধ কর্ম এই বৎসর (১৯২৩) সমাপ্ত হইল। স্বামিজীর পূতদেহ যে স্থানে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল, পরে সেই স্থানে একটি ছোট গর্ভমন্দির নির্মিত হয় এবং সেই গর্ভমন্দিরকে বেষ্টন করিয়া তাহারই উপর স্বামিজীর বর্তমান স্মৃতিমন্দির নির্মিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরের দ্বিতলে হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রতীক 'ওঁকার' স্থাপিত। ১৯২৪ সালে ২৮শে জানুয়ারী

স্বামিজীর দ্বিষষ্টিতম জন্মতিথিতে বিপুল জনতার সমক্ষে মহাপুরুষজী ঐ ওঁকারমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ উপলক্ষে সারা দিন-রাত্রি নানাবিধ পূজা-পাঠ, হোম, ভজন-কীর্তনাদি চলিয়াছিল এবং স্বামিজীর পরমপ্রিয় বহু সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান হইয়াছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের সমাধিস্থানেও একটি মন্দিরের নির্মাণকার্য ঐ বৎসর সমাপ্ত হয়। পরবর্তী মাঘী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৪) বৃহস্পতিবার স্বামী ব্রহ্মানন্দের শুভ জন্মতিথি-উৎসবের দিন মহাপুরুষজী ঐ সমাধিমন্দিরের দ্বারোদঘাটন করিয়া ব্রহ্মানন্দের মানুষ-প্রমাণ মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই দিন অহোরাত্র আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দের ব্যবহৃত জিনিষ-পত্রাদিও মন্দিরের দ্বিতলে রক্ষিত হয় এবং সেই দিন হইতে নিয়মিতভাবে তথায় সেবা-পূজাদি চলিতে থাকে।

* * *

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শর্বানন্দের সহিত মহাপুরুষজী ৭ই এপ্রিল (১৯২৪) মাদ্রাজ যাত্রা করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্য, নিউইয়র্ক বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বোধানন্দ এবং কতিপয় সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পথে ভুবনেশ্বর মঠে দুই দিন সকলে বিশ্রাম করিয়া তৃতীয় দিন সকালবেলা মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে তাঁহারা ওয়ালটেয়ারে চার দিন বিশ্রাম করেন। ওয়ালটেয়ারের ভক্তগণ মহাপুরুষজীকে রাজোচিত সম্মানে সম্বর্ধনা করিয়া সমুদ্রতীরস্থ একটি নূতন বাড়ীতে পরমযত্নসহকারে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শুভাগমন উপলক্ষে একদিন একটি সভার আয়োজন হয়। সঙ্গী

সন্ন্যাসিগণসহ মহাপুরুষজী ঐ সভায় উপস্থিত হইলেন এবং সমবেত জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিয়া স্বামী শর্বানন্দকে 'যুগবাণী' ব্যাখ্যা করিবার আদেশ দিলেন। শর্বানন্দ প্রায় একঘন্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। পরদিবসও একটি সভার আয়োজন হইয়াছিল। উহাতে মহাপুরুষজীর আদেশে স্বামী বোধানন্দ 'সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দেন। মহাপুরুষজীর পুণ্য সান্নিধ্যলাভের ইচ্ছায় ওয়ালটেয়ারের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিদিন তাঁহার নিকট সমবেত হইতেন। তিনিও যথোচিত ধর্মালোচনা দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করিতেন।

ওয়ালটেয়ার হইতে এগার মাইল দূরবর্তী পাহাড়ের উপর অতি মনোরম ও নির্জন প্রদেশে 'সিংহাচলম্'-মন্দির অবস্থিত। প্রধান উপাস্যদেবতা নরসিংহদেবের আকর্ষণে প্রতি বৎসর দূর দূর স্থান হইতে শত শত যাত্রী দেবতার চরণে প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য ঐ নির্জন পাহাড়ের শীর্ষদেশে সমবেত হইয়া থাকেন। মহাপুরুষজী ঐ দেববিগ্রহ দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভক্তগণ সানন্দে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। মন্দিরের পাদদেশ হইতে প্রায় এক সহস্র সোপান অতিক্রম করিয়া পাহাড়ে উঠিতে হয়। ওয়ালটেয়ার-বাসের চতুর্থ দিন সকালবেলা সঙ্গী সন্ন্যাসিগণসহ মোটরগাড়ীযোগে মহাপুরুষজী যখন মন্দিরের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন তখন দেখা গেল যে, পূর্ব ব্যবস্থা মত তাঁহাকে উপরে লইয়া যাইবার 'সিডন্ চেয়ার' সহ বাহকগণ আসিয়া পৌছায় নাই। ইহাতে সকলেই একটু হতাশ হইয়া পড়িলেন। মহাপুরুষজীর আদেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেববিগ্রহ-

দর্শন করিবার জন্য রওনা হইলেন। তিনি পাহাড়ের পাদদেশে বিশ্রামাগারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলকে উপরে যাইবার নির্দেশ দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা, নরসিংহদেবের ইচ্ছা হয় তো তিনি এখানেও দর্শন দিতে পারেন।" কিয়ৎক্ষণ পরেই 'সিডন চেয়ার' আসিয়া গেল এবং তাঁহাকে উপরে মন্দিরাভিমুখে লইয়া চলিল। পূর্ব বৎসর ঐ অঞ্চল ঘূর্ণিবায়ুবিধ্বস্ত হওয়ায় মন্দিরে উঠিবার সোপানাবলী সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল—অতিকষ্টে তাঁহাকে পাহাড়ের চূড়ায় লইয়া যাওয়া হইল। তখন শ্রীবিগ্রহের পূজা হইতেছিল, প্রধান পূজারী সসম্মানে তাঁহাকে বিগ্রহদর্শন করিতে লইয়া গেলেন। শ্রীবিগ্রহের প্রকাশ, মন্দিরের গাম্ভীর্য এবং উচ্চভাবোদ্দীপক প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী ঐ স্থানটিকে মহাজাগ্রত তীর্থে পরিণত করিয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই মহাপুরুষজীর অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পরে বলিয়াছিলেন, "দেখলাম, যেন পুরুষসিংহ দাঁড়িয়ে আছেন।" সেদিন প্রধান পূজারী সযত্নে অন্যান্য দেববিগ্রহ দর্শন করাইয়া সকলকে উত্তম প্রসাদ পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়াছিলেন।

চারি দিন তথায় আনন্দে কাটাইয়া পঞ্চম দিনে সকলে মাদ্রাজ যাত্রা করেন। অনেক ভক্ত পুষ্পমাল্যাদিসহ মহাপুরুষজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মাদ্রাজ হইতে কয়েক ষ্টেশন অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। আহা! ভক্তগণের কী গভীর শ্রদ্ধা! মানুষপ্রমাণ বড় বড় সুন্দর সুরভি গোলাপফুলের গোড়ে মালা দিয়া তাঁহারা মহাপুরুষজীকে দেববিগ্রহের ন্যায় সাজাইলেন। নানা জাতীয় ফুলের তোড়া ও ফলমিষ্টান্নাদিতে তাঁহার কামরা পরিপূর্ণ, আর ভক্তগণ করজোড়ে দণ্ডায়মান। মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে গাড়ী আসিলে সাধুভক্তবৃন্দ আনন্দে উচ্চ জয়ধ্বনি

করিয়া তাঁহাকে ষ্টেশনের বাহিরে লইয়া গেলেন। ৬ই এপ্রিল বুধবার মহাপুরুষজী মাদ্রাজ মঠে পৌছিলেন। তাঁহার শুভ পদার্পণে তথায় আনন্দোৎসব লাগিয়া গেল। নিত্য ধর্মপ্রসঙ্গ, ভজন এবং সাধুভক্ত-সমাগমে মঠ মুখরিত। মাদ্রাজ শহরের বহু বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তি এইবার মহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে বসিয়া আশা ও আনন্দের বাণী শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি কোন কোন স্থানে ধর্মালোচনাদিতেও যোগ দিতে যাইতেন। অনেকে তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষালাভেও ধন্য হইল। মাদ্রাজ মঠে তিন জন ব্রহ্মচারীকে তিনি সন্ন্যাসও দিয়াছিলেন।

মাদ্রাজ প্রদেশের জনৈক রাজকুমার একদিন মহাপুরুষজীকে দেখিতে আসেন। রাজকুমার সাধারণভাবে হাতজোড় করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে মহাপুরুষজী যথোচিত মর্যাদার সহিত রাজকুমারকে চেয়ারে বসাইয়া ধর্মপ্রসঙ্গাদি করিলেন। কয়েকদিন যাতায়াতের ফলে সেই রাজকুমার মহাপুরুষজীর পুণ্যসঙ্গলাভে এতই অভিভূত হইয়াছিলেন যে, একদিন তিনি (মহাপুরুষজীর বারণ সত্ত্বেও) তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন। পরে তিনি মহাপুরুষজীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে মহাপুরুষজী সাধুগণসহ কোন কোন ভক্তগৃহে উৎসবানন্দ করিতে যাইতেন। তাঁহাকে নিজ নিজ ভবনে পাইয়া ভক্তগণ আপনাদিগকে কতটা কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন তাহা প্রকাশ করিবার নহে। তাঁহাকে পূজা, আরাত্রিক ও নানাভাবে দেবসম্মানে সেবাদি করিয়াও যেন তাঁহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। জনৈক বিশেষসঙ্গতিসম্পন্ন ভক্তের গৃহে এই প্রকারে নিমন্ত্রিত

মাদ্রাজ

১৯২৪

হইয়া মহাপুরুষজী সন্ন্যাসিগণসহ শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। বিবিধ উপচারে আহারাদির পর উপরের বৈঠকখানাঘরে বসিয়া ধর্মপ্রসঙ্গাদি হইতেছে, এমন সময় পাশেই একটি গণ্ডগোল ও কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া মহাপুরুষজী ও আর সকলে ব্যাপার কি দেখিবার জন্য জানালার পাশে গেলেন। যে দৃশ্য দেখা গেল তাহা অসহনীয় ও হৃদয়বিদারক! সাধু ও ভক্তদিগের যে উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলা হইয়াছিল, সেই পাতা হইতে ভুক্তাবশেষ খাইবার জন্য দশ-বার জন স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা সমবেত হইয়াছে। লোকগুলি সকলেই প্রায় উলঙ্গ—পুরুষ ও ছেলেদের কৌপীনমাত্র সম্বল, আর স্ত্রীলোকেরা কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। ঐ উচ্ছিষ্ট খাইবার জন্য শিয়াল-কুকুরের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা, ঝগড়া ও মারামারি দেখিয়া মহাপুরুষজীর মুখমণ্ডলে গভীর বেদনার ছবি ফুটিয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর ও ভারাক্রান্ত প্রাণে চুপ করিয়া নিজের আসনে গিয়া বসিলেন এবং যাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন সেই ভক্তটিকে বলিলেন, "এদের ভরপেট খাইয়ে দাও। আহা! আমরা এত সব খেলাম আর এরা অভুক্ত।" পরে বলিয়াছিলেন, "এ পুঞ্জীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত যতদিন না হবে ততদিন ভারতের কোন আশা নেই। তাই তো স্বামিজী বলেছেন, 'দরিদ্রদেবো ভব।' দরিদ্রনারায়ণের সেবাই যুগধর্ম।"

মহাপুরুষজী মাদ্রাজে হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হন। প্রথমে উহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই; এমন কি, চিকিৎসককে দেখাইতেও অসম্মত হইলেন, কিন্তু জ্বরের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সকলের অনুরোধে সুবিজ্ঞ ডাক্তার ডাকা হইল। রক্তপরীক্ষার ফলে ঐ জ্বর খারাপ রকমের ম্যালেরিয়া

বলিয়া সাব্যস্ত হয়। পর পর তিনটি কুইনাইন ইন্‌জেকসন্ দেওয়ার ফলে জ্বর ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। আট-নয় দিন তীব্র জ্বরভোগের ফলে তাঁহার শরীর খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে কোন শীতল স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ুপরিবর্তনের পরামর্শ দেন; তদনুসারে জনৈক বিশিষ্ট ভক্তের আগ্রহে মহাপুরুষজী, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও অপর কতিপয় সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিসহ ৯ই মে তারিখে নীলগিরি পর্বতে কুন্নুরের নিকটবর্তী স্প্রিংফিল্ড নামক স্থানে গমন করিলেন। ঐস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ছয় হাজার ফুট উচ্চ, ইউকেলিপ্‌টাসের ঘন জঙ্গল এবং নানাপ্রকার সুরভি ফুল ও বৃক্ষলতাদি-পরিশোভিত; প্রস্রবণে প্রচুর মিষ্ট জল—হাওয়াও অতি চমৎকার। পাহাড়ের গায়ে গায়ে কফি ও চায়ের বাগান, দূরে দূরে অবস্থিত বাঙ্গলাগুলি ঘনসবুজের মধ্যে নয়ন-রঞ্জক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মোটরগাড়ী চলার উপযুক্ত প্রশস্ত অনেকগুলি রাস্তা পর্বতগাত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন দিকে গিয়াছে। দেশীয় রাজন্যবর্গের কয়েকটি গ্রীষ্মাবাস এবং ব্যবসায়ী ইংরেজ-সাহেবদের অনেকগুলি বাঙ্গলাও আছে। যে বাড়ীতে মহাপুরুষজী ছিলেন তাহা অতি নির্জন। বেশ বড় একটি বাগানও উহাতে ছিল; দূর হইতে দেখিলে মনে হইত যেন একটি সুদৃশ্য তপোবন। মহাপুরুষজী ওখানে আসিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন; তাঁহার স্বাস্থ্যেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল।

ইতঃপূর্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কোন অধ্যক্ষ নীলগিরিতে গমন করেন নাই। সেই জন্য স্বামী শিবানন্দের আগমনে ঐ অঞ্চলে খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। দূর দূর স্থান হইতে ভক্তগণ তাঁহার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার জন্য কুন্নুরের ঐ বাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিলেন। সরলপ্রাণ পাহাড়ীরাও তাঁহাকে ভক্তিভরে দর্শন করিতে আসিত।

উটকামণ্ড, মালাবার এবং মাদ্রাজ প্রদেশের অন্যান্য স্থান হইতে ভক্তগণ মাঝে মাঝে তাঁহার পুণ্যসঙ্গলাভ ও দীক্ষা-প্রার্থী হইয়া স্প্রিংফিল্ডের ঐ বাড়ীতে আসিতেন।

নীলগিরির আবহাওয়া এতই উচ্চভাবোদ্দীপক ছিল যে, তিনি ঐ স্থানে মঠের সন্ন্যাসিগণের ভজন-সাধনের জন্য একটি আশ্রমস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ সংবাদ উটকামণ্ড গ্রীষ্মাবাসে ভক্তগণের নিকট পৌছিলে তাঁহারা খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। ভগবদিচ্ছায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই আশ্রমস্থাপনের যোগাযোগও হইয়া গেল। মহাপুরুষজীর কুন্নুর হইতে লিখিত এক চিঠিতে জানা যায়—"আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুরের কি মহিমা! অনুন্নতজাতীয় একজন ধোপা দুই একর জায়গা দান করিয়াছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন—তাঁহার ইষ্ট (মা শীতলা) তাঁকে বলছেন, 'তোর কাছে জন কতক লোক মঠ তৈয়ার করিবার জন্য জায়গা চাহিতে আসিলে তুই দিস্।' ঐ ভক্তটি পর পর তিন দিন তাঁহার আরাধ্যাদেবী-কর্তৃক স্বপ্নে জমিপ্রদানের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন। ভগবতী-কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া আশ্রমের জন্য জমিদান করার সংবাদ স্থানীয় ভক্তগণের প্রাণে খুব উদ্যম ও প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল। অবিলম্বে উটকামণ্ডের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া একটি আশ্রম-কমিটি গঠিত হইল এবং আশ্রমের কার্যও অগ্রসর হইতে থাকিল। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসের 'বেদান্ত-কেশরী' হইতে জানা যায়—"স্বামী শিবানন্দের কুন্নুরে অবস্থিতি ঐ অঞ্চলের ভক্তগণের প্রাণে আধ্যাত্মিক প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে। উটকামণ্ডের শ্রীরামকৃষ্ণ হারমিটেজের ভক্তগণ-কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া মহাপুরুষজী ২২শে জুন তথায় গমন করেন। হারমিটেজ ও শ্রীমাণিক্য-ভসগাভক্তসভায় ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন।"

পরবর্তী 'কেশরী' পত্রিকায় আছে—"শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ উটকামণ্ডের জনসাধারণ-কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। তাঁহার শুভাগমনে ৬ই জুলাই আঞ্জুমনভবনে সর্বসাধারণের এক সভা আহূত হয়। স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকিল বি রাম রাও ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট জনগণসহ একটি আশ্রম-কমিটি গঠিত হয়। ঐ রমণীয় শৈলাবাসে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইলে পরম শ্রদ্ধেয় স্বামিজীকে এই প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। তিরুভেন্‌গাডাম্ পিলাই মহোদয় বিশপ্ ডাউনে দুই একর জমি ঐ আশ্রমনির্মাণকল্পে দান করিয়াছেন। এই জমিখণ্ড শহরের সন্নিকটে অবস্থিত। ঐ স্থানের দক্ষিণে শোভাময় 'লরেন্স-এসাইলাম' উপত্যকা এবং উত্তরে উটকামণ্ডের ঘোড়দৌড়-মাঠ। পর্বতের উচ্চস্থানে অবস্থিত বলিয়া চারিদিকেই নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী উপভোগ করা যায়। সভায় স্বামী শ্রীবাসানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও কার্যাবলী আলোচনা করিয়াছিলেন। ··· ১১ই জুলাই আশ্রমের জমিতে যথাবিধি পূজা, হোম ও বেদপাঠাদির পরে 'গৃহারম্ভণ'-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল। মুহুর্মুহুঃ সম্মিলিত 'শ্রীগুরুমহারাজজীকি জয়' ধ্বনির মধ্যে পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ একটি রৌপ্য-খনক দ্বারা আশ্রমের ভিত্তি-স্থাপনের প্রথম মৃত্তিকা খনন করিয়াছিলেন। ঐ রৌপ্য-খনকখানি তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। সর্বত্র মহোৎসাহ ও উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ··· অতঃপর আশ্রম-কমিটির প্রেসিডেণ্ট রাম রাও পরমশ্রদ্ধাভাজন স্বামী শিবানন্দকে স্বাগত করিয়া এক অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপর স্থানীয় সম্ভ্রান্ত 'বড্‌গা'গণও একখানি মানপত্র এবং তামিলভাষায় রচিত সময়োপযোগী ভজনাবলী তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

ঐ সকল অভিনন্দনের উত্তরপ্রদানকালে স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন, 'এই পার্বত্য প্রদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র-স্থাপনকল্পে উটকামণ্ডের জনসাধারণের আন্তরিক আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী আপনাদের প্রাণে এতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, আপনারা এই মনোরম প্রদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমি খুবই আহ্লাদিত। বিশ্বমানবতা ও সেবাধর্মপ্রচারকল্পে পরিকল্পিত আশ্রমের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত ভূমিদাতা তিরুভেন্‌গাডাম্ পিলাই মহাশয়কে আমার অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি আর আন্তরিক প্রার্থনা করিতেছি শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাশীর্বাদে এ আশ্রম দীর্ঘকাল সনাতনধর্ম-প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতে বিশ্বমানবতা, ভ্রাতৃপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা ও শান্তি-স্থাপনে যত্নপর হইয়া শ্রীপ্রভুর নাম জয়যুক্ত করুক।"

আশ্রমের ভিত্তিস্থাপনের পর মহাপুরুষজী নিমন্ত্রিত হইয়া স্থানীয় মারিয়াম্মা মন্দিরে গমন করেন। নানা কীর্তনের দল কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে সুসজ্জিত মণ্ডপে অভিনন্দিত করিয়াছিল। এখানেও মহাপুরুষজীকে একখানি মানপত্র প্রদান করা হয়। তিনি সমবেত জনতাকে আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সঙ্গী জনৈক সন্ন্যাসীকে স্থানীয় ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও মিশনের কার্যাবলী বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

উটকামণ্ডের ভক্তগণকে ধর্মোপদেশ ও দীক্ষাদি দিবার জন্য আহূত হইয়া মহাপুরুষজী মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করিতেন। ঐ প্রদেশের এক রাজপরিবারের বিশেষ আগ্রহে তিনি উটিতে তাঁহাদের গ্রীষ্মাবাস-ভবনে গিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ ও আশীর্বাদ-দানে ধন্য করিয়াছিলেন। কুন্নুরে

মাদ্রাজ প্রদেশের রাজন্যবর্গের গ্রীষ্মাবাস্ আছে। ঐ সকল রাজপরিবারের অনেকেই মহাপুরুষজীর নিকট আগমন করিতেন এবং কয়েকজন তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষাও পাইয়াছিলেন।

কুন্নুর কস্‌মপলিটান্ ক্লাবের সভ্যগণ-কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মহাপুরুষজী একদিন তাঁহাদের ক্লাবে 'অনুভূতিমূলক ধর্মলাভের উপায়' সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী ভাষায় আলোচনা করিয়াছিলেন।

নীলগিরি-অঞ্চলে যুগাবতারের ভাব সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহাপুরুষজী সঙ্গিগণসহ ২৩শে জুলাই কুন্নুর হইতে বাঙ্গালোর অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে নেত্রামপল্লী নামক স্থানে গ্রাম্য আবেষ্টনীর মধ্যে ঠাকুরের একটি ক্ষুদ্র আশ্রমে তিনি ছয় দিন অবস্থান করেন। সরলপ্রাণ গ্রামবাসীরা মহাপুরুষজীর চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য প্রচুর ফুল, ফল ও ফুলের মালা প্রভৃতি লইয়া প্রায় তিন মাইল দূরস্থিত জলারপেট্ ষ্টেশনে উপস্থিত হয় এবং পরমশ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া সাগ্রহে আশ্রমে লইয়া আসে। মহাপুরুষজীর আগমনে গ্রামবাসীরা যেন উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠিল। তাহাদের কী গভীর ভক্তি! যেন কোন দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদের গ্রামে —সেই ভাবে সকলেই ফুল, ফল, শাকসব্জী, হয়ত কেহ বা একটু গুড়— যাহার ঘরে যাহা ছিল—তাহাই মহাপুরুষজীকে নিবেদন করিত! তিনিও ঐ দরিদ্র ভক্তগণের আন্তরিক ভক্তি ও সরলতায় খুবই মুগ্ধ হইয়া প্রাণ ঢালিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিতেন এবং কয়েক জনকে মন্ত্রদীক্ষাও দিয়াছিলেন।

গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আশ্রমে সমবেত হইয়া মহাপুরুষজীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল দর্শন করিত। ভাষাবিনিময়ের উপায় নাই;

কিন্তু তাঁহার মৌন অবস্থিতিই যেন তাহাদের প্রাণে অমৃতরস সিঞ্চন করিয়া দিত। কখনও বা তিনি নিজের হাতে ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে মিষ্টান্নাদি বিতরণ করিতেন। সান্ধ্য আরাত্রিকে এত লোক যোগদান করিত যে আশ্রমে স্থান-সংকুলান হইত না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ঐ গ্রামে গ্রাম্যদেবতার স্থান অধিকার করিয়াছেন।

নেত্রামপল্লীতে অবস্থানকালে ভক্তগণ-কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া মহাপুরুষজী চারি মাইল দূরস্থিত পুত্তকোটা নামক স্থানে গমন করিয়া ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোমাদি-সমাপনান্তে বিবেকানন্দ সোসাইটী নামে একটী নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

তিনি নেত্রামপল্লী হইতে ২৮শে জুলাই রওনা হইয়া সেই দিন সন্ধ্যায় বাঙ্গালোর আশ্রমে আসিলেন। আশ্রমাধ্যক্ষ ষ্টেশন হইতে মহাপুরুষজীকে সাদর সম্বর্ধনা করিয়া আশ্রমে আনয়ন করেন। তাঁহার আগমনে আশ্রমে ভক্ত ও জিজ্ঞাসুর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। মহাপুরুষজীর কুন্নুর হইতে রওনা হইবার পূর্বেই সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে অত্যধিক বারিপাতের ফলে কাবেরী নদীতে ভীষণ বন্যা হয়। ফলে সহস্র সহস্র লোক সর্বহারা হইয়াছিল—দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-শোক ও নানা অভাবনীয় কষ্টের অন্ত ছিল না। মহাপুরুষজী ঐ দৈব বিপৎপাতের সংবাদে খুব বিচলিত হইয়াছিলেন; অবিলম্বে মিশনের মাদ্রাজ কেন্দ্র হইতে বন্যা-বিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্য আরম্ভ হয়। দক্ষিণ ভারতে মিশনের পক্ষ হইতে ঐ জাতীয় সেবাকার্য উহাই প্রথম। সেবাকার্যের ফলে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল এবং মিশনের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-আদর্শের প্রভাবও ঐ অঞ্চলে বহুল পরিমাণে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

মহাপুরুষজীর দৈনন্দিন জীবনের শ্রেষ্ঠ মাধুর্য ছিল ভজনসাধন। ঐ

বৃদ্ধ বয়সেও তিনি প্রবর্তকের ন্যায় শেষ রাত্রে উঠিয়া ধ্যানে বসিতেন আর সমস্ত দিন মঠ-মিশনের নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। সময়ের সদ্ব্যবহার করা তাঁহার যেন চিরন্তন অভ্যাস—গল্প বা অপ্রয়োজনীয় কথায় সময়ক্ষেপণ করিতে তাঁহাকে কদাচিৎ দেখা যাইত। কথাবার্তা যাহা বলিতেন তাহা অধিকাংশই ধর্মবিষয়ক। স্থানীয় ভক্তগণ বিশেষ করিয়া সকালে ও বৈকালে নিয়মিতভাবে তাঁহার কাছে আসিতেন; তিনিও ধর্মপ্রসঙ্গাদি দ্বারা সকলের প্রাণে শান্তিদান করিতেন। তখনও অধিকাংশ চিঠি তিনি নিজের হাতেই লিখিতেন। বিশেষ করিয়া সাধুভক্তদিগের সাধন-জীবনের অনেক সমস্যা নূতন নূতন ইঙ্গিতপূর্ণ পত্র দ্বারা সমাধানপূর্বক তাঁহাকে তাঁহাদিগের ধর্মজীবন চালিত করিতে হইত।

বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ বৈকালবেলা আশ্রমের সম্মুখের মাঠে খেলাধূলা করিত। খেলার মাঠের দুই দিক বেষ্টন করিয়া আশ্রমবাসীদের বেড়াইবার রাস্তা। একদিন ছেলেরা হকি খেলিতেছিল—মহাপুরুষজীও ঐ রাস্তায় ধীরে ধীরে বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় হকি বলটি তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসে—সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে বলটি অনুসরণ করিয়া দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্যের ন্যায় হকিষ্টিক্ দ্বারা বলের উপর আঘাত করিল; কিন্তু ষ্টিকের আঘাত বলের উপর না পড়িয়া মহাপুরুষজীর পায়ে সজোরে লাগিল। তিনি দারুণ আঘাতে চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া হাতের লাঠির উপর ভর করিয়া কোন প্রকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন—পরে তাঁহাকে ধরিয়া আশ্রমে লইয়া আসা হইল। ঐ আঘাতের জন্য সাত-আট দিন যাবৎ তাঁহাকে এক প্রকার ঘরের ভিতরই থাকিতে হইয়াছিল; তিনি কিন্তু ছেলেটির উপর মোটেই বিরক্ত হন নাই। ছেলেরা প্রতিদিন সন্ধ্যা-আরতির পরে ভজনাদি করিয়া

তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিত। মহাপুরুষজী সেই ছেলেটিকে দেখিতে না পাইয়া যখন শুনিলেন যে, সে ভয়ে তাঁহার সম্মুখে আসে নাই তখন তিনি সেই ভীত ও মর্মাহত ছেলেটিকে ডাকাইয়া নানা সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা তাহার মনের ভয় ও সঙ্কোচ দূর করিয়া দিলেন। মাঝে মাঝে তিনি ঐ ছেলেটিকে লইয়া নানা রঙ্গতামাসা করিতেন।

আশ্রমের নীচে কিয়দ্দূরে 'অস্পৃশ্য'দিগের একটি গ্রাম ছিল। মহাপুরুষজী জনৈক সাধুর নিকট ঐ অঞ্চলের অতি দরিদ্র অচ্ছুৎদিগের উপর দারুণ সামাজিক নির্যাতনের কথা শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন। একদিন সকালবেলা আশ্রম হইতে একজন সাধুকে সঙ্গে করিয়া ঐ গ্রামে বেড়াইতে গেলেন। সাধারণতঃ অস্পৃশ্যদিগের গ্রামে কেহ গমন করে না—সেইজন্য মহাপুরুষজীকে তাহাদের গ্রামে আসিতে দেখিয়া অচ্ছুৎগণ বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইল। গ্রামের ভিতর একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া মহাপুরুষজী উহা দর্শন করিতে যান এবং মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবতার সম্মুখে কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হন। পরে বলিয়াছিলেন, "আহা, ওদের খুব ভক্তি। খুবই আন্তরিকতার সহিত দেবতার পুজো করে।" তথায় তাঁহার আগমন অচ্ছুৎদের কল্পনার অতীত ছিল; গ্রামে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল—আবালবৃদ্ধ সকলেই মহাপুরুষজীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি দোভাষীর সাহায্যে কথাবার্তা বলিয়া তাহাদের দুঃখ ও অভাবের সহিত পরিচিত হইয়া সমবেদনা জানাইলেন এবং তাহাদিগকে খুব ভক্তিসহকারে দেবতার সেবা-পূজাদি করিবার উপদেশ দিলেন; বিশেষ করিয়া মন্দিরটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার কথা বলিয়াছিলেন।

অচ্ছুৎদিগের শোচনীয় অবস্থা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত মথিত করিল - তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত প্রাণে আশ্রমে ফিরিলেন। তাহার

পরেও তিনি কয়েকবার ঐ গ্রামে গিয়া নগ্ন মলিন ছোট ছোট ছেলেদের হাতে পয়সা ও খাবার দিয়া আসিতেন এবং আশ্রমে ঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগাদি হইলে ঐ অচ্ছুৎ বালকগণকে প্রসাদাদি দিতেন। মহাপুরুষজী বাঙ্গালোর হইতে চলিয়া আসিবার সময় ঐ অচ্ছুৎ বালকগণ অশ্রুজলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল।

মহাপুরুষজী সেই বার বাঙ্গালোর আশ্রমে প্রায় সাড়ে চারি মাস ছিলেন। তাঁহার দিব্য ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মহীশূর, কুর্গ, কানাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ধর্মপিপাসু নরনারী বাঙ্গালোর আশ্রমে সমবেত হইয়া তাঁহার উপদেশ ও অশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু বাঙ্গালোরের নিকটবর্তী উলসুর প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণের আগ্রহে তিনি মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া ধর্মোপদেশাদি দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন।

বাঙ্গালোরে অবস্থানকালে যে-সকল ভক্ত মহাপুরুষজীর সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই পরে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ হইয়া ঐ অঞ্চলে ঠাকুরের উদার ধর্মমতপ্রচারে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালোর হইতে মহাপুরুষজী ১১ই ডিসেম্বর পুনরায় মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিয়া ১২ই ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের নবনির্মিত আবাসিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যাভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং একটি পরিকল্পিত যন্ত্রশিল্প-বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ইহার পরেও প্রায় একমাস কাল মহাপুরুষজীকে মাদ্রাজে থাকিতে হইয়াছিল। ঐ সময় দক্ষিণ ভারতের বহু কেন্দ্র হইতে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ মাদ্রাজ মঠে সমবেত হইয়া তাঁহার সঙ্গ ও

সাহচর্য-লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি সকলকে অধিকারিভেদে ভজনসাধন এবং 'জগদ্ধিতায়' সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত করিতেন। তাঁহার পবিত্র সঙ্গ সকলের প্রাণে ধর্মভাবের প্লাবন আনিয়া দিত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধনজীবনের সমস্যাসমূহের নূতন সমাধান ও আলোক পাইয়া ধন্য হইতেন। তাঁহার অবস্থিতিতে এমন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইত যে, সকলেই তাহার প্রভাব উপলব্ধি করিয়া ধর্মজীবনের পাথেয় সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইত। তাঁহার সৌম্যমূর্তি এবং ভাববিহ্বল চক্ষুদ্বয়ের দিকে যে একবার দৃষ্টিপাত করিত, তাহারই প্রাণে শ্রীভগবানের উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তি স্বতঃই জাগিয়া উঠিত। ঐ সময় তাঁহার আশীর্বাদ ও সঙ্গ লাভ করিয়া কতিপয় শিক্ষিত যুবকের প্রাণে ধর্মজীবনের ছাপ এমন গভীরভাবে পড়িয়াছিল যে, পরে তাহারা ত্যাগমন্ত্রে অভিষিক্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদন করিয়াছিল।

তিনি মাদ্রাজের 'পার্থসারথি' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশকালে তিনি যেন অন্য লোক হইয়া যাইতেন। মুগ্ধপ্রাণে, করযোড়ে যখন তিনি বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তখন মনে হইত তিনি বাস্তবিকই পরমপুরুষকে চাক্ষুষ দর্শন করিতেছেন। মহাপুরুষজী খুব ঘন ঘন মন্দিরাদিতে যাইতেন না বটে, কিন্তু যখন যাইতেন তখন এমন একটা তন্ময়তার সহিত যাইতেন যে, তিনি নিজে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহার সেই গাম্ভীর্য ভেদ করিবার কাহারও ইচ্ছা হইত না।

এই প্রকারে প্রায় সাত মাস কাল দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ এবং বিভিন্ন আশ্রম পরিদর্শন করিয়া বোম্বাইর সাধু-ভক্তগণের সাদর আহ্বানে মহাপুরুষজী স্বামী শর্বানন্দ ও কতিপয় সন্ন্যাসীর সহিত ৭ই

জানুয়ারী (১৯২৫) বোম্বাই যাত্রা করিলেন। স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজের ভক্তগণ-কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া পথিমধ্যে তিনি দুই দিনের জন্য কাডাপ্পায় নামিয়াছিলেন। মহাপুরুষজীর শুভাগমনে তত্রত্য হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী খুব আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিল। 'বেদান্তকেশরী'র জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, "৮ই জানুয়ারী সকালে সুসজ্জিত মণ্ডপে স্বামী শিবানন্দকে সম্বর্ধনা করিয়া সমাজের প্রেসিডেন্ট ডবলিউ, সমাইয়া গারু এক অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। পরমভক্তিভাজন স্বামী শিবানন্দজী সংক্ষেপে হৃদয়গ্রাহী প্রত্যুত্তরে কাডাপ্পার অধিবাসিবৃন্দের ধর্মানুরাগে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সমবেত জনগণকে আন্তরিক আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদানানন্তর বলিয়াছিলেন, 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এই সত্যই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যে, ধর্ম জিনিষটা প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয়।' অতঃপর তাঁহার আদেশে স্বামী শর্বানন্দ ঐ সভায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।"

"সেই দিন সকালে দশ ঘটিকার সময় স্বামী শিবানন্দ বীরস্বামীয়া লাইব্রেরীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সমস্ত দিন ভক্তসমাগমের বিরাম ছিল না। তিনিও অক্লান্তভাবে সকলকে ধর্মোপদেশদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। পরদিবস তিনি নবনির্মিত সমাজগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া যথোচিত পূজাদি-সমাপনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। দুই দিনে শহরের বহু নরনারী তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভ করিবার জন্য সমাজে সমবেত হইয়াছিল।" মহাপুরুষজীর সঙ্গী জনৈক সন্ন্যাসী শ্রীমূর্তির সম্মুখে সান্ধ্য আরাত্রিক সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঐ আরতি দর্শন করিবার জন্য সকল সম্প্রদায়ের এত লোক উপস্থিত হইয়াছিল যে, মণ্ডপে স্থানসঙ্কুলান হয় নাই। তাহার মধ্যে কাডাপ্পার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান-ভক্তও

ছিলেন।[১] তাহা দেখিয়া মহাপুরুষজী অত্যন্ত অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, "জয় প্রভু, ধন্য প্রভু, আহা! তোমার মহিমা কে বুঝবে!

'তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥' "

কাডাপ্পায় কয়েকজন ভক্তকে তিনি মন্ত্রদীক্ষাও দিয়াছিলেন। ৯ই জানুয়ারী রাত্রে রাইচুর পেসেঞ্জার ট্রেণে তিনি কাডাপ্পা পরিত্যাগ করেন। ষ্টেশনে বহুলোক তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল।

১২ই জানুয়ারী মহাপুরুষজী বোম্বাই পৌঁছিলেন। স্থানীয় সাধু-ভক্তগণ ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশন হইতে বিপুল সম্বর্ধনা করিয়া তাঁহাকে বোম্বাই শহরের উপকণ্ঠে খার রোডের উপর অবস্থিত ভাড়াটিয়া আশ্রমবাড়ীতে লইয়া গেলেন। যদিও কয়েক বৎসর পূর্বেই বোম্বাইতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি প্রয়োজনীয় অর্থাভাববশতঃ আশ্রম এতকাল ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই ছিল। এইবার মহাপুরুষজী ঐ আশ্রমকে নিজস্ব জমিতে স্থায়িভাবে স্থাপিত করিবার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ঐ সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া আশ্রমের ভক্ত, পৃষ্ঠপোষক ও হিতা-

১ কাডাপ্পার মুসলমান ভক্তদিগের মধ্যে খান বাহাদুর সৈয়দ আবদুল মজিদ (মঞ্জু মিঞা নামে পরিচিত) মহোদয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাজ' স্থাপনে তিনি নানাভাবে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। পরে 'সমাজ' গৃহের অধিবেশনাদির জন্য তিনি একটি প্রকাণ্ড হলঘরও নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মহাপুরুষজীর কাডাপ্পায় অবস্থানকালে দেখা যাইত যে, ঐ ভক্তটি অতি দীনভাবে করযোড়ে মণ্ডপের এককোণে বসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে ঠাকুরের ছবির দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, পয়গম্বর মহম্মদই জগতের কল্যাণের জন্য ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী মঞ্জু মিঞার ভক্তিতে খুবই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কাঙ্ক্ষীদের প্রাণে খুব উৎসাহের সঞ্চার হইল, সকলেই আশ্রমকে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই 'বোম্বাই নূতন উন্নয়ন-অঞ্চলে' আশ্রমের জন্য দুই খণ্ড জমি (১৩০০ বর্গগজ) ক্রয় করা হইল। শুভদিনে ৬ই ফেব্রুয়ারী ঐ জমিতে মহাপুরুষজী ঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া নূতন আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং সঙ্গেসঙ্গে আশ্রমবাড়ীর নির্মাণকার্যও আরম্ভ হইল।

স্বামিজীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারের জন্য হিমালয়, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই চারি স্থানে চারিটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রথম তিনটি কেন্দ্র ইতঃপূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল। এখন বোম্বাই আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করিয়া মহাপুরুষজী স্বামিজীর শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।

বোম্বাইএ কর্মপ্রসার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে তাঁর কাজ ভবিষ্যতে খুব উত্তমরূপে হবে। তিনিই সব করছেন, আমরা নিমিত্তমাত্র।" মহাপুরুষজীর শুভাগমনে ভক্তসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সকাল-সন্ধ্যায় অনেকে তাঁহার কাছে সমবেত হইতেন; আবার কেহ কেহ তাঁহাকে নিজভবনে লইয়া গিয়া আনন্দোৎসব করিতেন। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত, বিদ্বান ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া আশ্রমের স্থিতি ও প্রসারের জন্য নানাপ্রকার সহায়তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে শ্রীগুরুদেবের ভাব-প্রচার দ্বারা জগতের প্রকৃত কল্যাণ-সাধনেচ্ছা তাঁহার প্রাণে কতটা বলবতী হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস বোম্বাই হইতে লিখিত একখানি চিঠিতে পাওয়া যায়, "স্বামিজী বিশেষ করিয়া ইহা বলিয়া গিয়াছেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। এই mottoর (আদর্শ বাণী) উপর তিনি মঠ

প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আমরাও উহা strictly follow (পূর্ণভাবে অনুসরণ) করিতে বাধ্য।”

বোম্বাইতে ‘পশ্চিমভারত বিবেকানন্দ সোসাইটি’র সভ্যগণ মহাপুরুষজীকে একখানি মানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে ১৬ই জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় মাড়োয়ারী বিদ্যালয়-হলে শ্রী এম আর জয়াকার মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গসহ জনসাধারণের একটি বিরাট সভা হয়। শ্রী জি ও মুর্দেশ্বর অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলে মহাপুরুষজী প্রত্যুত্তরে সকলকে ধন্যবাদ দিয়া আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার আশীর্বাণী খুব প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। অতঃপর সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলিয়া তিনি স্বামী শর্বানন্দকে তাঁহার বাণী ঐ সভায় ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করেন।

১৭ই জানুয়ারী স্বামিজীর তিথিপূজা এবং ১৮ই জানুয়ারী সাধারণ উৎসব সমারোহের সহিত বোম্বাই আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী শিবানন্দের উপস্থিতিতে ঐ বৎসর উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন। ভজন-কীর্তন ও স্বামিজীর জীবন-আলোচনাদিতে সমস্ত দিন আশ্রম মুখরিত হইতে থাকে। দারিদ্রনারায়ণ-সেবা উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল।

বেলুড় মঠে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেজন্য মহাপুরুষজী ১৩ই ফেব্রুয়ারী মঠের দিকে রওনা হইলেন। কয়েক-জন ভক্তের সবিশেষ আগ্রহে পথে নাগপুরে পাঁচ দিনের জন্য তাঁহাকে নামিতে হইয়াছিল। তখনও নাগপুরে কোন আশ্রম স্থাপিত হয় নাই। স্থানীয় কতিপয় ভক্ত অবসরমত একস্থানে সমবেত হইয়া সদালোচনা ও ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন এবং ভাবী আশ্রমের জন্য একটি ক্ষুদ্র স্থানও নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাঙ্গলায় মহাপুরুষজীর

থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি তথায় থাকিয়া আনন্দে সকলের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গাদি করিতেন এবং কয়েকজনকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন। মহাপুরুষজীর আগমনে সকলের প্রাণে খুবই সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তিনিও ভক্তগণের উৎসাহ দেখিয়া প্রীত হন এবং শ্রীগুরু মহারাজের ভাবপ্রচারের একটি স্থায়ী কেন্দ্রস্থাপনের জন্য ১৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে নিজেই ঠাকুরের পূজা করিয়া ক্রেডক্ টাউনে পূর্বনির্দিষ্ট জমিতে আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন। যদিও মহাপুরুষজী কয়েকদিন মাত্র নাগপুরে ছিলেন, তথাপি ঐ দিনগুলির মধুর স্মৃতি ভক্তগণের প্রাণে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

দীর্ঘ এগার মাস পরে মহাপুরুষজী ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৫) বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, সর্বত্রই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং এমন একদল আদর্শ ভক্ত গড়িয়া উঠিল যে তাঁহারা স্থানীয় আশ্রমগুলির কার্যপ্রসারে আত্মনিয়োগ করিয়া ক্রমে ব্যাপকভাবে সমগ্র মঠ ও মিশনের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন।

বেলজিয়ামের ভূতপূর্ব রাজা এলবার্ট ১৯২৫ সালে ভারত-ভ্রমণকালে বেলুড় মঠ পরিদর্শন করেন। তাঁহারা মঠে আসিলে মহাপুরুজী তাঁহাদিগকে সাদরে অভিনন্দিত করিয়া সপ্রেম ব্যবহার ও আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যক্তিত্বে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া এবং তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনাদির পর রাজা এলবার্ট বলিয়াছিলেন, "ভারতে এই একমাত্র স্থান দেখলাম, যেখানে মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলে।"

১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাস দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের

ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ২৮শে জানুয়ারী সোমবার শ্রীপঞ্চমী দিবস প্রাতে বিদ্যাপীঠের গৃহপ্রবেশ-উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া মহাপুরুষজী প্রায় ত্রিশ জন প্রবীণ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে বেলুড় মঠ হইতে দেওঘরে শুভাগমন করেন। ঐ উপলক্ষে জামতাড়া, পাটনা, কাশী প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বহু সাধু, ভক্ত এবং ছাত্রদের অভিভাবকগণ বিদ্যাপীঠে সমবেত হইয়াছিলেন।

শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রাতে সাধুভক্তগণের কীর্তন ও জয়ধ্বনি-মুখরিত শোভাযাত্রার পুরোবর্তী হইয়া মহাপুরুষজী পুরাতন বিদ্যাপীঠভবন 'বামাভিলা' হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি দুই হস্তে বক্ষে ধারণ করিয়া বিদ্যাপীঠের নূতন ঠাকুরঘরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন; তৎপরে পূজা ও আরাত্রিক-সমাপনান্তে মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি ও সমবেত জনগণের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে তিনি নবনির্মিত বিদ্যাপীঠভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। সমস্ত দিন ভজন-কীর্তন চলিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে দরিদ্র-নারায়ণ ও নিমন্ত্রিত সকলকে ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়। পরদিন অপরাহ্ণে বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক-বিতরণ উপলক্ষে একটি সভার অধিবেশন হয়। ছাত্রগণ-কর্তৃক কয়েকটি সুন্দর আবৃত্তির পর স্বামী শিবানন্দজী স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণের আদর্শ ও কর্ম-প্রণালী সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। ঐ উপলক্ষে বিদ্যাপীঠে প্রায় তিনসপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। মহা-পুরুষজীর অবস্থিতিতে বিদ্যাপীঠবাসী সকলের প্রাণ যেন আনন্দ-উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিদ্যাপীঠ দেখিয়া মহাপুরুষজী অত্যন্ত প্রীত হন। বিদ্যাপীঠের

কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি প্রকাণ্ড জমি দেখিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "এ মহাসাধনপীঠ—এস্থানে একটু চেপে ভজন-সাধন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব শীঘ্র শীঘ্র হবে।" একদিন আপনমনে আনন্দে বিদ্যাপীঠের মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ বলিলেন, "আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এখানে কালে একটা বিরাট ব্যাপার হবে।"

বৈদ্যনাথ শিবক্ষেত্র—শিবময় মহাপুরুষজী ঐ সময়ে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুক্ষণ ভরপূর থাকিতেন। সর্বদা হাসিমুখ, প্রশান্তচিত্ত, আনন্দ-বিভোর—যেন 'সত্যং শিবং সুন্দরং'-এর রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। মহাপুরুষজী থাকিতেন বিদ্যাপীঠের সংলগ্ন 'বিপিন কুটীর' নামক এক বাড়ীতে। বিদ্যাপীঠের জমির সম্মুখেই 'দর্শনিয়াটাট্'—ঐ স্থান হইতে বাবা বৈদ্যনাথের শ্রীমন্দিরের চূড়া প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিবৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় কয়েকদিনব্যাপী বিশেষ মেলাতে বহু দূর দূর স্থান হইতে প্রায় লক্ষ যাত্রী বৈদ্যনাথধামে সমবেত হইয়া থাকে। রাত্রি তিনটা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিন যাত্রিগণ ভারে ভারে পবিত্র গঙ্গাজল বহন করিয়া পদব্রজে অবিরাম গতিতে বিদ্যাপীঠের সম্মুখের রাস্তা দিয়া চলিতে থাকে। যাত্রীরা ঐ 'দর্শনীয়াটাটে' দাঁড়াইয়া শ্রীমন্দিরের চূড়া প্রথম দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিত। স্বামী শিবানন্দও তন্ময়ভাবে হাততালি দিয়া যাত্রীদের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতেন—সে এক অপরূপ দৃশ্য!

মন্দিরের পাণ্ডাদিগের সহিত সবিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া ঐ মেলার সময় মহাপুরুষজীকে ৺ বৈদ্যনাথদর্শন করিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কথা ছিল যে, দর্শন ও পূজাদির জন্য সাত মিনিট সময় দেওয়া হইবে। পাণ্ডাগণ অতিকষ্টে যাত্রিস্রোত বন্ধ করিয়া মন্দির ভিড়শূন্য করিলেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই মহাপুরুষজীর অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হইল—

পূজা করিতে বসিয়া শ্রীবিগ্রহের মস্তকে অঞ্জলিপ্রদান করিয়াই তিনি গভীর ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। এদিকে নির্ধারিত সাত মিনিট অতিক্রান্ত হইয়া আরও অনেক সময় কাটিয়া গেল, অথচ তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইতেছিল না। পাণ্ডাগণ সহস্র সহস্র যাত্রীর প্রবাহ আর কিছুতেই রোধ করিতে পারিতে-ছিলেন না—সঙ্গী সন্ন্যাসিবৃন্দও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অনেক কষ্টে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করা হইল—তিনি 'শিব শিব' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায়ই অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে মন্দিরের বাহিরে আনা হইল। সেইদিন বৈকালবেলা তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবার কৃপায় আজ খুব দর্শন হল।"

একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া তিনি প্রবল সর্দি ও হাঁপানিতে আক্রান্ত হন। রাত্রে হাঁপানির টান এত বাড়িয়া গেল যে, নিঃশ্বাস একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম। কোনপ্রকারেই কষ্টের লাঘব হইতেছে না দেখিয়া তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই শরীর হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রষ্টার মতন দেখিতে লাগিলেন যে, দেহটা হাঁপানির টানে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, অথচ তিনি বেশ আনন্দে আছেন। সেই অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকিবার পর ধীরে ধীরে বাহিরের দিকে মন আসিল এবং তিনি যেন পুনরায় দেহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বুড়ো বয়সের ধ্যান কিনা—অল্পক্ষণ পরেই মনটা (হৃদয়ের দিকে দেখাইয়া) একেবারে গভীর ভাবে ভেতরের দিকে চলে গেল। তখন দেখি কোন যন্ত্রণা নেই, কোন কষ্ট নেই—স্থির প্রশান্ত - বাইরের ঝড়-ঝাপটা সেখানে স্পর্শ করতে পারছে না।" পরদিন সকালে পূর্বরাত্রের ঐ ঘটনা যখন বলিতেছিলেন, তখন জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

"ওটা কি মহারাজ?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "ওই তো আত্মা।" কঠোপনিষদে আছে—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥[১]

মহাপুরুষজীর জীবনের এই ঘটনাটিতে যেন উক্ত শাস্ত্রোক্তির প্রত্যক্ষ মর্মোদ্‌ঘাটন করা যায়।

দেওঘরে চব্বিশ-পঁচিশ দিন অবস্থানের পর বেলুড় মঠে যাইবার পথে মহাপুরুষজী জামতাড়া আশ্রমের নবনির্মিত ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চারি দিন ঐ আশ্রমে কাটাইয়াছিলেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার শুভ পদার্পণে আশ্রমে যেন আনন্দের মেলা বসিয়াছিল। ঐ দিন সন্ধ্যার পর লইতেই স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ উৎসবের জন্য রন্ধনাদি কার্যে ব্রতী হইল। মহাপুরুষজী সন্ধ্যার পর নিজপ্রকোষ্ঠে ধ্যান করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে টলিতে টলিতে বাহিরে আসিয়া "দেখ, জঙ্গলমে মঙ্গল হো গিয়া, জঙ্গলমে মঙ্গল হো গিয়া"—বলিয়াই আবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। অর্থাৎ এই সাঁওতালদের বাসভূমিতে জঙ্গলের মধ্যেও যুগাবতারের মঙ্গলপ্রভাব আসিয়া পৌছিয়াছে।

পর দিবস শিবরাত্রি। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসব ও

১ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, হৃদয়-পুরবাসী অন্তরাত্মা জীবগণের হৃদয়ে সর্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুঞ্জতৃণ হইতে ঈষিকার ন্যায় তাঁহাকে ধৈর্যসহকারে স্বীয় দেহ হইতে পৃথক করিবে। তাঁহাকে শুদ্ধ ও অমৃত বলিয়া জানিবে, তাঁহাকে শুদ্ধ ও অমৃত বলিয়া জানিবে।

দরিদ্রনারায়ণ-সেবাদির বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। শিবরাত্রির দিন সকালবেলা মহাপুরুষজী পুরাতন খড়ের বাড়ী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুকে ধরিয়া নূতন ঠাকুরঘরে আনিয়া বসাইলেন এবং পূজাদি-সমাপনান্তে ভোগ নিবেদন করিলেন। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা, ভোগ-রাগ ও হোমাদি হইল।

দ্বিপ্রহরের পর অর্ধনগ্ন, জরাজীর্ণ শত শত দরিদ্র লোক প্রসাদ পাইবার জন্য আশ্রমপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছে। ঐ দৃশ্য দেখিয়া মহাপুরুষজী খুব ব্যথিতপ্রাণে বলিলেন, "আহা! আহা! এরাই তো সাক্ষাৎ নারায়ণ! কৈ, আমাদের কেউ এদের সঙ্গে বসলে না?" সেই দিন শিবরাত্রি, সকলেই উপবাস করিতেছিলেন; তাহা সত্ত্বেও মহাপুরুষজীর ঐ কথা শুনিয়া জনৈক সাধু নারায়ণদের সঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। মহাপুরুষজী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই সেবাযজ্ঞ দেখিতেছিলেন। খিচুড়ি, বাঁধাকপির তরকারী, চাটনী প্রভৃতি সর্বসাধারণকে এবং যে-সকল সাঁওতাল রমণী অন্যের রান্না খাবার খায় না, মহাপুরুষজীর আদেশে তাহাদিগকে চিড়া, মুড়ি ও মিষ্টান্নাদি দ্বারা পরিতোষপূর্বক ভোজন করান হইল।

চারিপ্রহরে শিবপূজা, শিবভজন ও নৃত্যাদিতে সারা রাত আনন্দে কাটিয়া গেল। চতুর্থ প্রহরে পূজান্তে নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে হোম করা হইল এবং সেই হোমাগ্নিতে মহাপুরুষজী দুই জনকে সন্ন্যাস এবং একজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন। কয়েকজন মন্ত্রদীক্ষাও পাইল।

কলিকাতার নিকট অথচ ভজন-সাধনের অনুকূল এবং স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া মহাপুরুষজী বহুপূর্ব হইতেই জামতাড়ায় ঠাকুরের একটি

আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানটি[1] কি আদর্শে গঠিত হইবে তাহাও তিনি বলিয়াছিলেন, "আশ্রমটি ঠিক ঠিক সাধুর আশ্রমের মত হবে। সাধুরা ভিক্ষা করে এনে নিজেরা রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তাই খাবে আর ভজন-সাধন করবে; বামুন-চাকর থাকবে না।" ভগবদিচ্ছায় জামতাড়ায় আশ্রম হওয়ায় তিনি এইবার তথায় আসিয়া খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়াছিলেন।

ঐ আশ্রমে তখন ভিক্ষার চাউল মাটির হাঁড়িতে রান্না হইত। উহা ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া চলে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "যা রান্না করবে, তাই ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ পাবে।" মহাপুরুষজীর শুভাগমন উপলক্ষে সে সময় আশ্রমে প্রায় বিশ জন সাধু-ব্রহ্মচারী সমবেত হইয়াছিলেন। পাছে কর্মীদের কষ্ট হয়, সেইজন্য তিনি ঐ উৎসবোপলক্ষে একটি লোককে বাসনপত্র মাজিবার জন্য ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন এবং মঠে ফিরিয়া যাইবার সময় লোকটিকে পারিশ্রমিক, বকশিস্ ও একখানি কাপড় দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

চারি দিন আশ্রমের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী, স্থানীয় ভক্তগণ এবং সরলপ্রাণ সাঁওতাল ও বাউরিদিগকে নানাভাবে খুবই আনন্দ দান করিয়া মহাপুরুষজী মঠের দিকে রওনা হইলেন। তাঁহার বিদায়দর্শনের জন্য বহু লোক ফুলের মালা ও মিষ্টান্নাদি লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। জনৈক সাঁওতাল রমণীও আসিয়াছিল চারিটি কাঁচা পেঁপে লইয়া—"বুড়ো বাবা,

১ কাশী অদ্বৈতাশ্রম হইতে ২৮।১১।১৬ তারিখে লিখিত মহাপুরুষজীর একখানি চিঠিতে জানা যায়—"আমরা এখান হইতে মিহিজামে যাইয়া কিছুদিন থাকিয়া জামতাড়ায় একটা আশ্রমের বন্দোবস্ত করিয়া মঠে ফিরিব; এইরূপ মনস্থ করিয়াছি। এখন প্রভুর ইচ্ছায় যাহা হয়।"

তুই চইলে যাইছিঁস—তোকে কী দিব? আমরা বড্ড গরীব—এই পাইপা আইনেছি।" এই বলিয়া মেঝাইন কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই আবার কখনকে আসবি বল?" চারিদিক হইতে 'জয় মহাপুরুষ মহারাজজীকী জয়' ধ্বনির সঙ্গে সাঁওতাল রমণীর ক্রন্দনধ্বনি মিলিত হইতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

তিন-চারি দিনের দর্শনে ঐ সাঁওতাল রমণী 'বুড়ো বাবার' নিকট এমন কী অমূল্য জিনিষ পাইয়াছিল, তাহা সে-ই জানে।

মহাসম্মেলন ও পরে

১৯২৬ সাল শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া দেশে বিদেশে যে বিশাল ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার স্বরূপ নির্ধারণ ও গতিনির্দেশের জন্য ঐ বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে আটদিনব্যাপী বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধু ও ভক্তমণ্ডলীর প্রথম মহাসম্মেলনের অধিবেশন হয়। ভারত ও ভারতেতর স্থানের নব্বইটি প্রধান কেন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে প্রায় দুই শত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়াও, মঠ-মিশনের বহু সাধু, ভক্ত ও হিতৈষী যোগদান করিয়া মহাসম্মেলনকে সর্ববিষয়ে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রতিনিধিগণ একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেমের বিনিময়, ভাবের আদানপ্রদান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে যাঁহারা স্থূলশরীরে বর্তমান ছিলেন, তাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া উপদেশ ও আশীর্বচন মস্তকে ধারণ করিয়া আলাপ-আলোচনাদির দ্বারা সংঘচক্রকে আচার্য বিবেকানন্দ-চিহ্নিত জয়যাত্রাপথে আরও অবাধে দ্রুতগতিতে চালিত করিবার সঙ্কেত ও শক্তি-সঞ্চয় করার জন্যই সম্মেলনের আয়োজন। ঐ মহাসম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হন স্বামী শিবানন্দ এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্বামী সারদানন্দ।

মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিরাট চন্দ্রাতপের নিম্নে সম্মেলনের অধিবেশন-

বেলুড় মঠ

১৯২৬

স্থান মনোনীত হয়। সম্মুখেই কলকলনাদিনী পুণ্যতোয়া জাহ্নবী। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, আচার্য বিবেকানন্দ ও পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের পত্রপুষ্প-সুশোভিত আলেখ্যত্রয় যেন মূর্ত হইয়া মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সকলকে শুভাশীর্বাদ করিতেছিলেন। শিবানন্দ, সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, সুবোধানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণকে পুরোবর্তী করিয়া উপবিষ্ট পূত-শান্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তিনম্র ভক্তবৃন্দকে দেখিয়া মনে হইতেছিল সঙ্ঘের মঙ্গলকামনায় তাঁহাদের ব্যাকুল হৃদয়ের মৌন মিনতি যেন শ্রীভগবানের চরণে নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মনিবেদন করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ত্রিশ বৎসরের কার্য্যপ্রসার-জ্ঞাপক ভারত ও ভারতেতর দেশের খণ্ডাংশ সহ একটি বৃহৎ মানচিত্র বক্তৃতামঞ্চের পশ্চাতে প্রলম্বিত হইয়া সকলকে স্মরণ করাইতেছিল—কিরূপে কতিপয় অখ্যাত যুবককে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া যুগাবতার তাঁহার বাণী অপ্রতিহত গতিতে ও অভাবনীয়রূপে দেশবিদেশে প্রচার করিতেছেন।

১লা এপ্রিল (১৮ই চৈত্র) বৃহস্পতিবার শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তে 'শতরুদ্রীর্যাগ' শেষ হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে মহাসম্মেলনের কার্য আরম্ভ হইল। শিবানন্দ, সারদানন্দ ও অখণ্ডানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্যদগণ এবং সংঘের অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসিবৃন্দ অধিবেশনস্থলে প্রবেশ করিলে সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। উদ্বোধনসঙ্গীত গীত হইবার পরে সভার কার্যসূচী আরম্ভ হইল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'-শীর্ষক সুচিন্তিত অভিভাষণ পঠিত হইবার পরে মহাসম্মেনের সভাপতি স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাঁহার সুদীর্ঘ

অভিভাষণ স্বামী পরমানন্দকে পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। স্বামী শিবানন্দ তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে সমবেত সাধু ও ভক্তমণ্ডলীকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

অভিভাষণটি গম্ভীরভাবসমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উহাতে মহাপুরুষজী অতীতের প্রতি নানাভাবে শ্রদ্ধা-নিবেদন এবং বর্তমানকে প্রাণঢালা আশীর্বাদ করিয়াছেন; আবার ভবিষ্যতের প্রতি সকলের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, "হে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ! আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তাহা হইতে তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন আমাদের সংঘ ভগবদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত থাকিবে, ততদিনই ইহা টিকিবে। প্রীতি, উদারতা, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতাই আমাদের সংঘের ভিত্তি। যদি স্বার্থপরতা ইহার মজ্জায় প্রবেশ করে, তাহা হইলে মানুষের প্রণীত আইনকানুন ইহাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।" উপসংহারে সকলের জন্য শ্রীভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আমি কেবল প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার উপর যেন তোমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে পার। ... তোমাদের সকলের উপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি, যেন তিনি তোমাদিগকে এই জীবনেই সত্য-উপলব্ধির জন্য উপযুক্ত বল ও সাহস-সম্পন্ন করেন।" ঋগ্বেদের মধুসূক্ত উদ্ধৃত করিয়া তিনি অভিভাষণ শেষ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের মঙ্গলেচ্ছা ও স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রভৃতির ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে মহাসম্মেলন সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। শাখাকেন্দ্র হইতে আগত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা সম্মেলনের পরে কিছুদিন বেলুড় মঠে ছিলেন। সাধুগণ বিশেষ করিয়া সকালে এবং রাত্রে মহাপুরুষজীর নিকট সমবেত হইতেন; তিনিও

সকলের সহিত ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়া আনন্দ অনুভব এবং নানা সৎপ্রসঙ্গাদি দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন।

ইহার কিছুদিন পরেই ২রা মে (১৯২৬) মহাপুরুষজী শর্ব্বানন্দ, যতীশ্বরানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীর সহিত পুনরায় দক্ষিণ ভারতে রওনা হইলেন। পথে চারি-পাঁচ দিনের জন্য তাঁহারা ভুবনেশ্বর মঠে নামিয়াছিলেন। একদিন পুরীতে গিয়াও দর্শনাদি করিয়া আসিয়াছিলেন। পুরী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, ভোরবেলা ভুবনেশ্বর মঠের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "পুরীর মন্দিরে যে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি রয়েছে ওসব বৌদ্ধযুগের প্রতীক। পরবর্ত্তী যুগে যখন বৈষ্ণবদিগের প্রাধান্য হল, তখন তাঁরা ঐ সকল মূর্তিকে বর্তমান মূর্তিতে পরিণত করলেন। আমাদের স্বামিজী হচ্ছেন বুদ্ধ, মা সংঘ এবং ঠাকুর ধর্ম। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।' সমুদ্র জগন্নাথদেবের বিরাট মূর্তি। পুরীতে ঠাকুরের একটি স্থান হয় তো বেশ হয়।"[১]

৺পুরীতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্রই মহাপুরুষজী এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। পাণ্ডাগণ যাত্রীর ভীড় সরাইয়া তাঁহার গমন-পথ করিয়া দিতেছিল; তিনি সঙ্গিগণসহ জগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুগ্ধ অনিমেষ নয়নে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন—কোন বাক্স্ফুরণ হইতেছিল না। তাঁহার সেই সময়কার বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, তিনি যেন আনন্দ-রসাপ্লুত প্রাণে কোন-এক অতীন্দ্রিয় ভাবে

---

১ মহাপুরুষজীর জীবৎকালেই পুণ্যতীর্থ শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রের ধারে চক্রতীর্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। পরে সারাটি দিনই মহাপুরুষজী কি রকম যেন যেন আনমনা ছিলেন।[১]

ভুবনেশ্বর হইতে রওনা হইয়া ওয়ালটেয়ারে দুই দিন বিশ্রামানন্তর ১১ই মে মহাপুরুষজী মাদ্রাজ মঠে পৌঁছিলেন। সাধুভক্তগণ যথোচিত সম্বর্ধনা করিয়া তাঁহাকে স্বাগত করিলেন। দুই বৎসর পরে তাঁহাকে পুনরায় নিজেদের মধ্যে পাইয়া মঠবাসী ও ভক্তবৃন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। মঠে ভক্তসমাগম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রায় প্রতিদিনই দীক্ষাপ্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হইত। মহাপুরুষজী কখনও শ্রীশ্রীঠাকুর, মাতাঠাকুরাণী, স্বামিজী বা শশী মহারাজ প্রভৃতির সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ করিতেন; কখনও বা ভজনসাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন অথবা মঠ ও মিশনের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনাদি হইত। ভগবৎপ্রসঙ্গাদি

---

১ মহাপুরুষজী প্রথম কোন্ সালে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় নাই। তিনি একদিন তাঁহার প্রথম দর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "একবার হরি মহারাজের খুব অসুখ, মহারাজও পুরীতে রয়েছেন। তাঁকে দেখবার জন্য আমরা পুরীতে উপস্থিত হলাম। সকলেই জগন্নাথদর্শন করে এলেন; আমার কিন্তু দর্শন করতে যাবার তেমন ইচ্ছা হল না। স্বামিজী অনেক সময় 'দারুমূর্তি, চকানয়ন' ইত্যাদি বলে জগন্নাথকে ঠাট্টা করতেন; তাই শুনে আমারও মনে কেমন-যেন-একটা ভাব হয়েছিল। একদিন মহারাজ বলেই ফেল্লেন, 'কই তারকদা, আপনি জগন্নাথদর্শন করতে গেলেন না?' আমি মনের ভাব প্রকাশ না করে বল্লাম, 'তা দেখা যাবে এখন।' শেষকালে মহারাজের পীড়াপীড়িতে একদিন যেতেই হল দর্শন করতে। কিন্তু যেই মন্দিরে ঢুকে জগন্নাথদেবের সামনে দাঁড়ালাম, অমনি এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গল। এমন একটা গম্ভীরভাব মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললে, তা আর কি বলব!" এই বলিয়াই তিনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন এবং পরে বলিলেন, "জগন্নাথ খুব জাগ্রত দেবতা।"

তিনি এমনই তন্ময়ভাবে করিতেন যে, তখন শ্রোতারা প্রাণে প্রাণে শ্রীভগবানের নিবিড় স্পর্শ অনুভব করিত।

মহাপুরুষজীর মাদ্রাজ-আগমনের সংবাদ পাইয়াই উটকামণ্ডের ভক্তগণ তাঁহাকে তথায় যাইবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছিলেন। তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন এবং ৩রা জুন স্বামী শর্বানন্দ প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া উটকামণ্ড যাত্রা করিলেন। স্থানীয় ভক্তগণ পরম যত্নের সহিত তাঁহাকে দীর্ঘ পাঁচ মাস কাল তথায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এক চিঠিতে জানা যায়, "আমি ৪ঠা জুন মাদ্রাজ হইতে এখানে আসিয়াছি। অতি রমণীয় পর্বত, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮০০০ ফুট উঁচু—সুশীতল, সুদৃশ্য এবং আমরা যে বাড়ীটি পাইয়াছি উহা অতি নির্জন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং well-furnished (আসবাব দ্বারা পরিপাটীভাবে সজ্জিত), চারিদিকে ফুলের বাগান, বৃহৎ প্রাঙ্গণ, নানাপ্রকার গাছপালা—অধিকাংশই ইউকেলিপ্টাস্। এখানকার স্বাস্থ্যও খুব ভাল, শরীর এখানে ভালই আছে। ইহা দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত তীর্থ, বালাজী (তিরুপতি বা ভেঙ্কটেশ্বর) মোহন্ত মহারাজের গ্রীষ্মনিবাস।"

উটকামণ্ডে আসিয়া তাঁহার শরীরও যেমন ভাল ছিল, মনও তেমনি 'আত্মানন্দী' ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি অধিকাংশ সময়ই একাকী আপনভাবে মগ্ন থাকিতেন—লোকসঙ্গ বড় একটা পছন্দ করিতেন না। অবশ্য স্থানীয় ভক্তগণ প্রতিদিনই অপরাহ্লে তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম-প্রসঙ্গাদি শ্রবণ ও তাঁহার পূত আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া পরিপূর্ণ প্রাণে ফিরিয়া যাইতেন। ভক্তসংখ্যাও ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ভক্তগণের সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ-আলাপনের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তিনি আত্মারাম হইয়া যেন 'চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে' ডুবিয়া থাকিতেন। সাধারণভাবে

কথাবার্তা বা মেলামেশা যতটুকু হইত তাহা কেবল সরলমতি পাহাড়ী বালকদিগের সঙ্গে। মনে হইত যেন উচ্চভাব-ভূমি হইতে মনকে নামাইয়া সহজ অবস্থায় রাখিবার জন্যই তিনি এইরূপ করিতেন।

শ্রীহাতিরামজী মঠে নিজপ্রকোষ্ঠে যখন তিনি একাকী বসিয়া থাকিতেন তখন দেখা যাইত, অধিকাংশ সময়ই মুদ্রিত-নয়ন অথবা উদাসদৃষ্টি—যেন কোন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে তাঁহার মন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সেই অবস্থায় তাঁহার নিকট যাইতে ভয় হইত। সমগ্র মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার ত্যাগ করিয়া ঐ নীলগিরি পর্বতের গভীর নীরবতার মধ্যে আপনভাবে ডুবিয়া থাকিয়া জীবনের কয়টা দিন কাটাইয়া দিবেন, তাহাও সময় সময় বলিতেন। কোন কিছুতেই আঁট নাই; সকল ব্যাপারেই যেন উদাসীন ও নির্লিপ্ত ভাব!

ঐ সময়ে তিনি যে কতটা রামকৃষ্ণময় হইয়া থাকিতেন, তাহা একখানি চিঠি হইতে জানিতে পারা যায়, "আমার ভিতর ঠাকুর ছাড়া আর কি আছে? আমার মন-প্রাণ-দেহ সবই তিনি। জগতে জীবকে বিশ্বাস, ভক্তি-প্রীতি, মুক্তি দিবার জন্যই আমাদের এখনও জীবিত রেখেছেন। তোমাদের কোন চিন্তা নেই, বাবা। তোমরা সব তাঁরই হইয়া গিয়াছ তাঁর কৃপায়।"

কিন্তু নির্জনে এই একান্ত অবস্থিতির মধ্যেও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজের জন্য তাঁহার উৎসাহদানের বিরাম ছিল না। উটী হইতে তিনি জনৈক কর্মীকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি ঠাকুরের কাজ যেরূপ করিতেছ করিয়া যাও—কাজের কথা যেরূপ লিখিয়াছ উত্তম হইতেছে। ঠাকুরের কৃপায় এইরূপ কাজই স্বামিজীর প্রাণের ইচ্ছা। তুমি করিয়া যাও। তোমার ভক্তি-মুক্তির বিষয় ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি ও আমরা বুঝিব। তোমার

সেজন্য ভাবনা নেই। সত্যপথে থেকে স্বার্থশূন্য হয়ে জীবসেবা করিতে থাক। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমার শরীরটা কর্মপটু, বিশ্বাস হিমাচলের ন্যায় দৃঢ় ও অটল হোক। ··· ঠাকুর আমাদের এই বুড়ো বয়সেও বসে খেতে দেবেন না—কাজ করিয়ে নেবেন ও নিচ্ছেন।”

ইহার পূর্ব বারে উটীতে আসিয়া মহাপুরুষজী যে আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন উহার নির্মাণকার্য সমাধা করিয়া মহাপুরুষজীর দ্বারা আশ্রমে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভক্তেরা খুব যত্নপর হইলেন। তাঁহার অবস্থান উটীতে গভীর আধ্যাত্মিক পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিশাল ভক্তচক্রটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রভাব সমগ্র নীলগিরি পর্বতে ছড়াইয়া পড়িল। তাহা ছাড়া মাদ্রাজ প্রদেশের নানা স্থান হইতে যে-সকল ভক্ত ধর্মজীবন লাভ করিবার জন্য দিনের পর দিন মহাপুরুষজীর নিকট আসিতেছিলেন তাঁহাদের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। তাঁহারা নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া গিয়া নিজেরা যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন তাহার বার্তা পরিচিত ব্যক্তি ও আত্মীয়বর্গের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন। নীলগিরি পর্বতের সুদূর প্রান্ত হইতে দলে দলে লোক মহাপুরুষজীকে দর্শন করিবার জন্য হাতিরামজী মঠের স্তব্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে আসিত। তাহাদের মধ্যে পার্বত্য অধিবাসীও ছিল অনেক। কখনও বা তাহারা আসিত উচ্চ সংকীর্তন করিতে করিতে যেন দেবদর্শনে আসিয়াছে এবং অনেক সময় মহাপুরুষজীর দর্শনলাভের পর সানন্দে তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য-গীতাদি করিত। মহাপুরুষজীও সকলকে উপদেশ ও মিষ্টান্নাদি-প্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। যুগাবতার রামকৃষ্ণের প্রসাদের মহিমা অপার!

মহাপুরুষজীর হাতে পরিবেশিত ভবরোগ-ঔষধরূপ ঐ প্রসাদ যাহারা গ্রহণ করিত তাহাদের প্রাণে ভগবদ্‌ভক্তির বীজ উপ্ত হইয়া যাইত।

নীলগিরি পার্বত্যপ্রদেশের অধিবাসীরা যদিও প্রায় সকলেই হিন্দুধর্মাবলম্বী, তথাপি তাহারা নানা কারণে বৈদিক ধর্মের প্রভাব হইতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সুযোগে খৃষ্টধর্ম-প্রচারকবর্গ গরীব ও অশিক্ষিত পাহাড়ীদিগকে নানাভাবে প্রলোভিত করিয়া দলে দলে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষালয় প্রভৃতি খুলিয়া হিন্দুধর্মবিরোধী শিক্ষাপ্রচার দ্বারা সগৌরবে খৃষ্টধর্মের ধ্বজা-উত্তোলনে তৎপর ছিলেন। মহাপুরুষজীর উপদেশে ঠাকুরের ভক্তগণ নানাস্থানে গিয়া পাহাড়ীদিগের সহিত সৎপ্রসঙ্গ, সদালোচনা এবং ভজনকীর্তনাদি করিতে থাকায় তাহাদের ভিতর সুপ্ত হিন্দুধর্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে ভজনমণ্ডপ ও সদালোচনা-সভা গড়িয়া উঠিল এবং মিশনের পক্ষ হইতে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটি স্কুল-স্থাপনের আয়োজনও ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারের ফলে খৃষ্টান মিশনারিগণের কাজ অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেজন্য তাঁহারা বিশেষ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষকে তত সুনজরে দেখিতেন না। উটীতে একদিন সকালবেলা মহাপুরুষজী জনৈক সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। পথে জনৈকা মিশনারি প্রচারিকার সঙ্গে দেখা হইতেই মহাপুরুষজী সুপ্রভাত জানাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন; কিন্তু সেই প্রচারিকা অভিবাদনের প্রত্যুত্তর না জানাইয়া মহাপুরুষজীর প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া অবজ্ঞাভরে মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেলেন। প্রচারিকার ঐ প্রকার অভদ্র ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া সঙ্গী সন্ন্যাসী মহাপুরুষজীকে

অনুযোগের সুরে বলিয়াছিলেন, "আপনি ওকে অভিবাদন করতে গেলেন কেন? প্রচারিকা আপনাকে কতখানি অপমানিত করে চলে গেল?" সন্ন্যাসীর মনে হইয়াছিল যে, মহাপুরুষজী ঐ প্রচারিকাকে পাশ্চাত্ত্য মহিলা বলিয়াই অভিবাদন করিয়াছিলেন এবং উহা তাঁহার পাশ্চাত্ত্যের প্রতি সম্মানের অভিব্যক্তি মাত্র। মহাপুরুষজী ধীরভাবে বলিলেন, "তাতে আর হয়েছে কি? মাতৃজাতিকে সম্মান করতে হয়—তা যে দেশেরই হোক। 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—সেই জগজ্জননীই জগতের সকল স্ত্রীরূপে রয়েছেন।"

ভক্তগণের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আশ্রমবাড়ী-নির্মাণকার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। যদিও তিনি মঠ-মিশনের অন্যান্য কেন্দ্র-পরিদর্শনার্থ স্থানান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের সবিশেষ আগ্রহে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আশ্রমপ্রতিষ্ঠা পর্যন্ত উটীতে থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার ৫।৭।২৬ তারিখের চিঠিতে জানা যায়, "উহার (আশ্রমবাড়ীর) নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। একমাসের মধ্যই হইয়া যাইবে এবং প্রতিষ্ঠাও হইবে। ঠাকুর তাঁর দাসের দ্বারাই ঐ মঠে প্রতিষ্ঠিত হইবেন দেখিতেছি। সব তাঁর ইচ্ছা—তাঁর মহিমা।"

মহাপুরুষজী শুভদিনে (২৪শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯২৬) উটী আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আশ্রমের গৃহপ্রবেশকার্য সম্পাদন করেন। ঐ উপলক্ষে মাদ্রাজ প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে অনেক সন্ন্যাসী উটকামণ্ডে সমবেত হইয়াছিলেন। মহাপুরুষজী যে বাড়ীতে[১]

---

১ উটীতে প্রায় দুই মাস কাল 'হাতিরামজী মঠে' বাস করিয়া মহাপুরুষজী 'গোদাবরী হাউস' নামক বাংলাতে স্থান-পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে নূতন মঠ পাঁচ মিনিটের পথ মাত্র।

থাকিতেন তথা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি বড় প্রতিকৃতি এবং শ্রীশ্রীমা ও স্বামিজীর ছবি পত্রপুষ্পমাল্যাদিতে সুসজ্জিত করিয়া ভজনকীর্তন করিতে করিতে মহাসমারোহে শোভাযাত্রাসহ সকলে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হন। মহাপুরুষজীও অন্যান্য সাধুসহ শোভা-যাত্রার পুরোভাগে চলিয়াছিলেন—বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠ এবং নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনিতে পর্বত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শোভাযাত্রা আশ্রমের নিকটবর্তী হইলে মহাপুরুষজী ঠাকুরের ছবিখানি বহন করিয়া আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। ঐ দেশের প্রথানুসারে ঠাকুরকে কর্পূরের আরতি করার পরে তিনি আশ্রমের ঠাকুরঘরে শ্রীপ্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেই পূজা ও ভোগ নিবেদন করেন। সমবেত সকলের মধ্যে প্রসাদবিতরণের পর মঠ-কমিটির সেক্রেটারী রিপোর্ট পাঠ করিলেন। বৈকালে শ্রীরামনাম-সংকীর্তন, ভজন এবং ইংরেজী ও তামিল ভাষায় বক্তৃতাদি হইয়াছিল। লোকজনের উৎসাহ দেখিয়া মহাপুরুষজী খুব আনন্দিত হন।

উটী মঠে ঠাকুরের নিত্যসেবা-পূজাদির ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ কর্মধারার প্রবর্তন করিয়া মহাপুরুষজী একজন যোগ্য সন্ন্যাসীর উপর মঠপরিচালনার ভারার্পণ করেন। প্রায় পাঁচ মাস নীলগিরিতে অবস্থান করিয়া ২২শে অক্টোবর তিনি বাঙ্গালোরে আসিলেন এবং তথায় প্রায় এক মাস ছিলেন। পূর্ব বারের ন্যায় এইবারও তাঁহার পুণ্যসঙ্গলাভ করিবার জন্য বহু ভক্ত প্রতিদিন আশ্রমে সমবেত হইতেন।

মহাপুরুষজী ভজনগান অত্যন্ত ভালবাসিতেন—সেজন্য আশ্রমে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধ্যান-জপের পরে ঠাকুরের সম্মুখে ভজনগানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐ ভজনে বহুলোক যোগদান করিয়া সবিশেষ আনন্দলাভ

করিত। ভগবৎপ্রসঙ্গে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না; ভক্তগণ আসিলেই তিনি নানা সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা তাহাদের প্রাণে আনন্দ দিতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "ভক্ত কে? স্বয়ং ভগবানই নিজলীলা আস্বাদন করবার জন্য একাংশে ভক্তরূপে আবির্ভূত হন। সেজন্যই তো ঠাকুর বলতেন, 'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান' আর প্রণাম করতেন। ভগবানের বাণীই ভাগবত, আর ভগবানের আসন ভক্তহৃদয়। তিনি কৃপা করে সভক্ত মানুষরূপ পরিগ্রহ না করলে জগৎ তাঁকে বুঝবে কি করে? জীবকে মুক্তি দেবার জন্যই তিনি ভক্তরূপে আসেন; আর লীলাসম্বরণ করে চলে যাবার পরেও তাঁর শক্তি জগতে কাজ করে, ভক্তকে আশ্রয় করে। দেখ না, ঠাকুরের দেহত্যাগের পরও সেই ঐশী শক্তির প্রেরণায় কত শত ভক্ত এখনও আসছে তাঁর ভাবপ্রচারের জন্য। আহা, কি সুন্দর!—স্বয়ং ঈশ্বরই ভক্তরূপে আসেন! যদিও তিনি বিরাট অনন্ত, তবু জীবোদ্ধারের জন্য সান্ত হয়ে আমাদের সামনে আসেন। ভগবান যে মানুষরূপে আসেন—তা ঠাকুরকে না দেখলে ঠিক ঠিক বুঝতে পারা সম্ভব হত না। আর ভগবান যে কত দয়াময় তাও কতকটা বুঝতে পেরিছি ঠাকুরকে দেখেই।"

বাঙ্গালোর হইতে মহাপুরুষজী ১৮।১১।২৬ তারিখে মাদ্রাজে ফিরিলেন। নেত্রামপল্লীর জনসাধারণ ব্যাকুল আগ্রহে তাঁহাকে তথায় পদার্পণ করিবার জন্য বারংবার প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। মহাপুরুষজী উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তদনুসারে তিনি মাদ্রাজের মঠাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সহিত ৬ই ডিসেম্বর নেত্রামপল্লী যান। স্থানীয় পঞ্চায়েত রামকৃষ্ণ মিশনকে শিল্পভবনের জন্য পাঁচ একর উত্তম

জমি প্রদান করিয়াছিল। মহাপুরুজী ১০ই ডিসেম্বর ঐ জমিতে রামকৃষ্ণ-শিল্পভবন ও ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন করিলেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুশোভিত প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা মহাপুরুষজীকে পুরোবর্তী করিয়া ভজনগান করিতে করিতে ভিত্তিস্থাপন-অনুষ্ঠানের জন্য নবনির্মিত মণ্ডপে উপস্থিত হইল। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে মহাপুরুষজীকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। অভিনন্দনের উত্তরে মহাপুরুষজী জনসাধারণের উৎসাহে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সকলকে ধন্যবাদ ও আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে স্বামী যতীশ্বরানন্দ অভিনন্দনের যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। বক্তৃতাদির পরে বিপুল-উৎসাহসূচক জয়ধ্বনির মধ্যে মহাপুরুষজী রৌপ্যকর্ণিকের দ্বারা শিল্পভবন ও ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন করিলেন।

মহাপুরুষজী একদিন নেত্রামপল্লী পঞ্চায়েত বিদ্যালয়ও পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার শুভাগমনে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ খুব উৎসাহিত হইয়াছিল। পাঁচদিন নেত্রামপল্লীতে কাটাইয়া তিনি মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন।

কয়েকদিন পরেই মহাপুরুষজী মাদ্রাজ মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দ এবং অন্যান্য কয়েক জন সন্ন্যাসীর সহিত ১৯শে ডিসেম্বর বোম্বাই রওনা হইলেন। দুই বৎসর পূর্বে তিনি বোম্বাইতে যে নূতন আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, এখন তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বিশেষভাবে আহূত হইয়া তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। ২৬শে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠার শুভদিন ধার্য হইয়াছিল। ঐ দিন খুব ভোর হইতেই ভক্তগণ প্রচুর ফল, ফুল,

মিষ্টান্নাদি পূজোপকরণসহ ভক্তিনম্রপদে আশ্রমে সমবেত হইতেছিলেন—তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন গুজরাটী, মারাঠী, মাদ্রাজী, পার্শী, বাঙ্গালী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক। শুভমুহূর্তে উল্লসিত জয়ধ্বনির মধ্যে মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া নবনির্মিত ঠাকুরঘরে লইয়া গেলেন এবং অতি সন্তর্পণে সিংহাসনে বসাইয়া পূজা ও ভোগনিবেদন করিলেন। যখন তিনি তাঁহার 'প্রাণেশ্বর' ঠাকুরকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছিলেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এমন আবেগভরে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করিতেছিলেন যে, মনে হইতেছিল তিনি যেন জীবন্ত ঠাকুরকে বসাইতেছেন। সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। প্রতিষ্ঠাকার্য সমাপ্ত হইলে স্বামী শর্বানন্দ যথাবিধি ষোড়শোপচারে পূজা ও হোমাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সেদিন সর্বক্ষণ ভজনকীর্তন, পাঠ, সৎপ্রসঙ্গ, ভক্তসমাগম ও প্রসাদবিতরণাদিতে যেন আনন্দের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল।

ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পরে মহাপুরুষজী একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া আশ্রমকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করিতে যত্নপর হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সাধু-ভক্তদের প্রাণে একটা নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। নূতন নূতন ভক্ত আসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক স্পর্শ লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরতরে আত্মনিবেদন করিলেন।

সে সময়ে আশ্রমে ধর্মপ্রসঙ্গ, ভজনকীর্তন, পাঠ, আলোচনা প্রভৃতি এমন ভাবে চলিতেছিল যে, সকলেই একটা জাগ্রত উদ্দীপনা অনুভব করিতেন। মহাপুরুষজীও ঠাকুর-স্বামিজীর প্রসঙ্গাদি দ্বারা সকলের প্রাণে

প্রভৃত আনন্দ দিতেন।[১] পঞ্চবটীতে (নাসিকে) তপস্তারত মঠের জনৈক সাধু অতি মধুর ভজনসঙ্গীতাদি গাহিতে পারিতেন। মহাপুরুজীর আগমন-সংবাদে তিনি বোম্বাই আশ্রমে আসিয়া রহিলেন এবং প্রতিদিন মহাপুরুষজীকে ভজন-কীর্তনাদি শুনাইতেন। একদিন সেই সাধুটি "হে গোবিন্দ রাখ্ শরণ অবতো জীবন হারে" ইত্যাদি গানটি গাহিতে-ছিলেন; শুনিয়া মহাপুরুষজী খুব অভিভূত হইয়া কেবলমাত্র 'আহা! আহা!' বলিতে লাগিলেন। চক্ষু ছলছল—গভীর তন্ময়ভাব! তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে, স্বামিজীর মুখে ঐ গানটি শুনিয়াছিলেন। বহুকাল পরে ভজনটি শুনিয়া তাঁহার সেই পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। ঐ ভজনটি তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, প্রায় প্রতিদিনই অন্যান্য গানের সঙ্গে ঐ গানটিও গাহিতে হইত এবং তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন।

তখন শীতকাল। একটু বেলা হইলে মহাপুরুষজী একাকী সমুদ্রের ধারে জুহু প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যাইতেন এবং কোন কোন দিন সমুদ্রের ধারে জেলেপাড়াতে গিয়া তাহাদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরও দর্শন করিতেন। জেলেপাড়ায় সকলেই মহাপুরুষজীকে খুব শ্রদ্ধা করিত। ঐ সন্ন্যাসিপ্রবর তাহাদের 'শিব'কে ভক্তিভরে দর্শন করিতে যাইতেন বলিয়া জেলেদের আর আনন্দের অবধি ছিল না।

১৪ই ফেব্রুয়ারী মহাপুরুষজী বোম্বাই আশ্রমে দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করেন। সকল শ্রেণীর বহু ভক্ত ও সর্বসাধারণ ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

বোম্বাইতে অবস্থানকালে মহাপুরুষজী সাধু-ভক্তদিগকে যে-সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা ভক্ত-সাধকগণের প্রাণে ভগবদ্ভাবের উদ্দীপনা

১ ঐ সকল প্রসঙ্গ কিছু কিছু 'শিবানন্দ-বাণী' ১ম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

আনিয়া দেয়। একখানি চিঠিতে রহিয়াছে, "শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে যাহারা আত্মনিবেদন করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে এমন কি শেষমুহূর্ত্তেও তাঁহার নিকট টানিয়া লইবেন। অবশ্য যতদিন সংসারে থাকিতে হইবে ততদিন যাহার যে কাজ তাহাকে সেই কাজই করিয়া যাইতে হইবে। ঠাকুরের আশ্রিত ভক্তদিগের মুক্তি নিশ্চয়।"

বোম্বাইর কাজের সাফল্য সম্বন্ধে মহাপুরুষজী এক চিঠিতে লিখিয়াছেন, "বোম্বাইতে ঠাকুর-স্বামিজীর ভাব তাঁর ইচ্ছায় খুব প্রচার হইতেছে। শিক্ষিতশ্রেণীর লোক খুব **interest** নিতে (আগ্রহান্বিত হইতে) আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা শুভ লক্ষণ। জয় ঠাকুর, ধন্য ঠাকুর—সবই তোমার মহিমা! এই সকল যুগধর্মস্থাপনের লক্ষণ—এখনও এইরূপ কত হইবে, তার ইয়ত্তা নাই।"

মহাপুরুষজী ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৭) বোম্বাই পরিত্যাগ করিয়া মঠের দিকে রওনা হইলেন। স্থানীয় ভক্তগণের সবিশেষ অনুরোধে পথিমধ্যে তাঁহাকে প্রায় এক সপ্তাহের জন্য নাগপুরে নামিতে হইয়াছিল। পূর্ববারের ন্যায় এবার তিনি কোন ভক্তগৃহে না থাকিয়া আশ্রমের জমিতেই বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভক্তগণ তাঁবু খাটাইয়া তাঁহাকে তথায় রাখিলেন। যদিও তখন আশ্রমবাড়ীর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয় নাই, তথাপি মহাপুরুষজীর অবস্থানের ফলে ঐ স্থান যেন আশ্রমে পরিণত হইয়য়াছিল। প্রতিদিন ভজনকীর্তন, সৎপ্রসঙ্গ ও বহুভক্ত-সমাগমে স্থানটি উৎসবমুখরিত হইয়া থাকিত। ঐসময় বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি সঙ্গী সন্ন্যাসিগণ ও ভক্তপরিবৃত হইয়া কোন কোন ভক্তগৃহে গিয়া আনন্দ-উৎসবও করিয়াছিলেন। নাগপুরে তিনি অনেককে দীক্ষাদানও করেন। তাঁহার আগমনে ভক্ত ও হিতৈষিবর্গের প্রাণে এতটা উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছিল যে,

তাঁহারা তাড়াতাড়ি আশ্রম-বাড়ীর নির্মাণকার্য শেষ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

মহাপুরুষজীর নাগপুরে অবস্থানকালে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী মাধবানন্দ তথায় আসেন এবং তাঁহার শুভাশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া রাজকোটে শ্রীশ্রীঠাকুরের নূতন আশ্রমস্থাপনের জন্য গিয়াছিলেন।

প্রায় দশ মাস পরে মহাপুরুষজী বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। মঠে আসার পরেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার ৩।৩।২৭ তারিখের চিঠিতে জানা যায়—"আমরা ২২শে ফেব্রুয়ারী নাগপুর হইতে ঠাকুরের মঠে আসিয়া পৌছিয়াছি। দুই-তিন দিন পরে অতিশয় সর্দি ও হাঁপানি হইয়াছিল। আজ একটু ভাল তাঁর কৃপায়।"

কয়েক দিন পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপূজা অতি সাত্ত্বিকভাবে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। সেই দিন সকাল হইতে মহাপুরুষজীর হৃদয়ের কৃপার দ্বার যেন উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল—বহু ভক্ত মন্ত্র-দীক্ষা পাইল, সহস্র সহস্র ভক্ত তাঁহার পুণ্যদর্শন ও আশীর্বাদ-লাভে পরিতৃপ্ত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসবও আশাতীত সাফল্যের সহিত বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বেলুড় মঠে ফিরিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—কোন-না-কোন অসুখ লাগিয়া থাকিত। ঐ সময় হইতেই তাঁহার রক্তের চাপও বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবপ্রচারে সদাই তৎপর থাকিতেন। সংঘচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমপ্রসারের জন্য তাঁহার যত্নের অন্ত ছিল না। দীক্ষা-প্রার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। তিনি শ্রীগুরুদেবের চরণে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার দ্বারা চালিত যন্ত্রের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতেছিলেন।

মহাসম্মেলন ও পরে

মহাপুরুষজীর বিশেষ ইচ্ছায় শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের সম্মুখে চালা বাঁধিয়া প্রকাণ্ড একটি কুণ্ড করিয়া সপ্তশতী হোম করা হয়। ঐ কার্যে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্বামী ওঁকারানন্দ। হোমের সতর জন ব্রতী প্রায় একমাস পূর্ব হইতেই সমগ্র শ্রীশ্রীচণ্ডী সুরসংযোগে সমস্বরে আবৃত্তি-অভ্যাস করিতেছিলেন। হোমের পূর্বদিন মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া মন্দিরের ভিতর ঘটস্থাপন এবং ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা ও ভোগরাগাদি হয় এবং ব্রতীরা সমস্বরে চণ্ডীপাঠ করেন। হোমের দিন প্রাতে ঘটে ৺চণ্ডীর পূজা করিয়া হোম আরম্ভ হয়। বহু সাধু ও ভক্ত ব্যতীত মহাপুরুষজী নিজেও উপস্থিত ছিলেন এবং 'শক্রাদিস্তব' সকলের সঙ্গে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ব্রতীদিগের সমস্বরে আবৃত্তির গম্ভীর শব্দ গঙ্গাবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল এবং সকলেই প্রাণে একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছিলেন। হোম সমাপ্ত হইতে দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

মহাপুরুষজীর আদেশে পরেও আর কয়েক বার সপ্তশতী হোম মঠে এবং অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯২৭ সালের জুন মাসে দেওঘর বিদ্যাপীঠের জনৈক সন্ন্যাসী কঠিনযক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া বেলুড় মঠে আসেন। তাঁহার আরোগ্য সম্বন্ধে সকলেই এক প্রকার নিরাশ হইয়াছিলেন এবং রোগীও প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সুচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে মাদ্রাজ পাঠাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। মঠের দাতব্য চিকিৎসালয়-বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বের ঘরে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহাপুরুষজী প্রতিদিন নিজের হাতে ফল বা অন্য কোন পথ্য তাঁহাকে দিয়া আসিতেন এবং দেবদূতের ন্যায় রোগীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নানাভাবে উৎসাহ ও আশার বাণী শুনাইতেন।

মাদ্রাজ স্বাস্থ্যনিবাসে দীর্ঘ দিন অবস্থান ও চিকিৎসাদির ফলে আরোগ্য লাভ করিয়া পরে উক্ত সন্ন্যাসী একদিন মহাপুরুজীর অপার্থিব স্নেহ-ভালবাসার কথায় সজলনয়নে বলিয়াছিলেন—"আমায় মাদ্রাজ সেনিটরিয়ামও ভাল করে নি, আর ডাক্তাররাও সারায় নি, আমাকে বাঁচিয়েছেন মহাপুরুষ মহারাজ। তাঁর আশীর্বাদেই আমি সেরে গেছি। তিনি রোজ আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে খুবই আবেগভরে বলতেন, 'আমি বলছি তুমি সেরে যাবে। আমার কথা বিশ্বাস কর—ঠাকুর তোমায় ঠিক বাঁচিয়ে দেবেন।' রোজ এমনি করে আমায় বলতেন। তাঁকে দেখলেই আমার কান্না পেত; তিনি কিন্তু আমায় খুব আশ্বাস দিতেন, আর কত কথা বলতেন। তাঁর কথা শুনে আমার মনে হত ইনি তো মহাপুরুষ, ঠাকুরের সন্তান, ইনি যখন অত করে রোজ বলছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই বেঁচে যাব—এঁর কথা কি মিথ্যা হতে পারে? মহাপুরুষজীর দয়ার কথা আর কি বলব?"

ইহার কয়েক মাস পরেই সমগ্র মঠ ও মিশনে একটি কঠিন আঘাত আসিল। ১৯শে আগষ্ট স্বামী সারদানন্দ দেহত্যাগ করিলেন। ৬ই আগষ্ট সন্ধ্যার পরে তিনি সন্ন্যাসরোগাক্রান্ত হন এবং সঙ্গেসঙ্গেই বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া যান। ঐ সংবাদ পাওয়া অবধি মহাপুরুষজী অতিশয় বিমর্ষ ও গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল উৎকণ্ঠা ও মহা-দুশ্চিন্তার ঘন ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি সর্বদা আনমনা হইয়া থাকিতেন, আর কেবলই ব্যস্তভাবে শরৎ মহারাজের খবর লইতেন। মঠের পাশে মাড়োয়ারীদিগের বাগানে টেলিফোন ছিল, দিবারাত্র চব্বিশ ঘন্টা মঠের কোন-না-কোন সাধু ঐ টেলিফোনের কাছে বসিয়া থাকিতেন এবং মহাপুরুষজীকে শরৎ মহারাজের খবর আনিয়া দিতেন।

মহাসম্মেলন ও পরে

স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগের সংবাদ শুনিয়া মহাপুরুষজী শোকে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার করুণ মূর্তি যে দেখিয়াছে সে তাহা জীবনে ভুলিতে পারিবে না। মর্মান্তিক দুঃখে অভিভূত হইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি ঠাকুরের প্রতি অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর, তোমার কর্মক্ষম ছেলেদের সব তুমি নিয়ে গেলে, আর রাখলে অথর্ব আমাকে! তোমার কী কাজ করতে পারব?" সে করুণস্বরে পাষাণও বিগলিত হয়। ক্রমে সেই শোকাবেগ প্রশান্ত গাম্ভীর্যে পরিণত হইয়াছিল।

স্বামী সারদানন্দ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইবার কয়েক দিন পূর্বে মঠে আসিয়া গভর্নিংবডির মিটিংএ যোগদান করিয়াছিলেন; উহাই স্থূল-শরীরে তাঁহার শেষ মঠে আসা। ঐ দিন সকালবেলার অধিবেশনের পরে দ্বিপ্রহরে মহাপুরুষজী ও শরৎ মহারাজ দুই জনেই মহাপুরুষজীর ঘরে মেঝেতে পাশাপাশি বসিয়া আহারাদি করিয়াছিলেন। খাবার পরিবেশনের পর সেবকগণকে ঐ ঘর হইতে চলিয়া যাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। দুই ভাই পাশাপাশি বসিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবৎ কত কথাই না বলিয়াছিলেন—কখনও চুপি চুপি একে অন্যের কানের কাছে মুখ আনিয়া, কখনও বা একটু উচ্চৈঃস্বরে! আর কি দিব্য হাসি! এক একবার দেখা যাইতেছিল- মহাপুরুষজী শরৎ মহারাজের কাঁধে বাম হাত রাখিয়া সোহাগভরে কথা বলিতেছেন। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য—বয়স, পদমর্যাদা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া গিয়া যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণতলে উপবিষ্ট দুইটি দেবশিশু—সেই অতীতের তারক আর শরৎ!

সেইদিন সন্ধ্যার পূর্বে উদ্বোধনে ফিরিয়া যাইবার সময় মহাপুরুষজীকে বিদায়প্রণাম করিয়া স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছিলেন, "দেখুন মহাপুরুষ,

শরীরটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। বোধ হয় আর বেশী দিন টিক্‌বে না।" তাহা শুনিয়া মহাপুরুষজী তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন, "সে কি বলছ? ঠাকুর যত দিন রাখবেন তত দিন থাকতেই হবে। এই দেখ না, আমাকেই এত বুড়ো বয়স পর্যন্ত তিনি রেখে দিয়েছেন। ও সব কিছু ভেবো না।" কথা বলিতে বলিতে সিঁড়ি পর্যন্ত আসিয়া সেই দিন মহাপুরুষজী শরৎ মহারাজকে বিদায় দিয়াছিলেন। দুই জনের মধ্যে স্থূলশরীরে ঐ শেষ কথাবার্তা।

শরৎ মহারাজের দেহত্যাগে মহাপুরুষজীর প্রাণে যে কত গভীর আঘাত লাগিয়াছিল তাহা ঐ সময়কার কয়েকটি মাত্র কথা হইতে বুঝা যায়—"শরৎ মহারাজের দেহত্যাগে আমার যেন ডান অঙ্গ ভেঙ্গে গেছে; মন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। আমিও তখনই যাবার জন্ত প্রস্তুত হয়েছিলাম। শরৎ মহারাজের শরীর যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরও খুব খারাপ হয়েছিল, আর কাজকর্ম থেকে মন একেবারে উঠে গিয়েছিল। ঠাকুরকে ধরেছিলাম যে, আমি আর থাকব না। ঠাকুর তা শুনলেন না। তিনি জোর করে রেখে দিলেন—তাই আছি। কেন যে তিনি যেতে দিলেন না, তা তিনিই জানেন। সবই তাঁর ইচ্ছা। যতদিন রাখবেন, থাকতেই হবে।"

স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগজনিত নিদারুণ শোকে অল্পদিনের মধ্যেই মহাপুরুষজীর স্বাস্থ্যও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; অসুখের প্রাবল্য এবং মানসিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জীবনসম্বন্ধেও সকলে শঙ্কিত হইলেন। সুচিকিৎসা ও সেবাযত্নাদির ফলে চৌদ্দ দিন রোগ-ভোগের পর তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিলেন। ডাক্তারগণের পরামর্শে তাঁহার বায়ুপরিবর্তনে যাওয়া স্থির হইল। জনৈক প্রবীণ

ভক্তের অনুরোধে মহাপুরুষজী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে উক্ত ভক্তের মধুপুরের প্রাসাদোপম 'শেঠভিলা' নামক বাড়ীতে গমন করেন। মধুপুরের জলহাওয়া, 'শেঠভিলার' নির্জন আবেষ্টনী এবং ভক্তগণের দেবোচিত সেবাযত্নাদির ফলে মহাপুরুষজীর স্বাস্থ্য ক্রমে ভাল হইতে লাগিল। তথায় তিনি প্রায় দুই মাস ছিলেন। ঐ সময় মঠের অনেক সাধু ও পরিচিত ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তথায় গমন করিতেন। 'শেঠভিলা' যেন মঠে পরিণত হইয়াছিল—সাধুভক্তদিগের জন্য অবারিতদ্বার।

মধুপুর হইতে কতকটা স্বাস্থ্যলাভ করিয়া মহাপুরুষজী ২২শে নভেম্বর কাশী আসিলেন; তাঁহার শুভাগমনে কাশী অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রমের সাধু-ভক্তদিগের প্রাণ বিমল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অদ্বৈতাশ্রমের দোতলায় কোণের ঘরটিতে তিনি থাকিতেন। প্রতিদিন, বিশেষ করিয়া সকালে ও বৈকালে, তাঁহার ঘর ও সম্মুখের লম্বা বারান্দা সাধু-ভক্তসমাগমে ভরিয়া যাইত। তিনিও মহানন্দে সকলের সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গাদি করিতেন। অদ্বৈতাশ্রমকে মহাপুরুষজী খুবই ভালবাসিতেন এবং ঐ শিবক্ষেত্রে বিশেষ আধ্যাত্মিক উল্লাস অনুভব করিতেন। একদিন বলিলেন, "এই কাশীক্ষেত্রের সবটাই শিবের শরীর। আমরা শিবের মধ্যে বাস করছি।" অন্য একদিন কাশী-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এ হচ্ছে মহাশ্মশান। এখানে গৃহস্থদের সংসার করা ঠিক নয়। যারা ভগবানকে ডাকবে, তাঁর নাম করবে, তাদেরই এখানে থাকা উচিত।"

একদিন সকালবেলা যথারীতি দুই আশ্রমের সাধুগণ একে একে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্বাদগ্রহণানন্তর ফিরিয়া

যাইতেছিলেন, এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, কাল রাত্রে একটা ভারী মজা হয়েছে। গভীর রাত, শুয়ে আছি। হঠাৎ দেখি যে এক শ্বেতকায় পুরুষ, জটাজূটধারী, ত্রিনয়ন—সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিব্য কান্তিতে চারিদিক আলোকিত হয়ে গেছে! আহা! কী সুন্দর কমনীয় মূর্তি—কী সকরুণ চাহনি! তাঁকে দেখামাত্রই ভেতর থেকে মহাবায়ু একেবারে গড় গড় করে উপরের দিকে উঠতে লাগল—ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম, খুব আনন্দ। এমন সময় দেখি যে, সে মূর্তি ক্রমে বিলীন হয়ে গেলেন, আর তাঁর স্থানে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন—সহাস্যবদন। আমায় হাত দিয়ে ইসারা করে বল্লেন, 'তোর এখন থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ আছে।' ঠাকুরের এই বলার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার নীচের দিকে আসতে লাগল এবং প্রাণবায়ুর ক্রিয়াও চলতে লাগল। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমি কিন্তু বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।"

সন্ন্যাসী—আপনি কি স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন ?

মহাপুরুষজী—না হে, জেগে জেগে।

এইমাত্র বলিয়াই তিনি সেই কথা চাপা দিয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। মহাপুরুষজী নিজের দর্শনাদি সম্বন্ধে কদাচিৎ বলিতেন; কিন্তু সেই দিন বিশ্বনাথ ও ঠাকুরের যুগপৎ দর্শনে তাঁহার এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি সেই আনন্দের ভাব যেন চাপিতে না পারিয়াই ঐ দর্শনটি সম্বন্ধে সামান্যমাত্র বলিয়াছিলেন।

শিবকল্প শিবানন্দকে মরজগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া স্বস্বরূপে লীন করিবার জন্য বিশ্বনাথের আবির্ভাব, আবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের যে

শক্তি যুগধর্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের 'যুগধর্ম-সহায়ককে' কাজ বাকী আছে বলিয়া স্বরূপে লীন হইতে না দেওয়া—ঐ দৈবী প্রহেলিকার রহস্য-উদঘাটন মানববুদ্ধির অগম্য। মহাপুরুষজী কিন্তু অতি সহজভাবেই ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতাশ্রমের উপর তলায় যাইবার সিঁড়িতে উঠা মহাপুরুষজীর পক্ষে কষ্টকর হইতেছিল; সেইজন্য আশ্রমাধ্যক্ষ উহা বদলাইয়া খুব নীচু ধাপের সিঁড়ি তৈয়ার করাইয়াছিলেন। সেই সময় মহাপুরুষজী কয়েকদিন সেবাশ্রমে যে বাড়ীতে স্বামী তুরীয়ানন্দ থাকিতেন সেই বাড়ীতে ছিলেন। একদিন সকালবেলা মহাপুরুষজী ঐ ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় রৌদ্রে বসিয়াছেন; কয়েক জন সাধু প্রণাম করিয়া দাঁড়াইবার পরে তিনি বলিলেন, "এ স্থানটি ঠিক ঠিক তপস্যার স্থান। সমাধিবান পুরুষ হরি মহারাজ এখানে বাস করতেন কিনা, তাই।"

অন্য একদিন রাত্রে আহারের পরে মহাপুরুষজী নিজঘরে বসিয়া আছেন। জনৈক ব্রহ্মচারী অনুতপ্ত প্রাণে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনার স্নেহ ও কৃপার গভীরতা ক্ষুদ্রবুদ্ধিবশতঃ বুঝতে না পেরে সেদিন আপনার আদেশানুযায়ী কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু আজ আমার ধারণা হয়েছে, আমার কিসে কল্যাণ হবে তা আপনিই জানেন; অতএব আপনি যা আদেশ করেছেন, তা করতে আমি প্রস্তুত।"

মহাপুরুষজী সস্নেহে বলিয়াছিলেন, "ঠিক বুঝেছ। এখানকার কথা শুনে চললে তোমাদের কল্যাণ নিশ্চয়ই হবে। এখান থেকে এখন যে-সমস্ত কথা বেরুচ্ছে, সে-সব ঠাকুরের কথা বলে জানবে। এখন ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছি।"

মহাপুরুষ শিবানন্দ

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথির দিন মধ্যাহ্নে পূজা ও হোমান্তে মহাপুরুষজী কয়েকজন যুবককে ব্রহ্মচর্যব্রতে এবং শেষরাত্রে কতিপয় ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসবের চার দিন পরে একাদশী তিথিতে সাধুভক্তগণ বিশেষ উদ্যোগী হইয়া মহাপুরুষজীর জন্মতিথি-উৎসব করিয়াছিলেন। ঐ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, হোম, গীতা-উপনিষদ্ ইত্যাদি পাঠ এবং ভজনকীর্তন। বহু ভক্তকে লুচি-মিষ্টান্নাদি দ্বারা পরিতোষপূর্বক ভোজন করানও হইয়াছিল। মহাপুরুষজী সেই দিন যেন দৈবভাবে আবিষ্ট হইয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন, আর সকলেরই প্রাণ-মন বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হইল।[১]

---

১ মহাপুরুষজীর জন্মতিথি প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বেলুড় মঠে ১৯২৪ সালে। তাঁহার জন্মের সন, তারিখ বা তিথি কাহারও সঠিক জানা ছিল না। বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার কোষ্ঠীখানি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়াছিলেন। তিনি কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তাঁহার জন্ম হয়। জনৈক ভক্তের বিশেষ চেষ্টায় ও আগ্রহে ১৯২৩ সালে কলিকাতার লুপ্তকোষ্ঠী-উদ্ধার এবং করকোষ্ঠী-রচনায় পারদর্শী একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষীকে আনাইয়া কৌশলক্রমে মহাপুরুষজীর হাত দেখান হয়। ঐ জ্যোতিষী বহু যত্নে মহাপুরুষজীর জন্মের সন, তারিখ ও তিথি উদ্ধার করেন (খৃষ্টাব্দ ১৮৫৫, ৩রা জানুয়ারী—১২৬২ সনের ২০শে পৌষ, বৃহস্পতিবার)। জন্মতিথি নিরূপিত হইবার পরে সাধু-ভক্তগণের উৎসাহে ঐ বৎসরেই তাঁহার জন্মতিথি-উৎসব করা স্থির হয়। তাঁহাকে না জানাইয়াই সমস্ত আয়োজন করা হইয়াছিল; কারণ মহাপুরুষজীর নিকট ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি কিছুতেই উহা করিতে দিতেন না। তাঁহাকে কেবলমাত্র জানান হইয়াছিল যে, ঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ, ভোগরাগ ও ভজনকীর্তন হইবে আর ভক্তেরা যাঁহারা আসিবেন তাঁহারা প্রসাদ পাইবেন। ঠাকুরের বিশেষ পূজাদি হইবে শুনিয়া

মহাসম্মেলন ও পরে

কাশীতে অবস্থানকালে মহাপুরুষজী প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা সেবাশ্রমের মাঠে বেড়াইতেন। একদিন ঐ প্রকারে বেড়াইবার সময় তিনি ৺বিশ্বনাথের দর্শন পাইয়াছিলেন এবং সেই অবধি তাঁহার মন সর্বক্ষণই উচ্চ ভাব-ভূমিতে বিচরণ করিত—আহার-নিদ্রাদির সম্বন্ধেও তিনি এক প্রকার উদাসীন হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তারগণ উহা বায়ুরোগের ফল বলিয়া সাব্যস্ত করেন, অথচ ঔষধাদি-ব্যবহারে কোন উপকার হইতেছিল না। ঐ সম্বন্ধে পরে বেলুড় মঠে জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করেন, "মহারাজ, ডাক্তাররা আপনার বায়ুরোগ হয়েছে বলে ঠিক করেছেন। আমার তো তা মনে হয় না; এটা বোধ হয় কোন যোগজ ব্যাপার। কাশীতে আপনার কোনরকম দর্শনাদি হয়েছিল কি? কেন না, কাশী হতে আসার পর থেকেই এর সূত্রপাত দেখছি।" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ, কাশীতে এক শ্বেতকায় যোগিমূর্তি দেখি, তার পর থেকেই এই রকম হয়েছে।"

তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। একাদশী তিথি বলিয়া পাকা প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরের পরে যখন মঠের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, গঙ্গার ধার এবং পাশের বাগানবাড়ী পর্যন্ত সকল স্থানেই ভক্ত নরনারীগণ বসিয়া আনন্দে প্রসাদ পাইতেছিলেন এবং মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিতে মঠ মুখরিত হইতেছিল, তখন তিনি জনৈক সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি ব্যাপার হে? এত ভক্ত প্রসাদ পেতে বসেছে—কুলোবে তো?" সেবক একটু আভাস দিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি বাবা, ওসব কিছু জানি নে। আমায় তো কেহ কিছু বলে নি। ঠাকুরের স্থানে এসে কেউ যেন অভুক্ত না থাকে—বলে দিও।" আর ক্রমাগত অস্থিরভাবে সকলে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে কিনা খবর লইতেছিলেন। উহার পর হইতে প্রতি বৎসরই তাঁহার জন্মতিথি-উৎসব চলিয়া আসিতেছে।

১৫ই জানুয়ারী (১৯২৮ খৃঃ) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কয়েকজন দেশসেবক কর্মিসহ কাশী সেবাশ্রম পরিদর্শন করিতে আসেন। সেবাশ্রমের কাজকর্ম দেখিয়া তিনি খুব প্রীত হন এবং মহাপুরুষজী তথায় আছেন জানিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গেও দেখা করেন। তাহার কিছুদিন পরেই শ্রীমতী কমলা নেহরু (পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহধর্মিণী) মহাপুরুষজীকে দর্শন করিবার জন্য কাশীতে আসেন। অদ্বৈতাশ্রমের দ্বিতলে যে ঘরে তিনি থাকিতেন, সেই ঘরে বসিয়া উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হইয়াছিল এবং শ্রীমতী নেহরু খুবই আনন্দলাভ করেন। তাহার পরেও তিনি কয়েকবার বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীকে দর্শন করেন এবং তাঁহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন। শ্রীমতী কমলা নেহরুর জীবনে মহাপুরুষজীর পূতসঙ্গ ও স্নেহভালবাসার প্রভাব অতি নিবিড়ভাবে পড়িয়াছিল।[১]

মহাপুরুষজীর উপস্থিতিতে ঐ বৎসর কাশীতে স্বামিজীর জন্মোৎসব জমজমাটভাবে অনুষ্ঠিত হইল। ঐ উপলক্ষে তিনি অনেককে সন্ন্যাস

১ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একাধিকবার মহাপুরুষজীর সঙ্গে দেখা করেন। নেহরু পরিবারের আরও অনেকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া খুব দুর্বল অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে বায়ুপরিবর্তনের জন্য বাস করিতেছিলেন, তখন শ্রীমতী স্বরূপরাণী নেহরু স্বামীর আরোগ্যকামনায় মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবার জন্য দুই-তিন বার তাঁহার কাছে বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন। রোগমুক্তির প্রার্থনা শুনিয়া তিনি শ্রীমতী স্বরূপরাণীকে বলিয়াছিলেন, "মা, এ অধিকার ঠাকুর আমায় দেন নি। তা ছাড়া, জন্ম-মৃত্যু সম্পূর্ণ ঈশ্বরেচ্ছাধীন, এতে মানুষের কোন হাত নেই। তবে তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য আমি খুব প্রার্থনা করছি ও করব।"

দীক্ষাদি দিয়াছিলেন। সেবারে তিনি প্রায় তিন মাস কাশীতে ছিলেন। কাশীতে অবস্থানকালে অনেক সময়েই তাঁহাকে খুব আনমনা এবং উদাসপ্রাণে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত—যেন কোন গভীর চিন্তা মনকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পর পর গুরুভ্রাতৃগণের বিয়োগব্যথা তাঁহার হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করিতেছিল[১], কিন্তু বাহিরে উহা বড় একটা প্রকাশ করিতেন না। ভাব চাপিবার শক্তি ছিল তাঁহার অদ্ভুত—প্রাণের গভীর ভাবতরঙ্গ তাঁহার মনের সাম্যাবস্থাকে উদ্বেলিত করিতে পারিত না। তিনি জানিতেন, সবই স্বপ্নবৎ; কিন্তু ইহা বেদনাভরা স্বপ্ন! ইহার প্রতিক্রিয়া তাঁহাকে দিনের পর দিন আরও ভাবাবিষ্ট ও আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। শরৎ মহারাজের দেহত্যাগে—বিশেষতঃ সুবিশাল শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল-চিন্তায় তিনি খুবই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর এমন কাউকে রাখলেন না যাঁর সঙ্গে কাজ-কর্মের একটু পরামর্শ করব।” ফলে এখন হইতে তিনি সর্ববিষয়ে ঠাকুরের আদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহার সকল প্রচেষ্টা শ্রীগুরুধ্যানে পর্যবসিত হইতেছিল।

পাটনার সাধু-ভক্তদিগের সবিশেষ আগ্রহে বেলুড় মঠে যাইবার পথে তিন দিনের জন্য মহাপুরুষজীকে পাটনাতে নামিতে হইয়াছিল। ১৫।২।২৮ তারিখ বুধবার কাশী পরিত্যাগ করিয়া সেইদিন বৈকালে তিনি পাটনায় পৌঁছিলেন। তখনও পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ভাড়াটিয়া

১ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “এক এক জন চলে যাচ্ছে, আর মনে হচ্ছে যেন বুকের এক-একটি পাঁজরা খসে যাচ্ছে।”

বাড়ীতে ছিল—আশ্রমে উপযুক্ত স্থানাভাববশতঃ তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী জনৈক ভক্তের গৃহে রাখা হয়। তাঁহার শুভাগমনে পাটনার ভক্ত-মণ্ডলীর প্রাণ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। সর্বত্রই মহা উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। প্রতিদিন অনেক লোক তাঁহার পুণ্যদর্শন ও সঙ্গলাভের জন্য ঐ ভক্তগৃহে সমবেত হইত। ঐ সময়ে কয়েক স্থানে সদালোচনা সভার আয়োজন হয়; মহাপুরুষজী উহাতে যোগদান করিয়া উপস্থিত সকলকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার আদেশে সঙ্গী সন্ন্যাসিগণ ভাগবতব্যাখ্যাদি করিয়াছিলেন। পাটনাতে তিনি কয়েক জনকে দীক্ষাও দেন, অধিকন্তু বিশেষ কৃপাপরবশ হইয়া জনৈক ভক্তের নূতনগৃহ-প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন এবং নবনির্মিত ঠাকুরঘরে পূজা করিয়া শ্রীপ্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষজী পাটনা পরিত্যাগ করিয়া ১৯শে বেলুড় মঠে পৌছিলেন। এখন হইতে কিঞ্চিদধিক আর ছয়টি বৎসর মাত্র তিনি পৃথিবীতে ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ‘প্রাণ-মনের’ চালক ঠাকুর এই ছয়টি বৎসরকে যেন ছয় যুগের ভাব ও কর্ম দিয়া ঠাসিয়া দিয়াছিলেন। মঠ হইতে ১০।৫।২৮ তারিখের একখানি চিঠিতে মহাপুরুষজী লিখিয়াছিলেন, “বৃদ্ধ শরীর। ঠাকুরই প্রাণ-মণের পরিচালক; তিনিই আত্মা, ঈশ্বর—যতদিন ইহাদিগকে কাজ করাইবেন তত দিন করিবে, যখন তিনি বন্ধ করিতে ইচ্ছা করিবেন তখনই সব চুপ হইয়া যাইবে—এই জ্ঞান তিনি দয়া করিয়া পাকা করিয়া দিতেছেন, সুতরাং আমার কোন চিন্তা নাই।” না, তাঁহার কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু কাজ—ঠাকুরের কাজ করিবার ছিল প্রচুর! আর তাঁহার শারীরিক বল ও কার্যক্ষমতা যতই কমিয়া আসিতেছিল, অন্তঃশক্তি ততই অভিব্যক্ত

পাটনা

১৯২৮

হইতেছিল নানাভাবে। 'গুরু-গঙ্গার মাঝখানে' মানবত্ব ও দেবত্বের মিলনভূমিতে তাঁহার শান্ত আত্মারাম-অবস্থিতি দিকে দিকে বিকিরণ করিয়াছিল অপ্রতিহত আধ্যাত্মিক প্রভাব। কত জীবনকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ছাঁচে ঢালিয়াছিলেন, অনাঘ্রাত ফুলের মত কত পবিত্র আত্মাকে স্বহস্তে যুগাবতারের বেদীতে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সানন্দে নিবেদন করিয়াছিলেন, কত পঙ্গু যাত্রীকে সংসারের দুর্গম বন্ধুর পথে বহন করিয়া লইয়া গেলেন! তাঁহার মৌন আশীর্বাদ যুগধর্মকে অকল্পনীয় ভাবে দূর-দূরান্তরে পরিব্যাপ্ত করিল! আবার বহুতর দ্বন্দ্ব, আশঙ্কা ও বিপদকে কূটস্থ-ব্রহ্মবিজ্ঞান ও দিব্যপ্রেম দ্বারা পরাহত করিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভিত্তি আগামী কালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন।

দিনে দিনে ভক্ত ও দীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছিল—দীক্ষাদান তাঁহার নিত্যকার্যে পরিণত হইল, আর সারাটি বিকাল কাটিয়া যাইত ভক্তগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও নানা প্রসঙ্গে। অবিরাম জনস্রোত দেখিয়া তিনি একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "সকলেই মনে করছে, এ বুড়োও এবার টেঁসবে, আর বেশী দিন নয়; তাই এত লোকের ভিড়। আরে বাবা, রাখে কৃষ্ণ মারে কে? যত দিন ঠাকুর রাখেন তত দিন থাকতেই হবে।"

ঐ সময়ে জনৈক ভক্ত শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "শরীরের আর বাবা থাকাথাকি কি? বৃদ্ধ শরীর—একটা-না-একটা লেগেই আছে। ঠাকুর জোড়াতাড়া দিয়ে কোন প্রকারে চালিয়ে নিচ্ছেন। তিনি মালিক; তাঁর কাজের জন্য শরীর কয় দিন যে রাখবেন, তা তিনিই জানেন।" পরে কেশব বাবুর প্রসঙ্গক্রমে

বলিয়াছিলেন, "কেশব বাবুকে একদিন ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমি স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে থাক কেন?' তাতে কেশব বাবু বললেন, 'আমি শুধু নিজের মুক্তি চাই নে। যাতে এরাও সব উদ্ধার হতে পারে তাই আমার ইচ্ছা।' ঠাকুর এই কথায় বিশেষ আনন্দিত হয়ে কেশব বাবুর উদারতার প্রশংসা করেছিলেন। অতএব তোমাদের স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলেও যাতে তাঁর পথে এগুতে পারে, ভক্তিলাভ করতে পারে—তার চেষ্টা করা উচিত।"

এখন হইতে মহাপুরুষজী মঠের সাধুবৃন্দকে ভবিষ্যতে সঙ্ঘপরিচালনার জন্য নানাভাবে শিক্ষাদানে বিশেষরূপে যত্নপর হইলেন। পরম উৎসাহের সহিত সকলকে বলিতেন, "তোমরাই তো আমাদের ভাবী উত্তরাধিকারী—তোমরাই তো সব করবে। আমাদের শরীর আর কদিন? এখন সব কাজকর্ম দেখেশুনে নাও—এবার তোমাদের পালা।" প্রবীণ সন্ন্যাসীদিগের উপর যোগ্যতা অনুসারে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া তিনি দিনের পর দিন শিশুর মতন 'মা, মা'-রবে বিভোর হইয়া যাইতে লাগিলেন—আর অধিকতর নির্ভরশীল হইলেন ঠাকুরের ইঙ্গিতের উপর।

মানুষ গড়িয়া তুলিবার শক্তি ছিল তাঁহার অদ্ভুত। ঠাকুর বলিতেন, "বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে হয়।" ঐ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি প্রত্যেকের ভিতর দেবত্বের বিকাশ করিয়া দিতেন। আর ঠাকুরের দরবারে সকলেই সমান—ইহাই ছিল তাঁহার প্রাণের অনুভূতি। তাঁহার প্রতি কাজে, প্রত্যেক ব্যবহারে ঐ ভাবটি ফুটিয়া উঠিত। একদিন জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী মহাপুরুষজীর নিকট একজন ব্রহ্মচারীর কাজকর্ম সম্বন্ধে অভিযোগ করেন। তিনি ধীরভাবে সব শুনিয়া বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর বলতেন, 'বিন্দুতে

সিদ্ধ দেখতে হয়।' তিনি যে এ কথা শুধু মুখেই বলতেন তা নয়। তাঁর দৃষ্টিই ছিল সেই রকম। তা না হলে আমরাই কি তাঁর আশ্রয়ে থাকতে পারতাম? দোষ না দেখে তিনি কৃপা করে আমাদের টেনে নিয়েছিলেন বলেই তো আমরা তাঁর আশ্রয় পেয়েছিলাম। একেবারে দোষ না আছে কার? এখানে সকলেই নির্দোষ হতে এসেছে; কিন্তু নির্দোষ হয়ে তো কেউ আসে নি! এমন একটু-আধটু দোষ ক্রমে ঠাকুরের কৃপায় সব শুধরে যাবে। কোন রকমে তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারলেই তিনি কৃপা করে ক্রমে সব ঠিক করে নেবেন।" মহা-পুরুষজীর এ সকল কথা শুনিয়াও ঐ সন্ন্যাসী যখন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি তাকে ডেকে একটু ধমকে দিলে ঠিক হয়।" তখন মহা-পুরুষজী গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন, "খালি বললে বা ধমকালে মানুষের দোষ শোধরায় না। পার তো নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা লোকের মনের গতি ফিরিয়ে দাও।··· যদি কাউকে শোধরাবার হয় তো তার জন্য ঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা কর, ঠাকুরকে বল। তিনি যদি দয়া করেন তবেই মানুষের মনের গতি চকিতে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।" ঐ সাধুটি চলিয়া যাইবার পরে তিনি যেন আপনমনেই বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরের আশ্রয়ে যারা এসেছে, তারা কেউ কম নয়। সব জাত-সাপের বাচ্চা—নতুন ব্রহ্মচারী হোক আর অতি প্রাচীন সাধুই হোক! কত জন্মের সুকৃতির ফলে তাঁর এই পবিত্র সংঘে আশ্রয়লাভ হয়!"

মহাপুরুষজীর জীবনে সকলকে সমান অধিকার দিবার ভাব বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। এই শিক্ষা বোধ হয় তিনি ছেলে-বেলায় তাঁহার গর্ভধারিণী জননীর কাছেই পাইয়াছিলেন। খাওয়া-দাওয়া সকল বিষয়ে বাড়ীতে প্রতিপালিত অপর বিশ-পঁচিশ জন গরীব ছেলের

সঙ্গে সমপর্যায়ে তাঁহাকে থাকিতে হইত। সংঘের প্রীতি অঙ্গকে সর্ব-বিষয়ে সমান অধিকার এবং ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সমান সুযোগ দিয়া সকলের জীবন গড়িয়া তুলিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং তাহাতে প্রভূত তৃপ্তিলাভ করিতেন। বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের কোন ব্যাপারেই তাঁহাকে নিজের জন্য কোন বিশেষ দাবী করিতে দেখা যায় নাই; আহারাদিতে তাঁহার জন্য কোনপ্রকার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইলে তিনি অতীব কুণ্ঠা বোধ করিতেন। যখন তাঁহার শরীর একান্ত অসুস্থ ও জরাজীর্ণ, তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সামান্য দুধ খাইতে হইত; কিন্তু সেজন্যও তাঁহার সঙ্কোচের অন্ত ছিল না। সন্তানপ্রতিম সাধু-ব্রহ্মচারীদিগের দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না, অথচ তিনি দুধ খাইতেছেন—ইহাই ছিল তাঁহার মনঃকষ্টের কারণ। দুধ খাইতেন বলিয়া তিনি মঠের জন্য একটি মূল্যবান গরু কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া মঠের গরুগুলির পৃথক খাবারের ব্যয়ভারও নিজে বহন করিতেন। আহারাদি সকল বিষয়ে মঠের প্রাচীন বা নবীন সাধু-ব্রহ্মচারী, ভক্ত, অভ্যাগত, এমন কি পাচক ও চাকরদের জন্য সমান ব্যবস্থা ছিল। সামান্য জিনিষ আসিলেও তাহা ঠাকুরের ভোগে নিবেদিত হইয়া সকলের মধ্যে পরিবেশিত হইত।

আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত—তাঁহার সঞ্চয়বুদ্ধিরাহিত্য; উহার মূলে ছিল ঠাকুরের উপর পূর্ণ নির্ভরতা। একবার বৎসরের শেষে মঠের আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশী হওয়াতে মঠ ও মিশনের তৎকালীন সেক্রেটারী স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্যয়সঙ্কোচের কথা তুলিলেন। তাহাতে মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, "দেখ সুধীর, আমাদের তো কিছু অপব্যয় হচ্ছে না। কি আর খরচ কমাবে? 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'—ঠাকুরই

আমাদের গৌরী সেন, তিনি সব যোগাড় করে দেবেন। তাঁর উপর নির্ভর করে চুপচাপ বসে থাক, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। সকলেই তো ঠাকুরের নাম করে বাড়ীঘর ছেড়ে এসেছে—তিনি কি আর দুমুঠো খাবারের যোগাড় করবেন না? তাঁকে জানাও। ঠাকুর আমাদের পরীক্ষা করছেন।"

মঠের সাধুগণের উপর মহাপুরুষজীর এইরূপ বিশ্বাস ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের ফলে প্রত্যেকের প্রাণে একদিকে যেমন নির্দিষ্ট কাজকে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার প্রবল প্রচেষ্টা থাকিত, তেমনি জাগিয়া উঠিত একটি আত্মমর্যাদাজ্ঞান। সমস্ত প্রাণমন দিয়া মহাপুরুষজীর বিশ্বাসকে অব্যাহত রাখিবার জন্য সকলে যত্নপর হইতেন। মহাপুরুষজীও যেমন সকলকে সন্তানবৎ ভালবাসিতেন, মঠবাসীরাও তেমনি তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন ও স্নেহময়ী জননীর ন্যায় ভালবাসিতেন। দুই দিক দিয়াই পরস্পরকে আনন্দিত করিবার সমান প্রচেষ্টা দেখা যাইত। এই প্রকার ভাববিনিময়ে মহাপুরুষজী এবং সাধুগণের মধ্যে একটা অপার্থিব প্রীতির সম্বন্ধ সৃষ্ট হইয়াছিল।

তাঁহার শিক্ষার ফলে মঠে সাধন-ভজন যেমন খুব তীব্রভাবে চলিতেছিল, তেমনি সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়াছিল সমস্ত কাজকর্ম। তাঁহার দৃষ্টিতে সাধনভজন, কাজকর্ম, ঠাকুরের সেবাপূজা, স্বাধ্যায় প্রভৃতি আত্ম-বিকাশের সমান উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত; সেজন্য সকলেই তাঁহার নিকট সমান উৎসাহ পাইয়া নিজ নিজ সাধনাকে পূর্ণ রূপ দিবার সুযোগ পাইতেন। স্বামিজী-প্রবর্তিত কর্মের স্থান তাঁহার বিবেচনায় কোথায়, তাহার আভাস পাওয়া যায় জনৈক কর্মীকে লিখিত একখানি চিঠিতে—"তোমায় প্রভু অদম্য উৎসাহ ও সাহস দিন। আশ্রমের উন্নতি হইবেই

হইবে, কোন চিন্তা নাই—ইহা নিশ্চয় জানিও। স্বামিজীর কথা যেন কখনও ভুল না হয়। তুমি আশ্রমের জন্য, দেশের সেবার জন্য যাহা কিছু করিতেছ, তাহা ধ্যান-জপের অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়—সমস্তই প্রভুর কাজ, ধ্যানজপও প্রভুর কাজ; সুতরাং তুমি ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দিহান হইবে না। ···· ঠিক ঠিক ভগবানের নাম করা, ধ্যান করাও যা, ঠিক ঠিক জীব-জগতের নিঃস্বার্থ সেবা করাও তাই; সুতরাং তোমার জন্মটা বৃথায় গেল, এ কথাটা ভ্রমাত্মক অথবা অযৌক্তিক। তপস্যা এক প্রকার নয়—অনেক প্রকার। স্বার্থত্যাগই তপস্যা।"

১৯২৯ সাল। ঐ সময়ে ফরাসী দেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মনীষী রোমাঁ রোলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। আমেরিকা-প্রবাসী লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের[১] 'The Face of Silence' বইখানি হইতেই রোলাঁ প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারতের' তৎকালীন সম্পাদকের সহিত পত্রদ্বারা পরিচিত হইয়া ঠাকুর-স্বামিজী এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য-সংগ্রহান্তে তাঁহার অমর গ্রন্থদ্বয়—শ্রীরামকৃষ্ণের এবং বিবেকানন্দের জীবনী[২] প্রণয়ন করেন। বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর লিখিত এই পুস্তক দুইখানি পাশ্চাত্ত্য দেশে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে সুপরিচিত করিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। এইরূপ

১ ধনগোপাল তিন বার ভারতে আসিয়া মহাপুরুষজীকে দর্শন ও নানাভাবে অনেক দিন তাঁহার ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন।

২ Life of Ramakrishna; The Life of Vivekananda and The Universal Gospel.

একজন বিশ্রুতকীর্তি বিদেশী পণ্ডিতের ভিতর ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবের এই অপ্রত্যাশিত বিকাশ দেখিয়া মহাপুরুষ মহারাজ যুগপৎ স্তম্ভিত এবং আনন্দিত হইয়াছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ ঠাকুর সম্বন্ধে মহাপুরুষজীর ব্যক্তিগত স্মৃতি জানিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বিনয়পূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। মহাপুরুষজীও রোলাঁর অনুরোধ রক্ষা করিয়া এক অনতিদীর্ঘ পত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার সংস্পর্শের কথা কিছু জানাইয়াছিলেন। ঐ পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"ছেলেবেলা থেকেই আমার ধর্মজীবনের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল; আর ভোগ যে জীবনের লক্ষ্য নয়—এই বিবেকবুদ্ধি আমার অন্তরে স্বতঃই প্রস্ফুটিত হয়েছিল। বয়স হবার এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ দুটি ভাব আরও দৃঢ় হয়। ভগবদ্‌জ্ঞান-অন্বেষণে আমি কলকাতার নানা ধর্মসম্প্রদায়ে যেতে লাগলাম, কিন্তু কোথাও প্রকৃত শান্তি পেলাম না—কেউ বৈরাগ্যের মাধুর্যের কথা জোর করে বলতে পারলে না।

"শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর কলিকাতাস্থ এক ভক্ত-বাড়ীতে প্রথম দর্শনের দিনেই সমাধিমগ্ন হ'তে দেখলাম। সমাধি হতে ব্যুত্থিত হয়ে তিনি সমাধি সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগলেন। আমি প্রাণেপ্রাণে অনুভব করলাম যে, ইনি নিশ্চয়ই ভগবানকে লাভ করেছেন এবং নিজেকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে চিরকালের মত নিবেদন করলাম।

"আমি এখনও বুঝতে পারি নি যে তিনি মানুষ, কি মহাপুরুষ, কি দেবতা, কি ভগবান স্বয়ং। আমি তাঁকে সম্পূর্ণ অহংশূন্য, শ্রেষ্ঠ-বৈরাগ্যযুক্ত, পরমজ্ঞানবান এবং প্রেমের মূর্ত বিকাশ বলে জানি। যত দিন যাচ্ছে ও ধর্মজগতের সঙ্গে আমি যত অধিকতর পরিচিত হচ্ছি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের অনন্ত বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত

গভীরতা অনুভব করছি, ততই আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হচ্ছে যে, তাঁকে ভগবানের সহিত তুলনা করলে—ভগবান বলতে সচরাচর লোকে যেমন বোঝে—তাঁর অসীম মহত্ত্বকে খর্ব করা হবে। তাঁকে স্ত্রী-পুরুষ, বিদ্বান-মূর্খ, সাধু ও অসৎ—সকলের প্রতি সমভাবে প্রেম বিলাতে দেখেছি। আর দেখেছি তাদের দুঃখ দূর করবার এবং তারা যাতে ভগবান লাভ করে অনন্ত শান্তির অধিকারী হয় তজ্জন্য তাঁর অন্তরের ব্যাকুল আগ্রহ। আমি জোর করে বলতে পারি বর্তমান যুগে তাঁর মত মানবকল্যাণ-নিরত অত বড় মহাপুরুষ কেহ নাই।

"শ্রীরামকৃষ্ণের অপরে ধর্মসংক্রামণ করিবার শক্তি ছিল এবং তিনি তাদের মন জ্ঞানের উচ্চ ভূমিতে তুলে দিতে পারতেন। স্বামী বিবেকানন্দপ্রমুখ আমরা অনেকে প্রায়ই তাঁকে দর্শন করতে যেতাম। তাঁর কৃপায় আমাদের আধারানুযায়ী উচ্চ উচ্চ জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করবার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর স্পর্শে, তাঁর ইচ্ছায় আমার নিজেরই তাঁর জীবৎকালে তিন বার সমাধিলাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল। তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি সপ্রমাণ করতে আজও আমি বেঁচে আছি। এ মোহ নয়, কিংবা স্বপ্নও নয়—এই সব অনুভূতিতে জীবনের স্থায়ী পরিবর্তন আসত।"

একদিকে রোলাঁকে অবলম্বন করিয়া যেমন একটি প্রবল মঙ্গলস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, অপরদিকে তেমনি কতিপয় উদ্‌ভ্রান্তবুদ্ধি ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি নানা ষড়যন্ত্র করিয়া মঠ ও মিশনকে বিশ্লিষ্ট ও বিশেষরূপে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের পন্থা নৈতিক গণ্ডী ছাড়াইয়া বহু নিম্নগামী হইয়াছিল; সেজন্য রামকৃষ্ণ-সংঘের সমস্ত কেন্দ্রে প্রতি অঙ্গের ভিতরই মহা চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং উহার

প্রতিকারকল্পে সকলেই বদ্ধপরিকর হন। মহাপুরুষজীও খুবই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে, রাত্রির পর রাত্রি তিনি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইতেছেন এবং ব্যাকুলভাবে সংঘের কল্যাণের জন্য ঠাকুরের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন। তখন সংঘকে অক্ষত রাখিবার জন্য মহাপুরুষজীকে যথেষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। তিনি অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা অবলম্বন করিয়া কর্ণধাররূপে উত্তালতরঙ্গবিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্যেও সংঘ-তরীকে নিরাপদে চালিত করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার মুখে প্রায়ই শোনা যাইত, 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'—সত্যেরই জয় হবে।" তিনি উদাত্ত-কণ্ঠে সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "সত্যের জয় নিশ্চয়; সত্যাশ্রয়ী প্রভুর গড়া সংঘের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না—তোমরা নিশ্চিত জেনো।" আর বলিতেন, "Loyalty to Sangha is loyalty to Thakur—সংঘের প্রতি আনুগত্যই ঠাকুরের প্রতি আনুগত্য।"

ঐ সময় মহাপুরুষজী মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন, "এখন তোমরা সকলে এসেছ—আমার খুবই আনন্দ হয়েছে। ঠাকুর একটা নাড়া-চাড়া দিয়ে তাঁর সংঘশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে দিচ্ছেন আর দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর কাজ একা কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা হবার নয়—এই সমস্ত সাধু একত্রিত হয়ে করবে এবং তখনই সব সুনিয়ন্ত্রিত হবে। আর যত ঝড়-ঝাপটা আপদ-বিপদ আসবে, ততই ঠাকুরের সংঘশক্তি জেগে উঠবে। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'—যত বাধা-বিপত্তি আসবে, ততই বেড়ে যাবে ঠাকুরের উপর সকলকার ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা। তাঁর যুগধর্মপ্রবর্তনের জন্যই এই সংঘের সৃষ্টি এবং তিনি এই সংঘের প্রতি অঙ্গের ভেতর দিয়ে কাজ করছেন। আর এই

যুগপ্রবর্তনের কাজ বহু শতাব্দী ধরে অবাধে চলবে, কেউ এর গতি রোধ করতে পারবে না। এ বাবা, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি স্বয়ং স্বামিজীর কথা।”

অথচ যাহারা সংঘবিশ্লেষকার্যে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিল তাহাদের প্রতি তাঁহার কী দয়া আর কত ক্ষমা! খুব বিহ্বল হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে নাম করিয়া তিনি ঠাকুরের চরণে আকুল প্রাণে তাহাদের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। সে দৃশ্য অতীব করুণ! তিনি ঠাকুরের ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া করযোড়ে প্রার্থনা জানাইতেন, “প্রভু, এদের ক্ষমা ক’রো, এদের রক্ষা ক’রো। এরা তোমারই আশ্রিত—এদের মনের গতি ঘুরিয়ে দাও, সুবুদ্ধি দাও। আর যাই করো, ঠাকুর, এদের ত্যাগ ক’রো না।” দিনের পর দিন তাঁহাকে ঐ প্রকার প্রার্থনা করিতে দেখা যাইত।

* * *

বেলুড় মঠের ইতিহাসে ১৯২৯ সন আর একটি বিশেষ ঘটনার জন্য স্মরণীয় হইয়া আছে। বহুপূর্বে মঠ যখন বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে অবস্থিত ছিল এবং বর্তমান বেলুড় মঠের জমি সবেমাত্র ক্রয় করা হইয়াছিল, তখনই স্বামিজী শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ভাবী বিরাট মন্দিরের পরিকল্পনা করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে দিয়া উহার নক্সা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, “এ মন্দির পরে হবে—আমি উপর থেকে দেখব।” নক্সা প্রস্তুত হইবার পরেও প্রায় ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, অথচ স্বামিজী যে মহান্ ভাব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ মন্দিরনির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবে পরিণত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদগণের মধ্যে ক্রমে ক্রমে

অনেকেই দেহরক্ষা করিয়া শ্রীগুরুপদে মিলিত হইয়াছেন। সেজন্য সংঘের সকলেই স্থির করিলেন যে, অন্ততঃ শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ মহাপুরুষ মহারাজের দ্বারা করাইয়া রাখা যাউক। তদনুসারে ১৯২৯ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মতিথিপূজার দিন (১৩ই মার্চ, রবিবার) বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে মহাপুরুষজী-কর্তৃক শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়।[১] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৎকালীন জীবিত শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মহাপুরুষজী নিজে ভিত্তি-প্রস্তরখণ্ডটিকে পরমভক্তিভরে পূজা করিয়া বহুভক্তকণ্ঠোত্থিত 'গুরু মহারাজজীকী জয়' ধ্বনির মধ্যে যথাস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ কার্যসম্পাদনের পর তাঁহাকে বিহ্বলপ্রাণে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া করজোড়ে ঠাকুরের কাছে সকরুণ স্বরে প্রার্থনা জানাইতে শোনা গিয়াছিল—"ঠাকুর! মান রেখো।"

তাঁহাকে যন্ত্র করিয়া ঠাকুর কত বড় কার্যের বীজ যে বপন করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়াই যেন তিনি আকুলপ্রাণে হৃদয়দেবতার চরণে ঐরূপ মিনতি জ্ঞাপন করিলেন! সে প্রার্থনা ঠাকুরের শ্রীচরণে পৌঁছিয়াছিল; কারণ ভিত্তিস্থাপনের অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্রীভগবানের বিশেষ ইচ্ছায় অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে মন্দির-নির্মাণের সাহায্য আসিয়া নির্মাণকার্য আরম্ভ এবং ১৯৩৮ সনে উহা সুসমাপ্ত হয়।

১ তখনও ভাবী মন্দিরের নির্মাণস্থান নির্বাচিত হয় নাই বলিয়া মঠপ্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে গোলাপ বাগানের মধ্যেই ঐ ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পরে সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার জমি পরীক্ষা করিয়া মন্দিরনির্মাণের উপযুক্ত স্থান নিরূপিত করেন এবং মহাপুরুষজী-প্রোথিত সেই ভিত্তিপ্রস্তরই স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কয়েক ফুট দক্ষিণে নির্দিষ্ট স্থানে পুনঃ সংস্থাপিত হয়।

জীবন-সন্ধ্যায়

মহাপুরুষ মহারাজের জীবনে যে গুরুভাবের বিকাশ হইয়াছিল তাহার প্রকৃতি ও গভীরতা দুই-ই অসাধারণ। গুরু তিনি কখনও হইতে চাহেন নাই—যখন হইলেন তখনও জানিতেন না যে তিনি গুরু। তবুও শতসহস্র সংসারতপ্ত মানুষের তিনি ছিলেন পরম শীতল আশ্রয়। ১৯২২ সালে ঢাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণায় সেই যে প্রথম তাঁহাকে দীক্ষাদানকার্যে ব্রতী হইতে হইয়াছিল, রাখাল মহারাজ যাহা শুনিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'তারকদা এবার হাত খুললেন দেখ্ছি', তাহার পর হইতে দিনের পর দিন কত লোক যে তাঁহার নিকট 'নাম' ও 'সাধন' পাইয়া ধন্য হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি জানিতেন, সকলে ঠাকুরেরই আকর্ষণে আসিতেছে—ঠাকুরই গুরু। ঠাকুরের পটের দিকে করুণভাবে চাহিয়া করজোড়ে বলিতেন, 'প্রভু, প্রভু, তুমি জানো··· আমার বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, কোন ক্ষমতা নেই—তুমি বসিয়েছ, তাই বসেছি।" একদিন মঠের জনৈক প্রাচীন সাধুকে বলিতেছিলেন, "তিনিই প্রেরণা দিয়ে লোকদের এখানে আনছেন আর এই শরীরটার মধ্যে বসে সকলকে কৃপা করছেন। নইলে আমায় দেখে এত লোক আসবে কেন? আমি তাঁর নাম করি, তাঁর স্মরণ-মনন করি, অন্য কিছু জানি নে। যারা এখানে আসে, আমি সকলকে তাঁর পায়ে সঁপে দি। বলি, 'এই নাও ঠাকুর, তোমার জিনিষ তুমি নাও।' লোকে যেমন নানা ফুল দিয়ে তাঁর চরণপূজা করে, আমিও তেমনি নানারকম মানুষ অঞ্জলি করে তাঁর পায়ে ঢেলে দি। তা সকলকে তিনি গ্রহণ করছেন

বেলুড় মঠে অসুস্থাবস্থায়

১৯৩১

স্পষ্ট দেখতে পাই। তিনি গ্রহণ করলেই আমি খালাস। তিনি সব ভার নিয়ে নেন। কল্যাণ-অকল্যাণের কর্তা তো তিনি। তবে আমার মনের শুভেচ্ছা তাদের জন্য সব সময়ে রয়েছে। তাদের কল্যাণচিন্তা করি, তাদের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।" তিনি জনৈক দীক্ষিত সন্তানকে একখানি চিঠিতে একবার লিখিয়াছিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাহা ঐশ্বরিক—মানুষিক নয়। সমস্তই ঠাকুরকে লইয়া সম্বন্ধ। আমি তাঁর দাস, তাঁর সঙ্গী, তাঁর পদাশ্রিত। তোমাকে তাঁর অভয় পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছি।"

যতদিন ঠাকুরঘরে যাইবার শক্তি ছিল, সাধারণতঃ ঠাকুরের নিত্য-পূজাদির পর তিনি গঙ্গাজলে হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া তথায় যাইতেন এবং অনেকক্ষণ তদ্গতভাবে ঠাকুরের পূজা করিয়া দীক্ষাদানে ব্রতী হইতেন। দীক্ষার সময়ে অনেক ভক্তের অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি হইত। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠিক ঠিক ভক্তকে মন্ত্র দিয়ে খুব আনন্দ হয়। যাদের মন্ত্র পাবার সময় হয়েছে তাদের হৃদয়পদ্ম বিকশিত ও উন্মুখ হয়ে থাকে, আর মন্ত্র পাওয়া মাত্র যেন উহা সযত্নে আঁকড়ে

---

১ মহাপুরুষজীর সম্বন্ধে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এক স্থানে লিখিয়াছেন, "তাঁহার নিকট হইতে কেহই রিক্তহস্তে বা শূন্যপ্রাণে ফিরিয়া যাইত না। তিনি সকলের মনঃপ্রাণ ভরপূর করিয়া দিতেন। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষাদি কৃপা পাইয়া ধন্য হইয়াছে। বহুলোক তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত, কিন্তু তথাপি তাঁহার 'অহং'-ভাব মোটেই ছিল না। তিনি বলিতেন যে শ্রীশ্রীঠাকুরই তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া সকলকে কৃপা করিতেছেন, তিনি ঠাকুর ও মাকে ছাড়া আর কিছুই জানেন না। বালকের ন্যায় তাঁহার মুখে সদা 'মা, মা' বাণী শোনা যাইত।"

ধরে।" ঠাকুরঘরে যাইবার সামর্থ্য যখন রহিল না তখন মহাপুরুষজী নিজের ঘরে খাটের উপর বসিয়াই দীক্ষা দিতেন।[১]

তিনি দীক্ষা দিতেন প্রাণে। তাহাতে বাহ্যিক অনুষ্ঠানবাহুল্য কিছুই ছিল না, ন্যাস-প্রাণায়াম মন্ত্র-তন্ত্রের আড়ম্বর ছিল না, গুপ্ত তথ্যও বড় বেশী কিছু থাকিত না। তিনি বলিতেন, "এ যুগে রামকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র; রামানুজ 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই পবিত্র মন্ত্র ছড়িয়েছিলেন আমরাও জানি আমাদের ঠাকুরের নাম সেই রকম।"

একদিন একটি দীক্ষার্থিনী বিধবা মহিলা দীক্ষার জন্য কি আয়োজন করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করাতে মহাপুরুষজী বলিলেন,—"কিছু না। কেবল চাই প্রাণ। প্রাণ আনতে পারবে, মা? আর দক্ষিণা? তা একটা হরিতকী আনলেই চলবে। ঠাকুরের দরবারে ওসব কিছু নেই। চাই কেবল প্রাণ।"

আর বলিতেন, প্রাণ ভরিয়া ইষ্টের নিকট প্রার্থনা ও ভজন করিতে এবং খুব পবিত্র জীবন যাপন করিতে। "মুক্তি কি ভক্তি, সব তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে থাকাই সব চেয়ে ভাল—'আমার পক্ষে তিনি যেমন ভাল বুঝেন করুন'। কেবল তাঁর ভজন করে যাওয়া—হাঁ, এই—

---

১ শেষাশেষি লোকের আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনের জন্য তাঁহার এরূপ একটি উন্মুখতা আসিয়াছিল যে, দীক্ষাদানে স্থান-কালের বিচার অনেক সময়ে থাকিত না। সাধারণতঃ তিনি সকালবেলাতেই দীক্ষা দিতেন; কিন্তু দূরস্থান হইতে আগত প্রার্থীর কাতরতা দেখিয়া কখনও কখনও বৈকালবেলায়ও তাহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। কখনও দেখা গিয়াছে যে, রোগীর চেয়ারে করিয়া অফিস ঘরে তাঁহাকে আনিয়া বসান হইয়াছে, সেই অবস্থাতেও তিনি দীক্ষা দিয়াছেন। গঙ্গার দিকে বারান্দায় উক্ত চেয়ারে বসিয়াও তিনি কাহাকেও-কাহাকেও কৃপা করিয়াছেন।

শুধু পবিত্র হয়ে জপ, ধ্যান, ভজন করে যাওয়া। শুধু পবিত্র হতে হবে। এটি চাই-ই—একেবারে পাক্কা চাই।"

এই সহজ সরল সাধন নির্ণয় করিয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদীতে শিষ্যকে উৎসর্গ করিতেন। নিশ্চিত জানিতেন যে, মৎস্য বড়শিতে গাঁথা হইয়া গেল—ধীবর হয় এখনই, নয় একটু খেলাইয়া তীরে অবশ্যই টানিয়া তুলিবে। ভক্তদের অভয় দিয়া তিনি বলিতেন, "তোদের কিছু ভয় নেই। ঠাকুর রয়েছেন—সব দেখবেন। মুক্তিকুক্তি সব হয়ে যাবে। আমাদের একটু দরকার হয়—বলি-দিয়ে দেওয়া, নামমাত্র। আমরা তো ঠাকুরের পাদপদ্ম ছুঁয়েছি। বলে দিই, 'এঁকে ডাক, ইনি ভগবান'।"

একখানি চিঠিতে জনৈক সন্তানকে তিনি একবার লিখিয়াছিলেন, —"ঠাকুর যখন এ শরীরদ্বারায় তোমাদের তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছেন তখন তোমাদের কোন চিন্তা নাই।"

মহাপুরুষ মহারাজকে দেখিয়াই মনে হইত, তিনি যেন সত্যকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া বসিয়া আছেন। সংসারসমুদ্রের পারে লইয়া যাইবার অমিত শক্তি সেই শান্ত চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যে কী সুস্পষ্ট অভিব্যঞ্জিত হইত! মনে হইত মোহের অতীত এক দিব্য জ্যোতির রাজ্য এই পুরুষপ্রবর নিশিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং কৃপা করিয়া তাহার সন্ধানও জিজ্ঞাসুকে বলিয়া দিতে পারেন। অবিচারে এই কৃপা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্যই তো অত দীর্ঘকাল অথর্বদেহে এই মর্ত্যধামে তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছিল।

তিন দিন যাবৎ দিবারাত্রি একটানা হাঁপানি চলিয়াছে—আহার-

নিদ্রা নাই। শরীরের উপর দিয়া এতকষ্ট যাইতেছে যে দেখিলে কান্না আসে। তিনি কিন্তু নির্বিকার! দূরাগত জনৈক ভক্ত দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। মহাপুরুষজীর শরীরের যে অবস্থা তাহাতে দীক্ষার কোন কথাই উঠিতে পারে না। ভক্তটি হতাশপ্রাণে অভুক্ত অবস্থায় রহিয়াছেন—বৈকালবেলা মহাপুরুষজীকে একবার মাত্র প্রণাম করিয়া যাইবেন, তাহাই ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রণাম করিতে আসিয়া সাশ্রুনয়নে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। ভক্তটির আর্তি দেখিয়া মহাপুরুষজীর মুখমণ্ডলে করুণা ফুটিয়া উঠিল। তিনি দীক্ষা দিতে চাহিলেন। সেবকগণ তাঁহার শরীরের অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে ধীরস্বরে বলিলেন, "তাতে আর হয়েছে কি? ঠাকুরের নাম দেব।" ভক্তটিকে তখনই দীক্ষা দিলেন।

মহাপুরুষজী বলিতেন, "কেন আছি? খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই—তবু তাঁর ইচ্ছা। লোকের কল্যাণ হচ্ছে শুনে বড় আনন্দ হয়।" "এ শরীর থাকলে যদি লোকের কল্যাণ হয়, আর তাই যদি মায়ের হয়, তো হোক।" তাঁহার শরীর দিনদিনই দুর্বল ও অথর্ব হইয়া পড়িতেছিল। একদিকে রক্তের অত্যধিক চাপ, অপরদিকে হাঁপানি। নীচে নামিতে পারিতেন না। দুই ধাপ সিঁড়ি উঠিয়া ছাতে যাইতেন —চিকিৎসকগণ তাহাও নিষেধ করিলেন। উপরের বারান্দায় একটু পায়চারি করিতেন, বসিতেন। ক্রমে ক্রমে তাহাও বন্ধ হইয়াছিল। শুধু নিজের ঘরটিতে চব্বিশ ঘন্টা কাটাইতে হইত। কিন্তু তাঁহার স্বাত্মারাম সদানন্দ অবস্থার একটুও বৈলক্ষণ্য দেখা যাইত না। ঐ ঘরটিতেই যেন সকল তীর্থের সমাবেশ হইয়াছিল। চলিতে থাকিত

উদ্দীপনাময় ভগবৎপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রের কথা, ঠাকুরের কথা, তাঁহার সন্তানদের কথা—স্তব, স্তোত্র, ভজন—আবার সুখ-দুঃখের প্রশ্ন, সপ্রেম সম্ভাষণ, রঙ্গরস-স্ফূর্তি; ঢালিতেন সহানুভূতি, অমোঘ আশীর্বাদ। একদিন ঢাকার জনৈক ভক্ত অনেক ফলমূলমিষ্টান্নাদি লইয়া স্বামিজীর ঘরের সম্মুখে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আশীর্বাদ করুন।" মহাপুরুষজী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "flowing, flowing, flowing (বহিয়াই যাইতেছে)—আশীর্বাদ তো সর্বদাই রয়েছে। কিছু ভাবনা নেই। সব হয়ে যাবে। এমনি বলছি যে তা নয়—ঠিক।" আর একদিন বলিয়াছিলেন, "যে আসবে কাউকে ফেরাব না। আমি মা গঙ্গা হয়ে গেছি।"

যাহারা সমাজে একান্ত ঘৃণিত তাহারাও এই 'গঙ্গার' কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের পতিতপাবন নাম দ্বারা তাহাদিগের দেহ-মন শুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তিনি কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। জনৈক অনুতপ্তা ও সঙ্কুচিতা স্ত্রীলোককে অভয় দিয়া একবার বলিয়াছিলেন, "ভয় কি মা, তুমি যখন পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় নিয়েছ, তোমার পরম কল্যাণ হবে। বল—ইহকালে, পরকালে যত পাপ করেছি সব এখানে দিলাম, আর পাপ করব না।" যথাবিধি দীক্ষাদির পর স্ত্রীলোকটি যখন বাহির হইয়া আসিল তখন যেন নূতন লোক—স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা হইয়া গিয়াছে।

এই চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধ বেলুড় মঠের একটি দ্বিতলকক্ষে খাটের উপর বসিয়া দূর্ দূরান্তরে যে আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর

বলতেন, 'এক-আধ জনকে দেখে শুনে দিতে হয়।' কিন্তু এখন তো একেবারে বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। তিনি কেন যে এত লোকের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন তা তিনিই জানেন। তাঁর ইচ্ছা, আমি আর কি করব বল? এইভাবে এই বুড়ো শরীরটা আর ক দিন বইতে পারবে, তা তিনিই জানেন।" তিনি যেমন অধ্যাত্মরাজ্যের মহামহিম সম্রাট, লোকতারণ শ্রীগুরু—আবার তেমনি ছিলেন অসীম-স্নেহময় পিতা, করুণাময়ী জননী; প্রেমময় বন্ধু। যাঁহারা বেলুড় মঠে বাস করিতেন, তাঁহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সাধন ও বিশ্বাসের উপর তাঁহার সংস্পর্শ অলক্ষ্যে অপূর্ব পরিবর্তনসাধনও করিত। দূরদূরান্তরে যে-সকল সন্তান থাকিতেন এই লোকোত্তর গুরুর অলক্ষ্য শক্তি যে তাঁহাদিগকেও গন্তব্যপথের দিকে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দিতেছে, ইহা তাঁহারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন। তাঁহার আশীর্বাদ তপস্বীকে তপস্যাতে একনিষ্ঠ করিত, কর্মীকে কর্মে উৎসাহ দিত, সংসারীকে দুর্গম সংসারপথে নব বল, নূতন আশা দান করিত।

শ্রীভগবানের করুণামূর্তির সর্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি তো ব্রহ্মিষ্ঠ গুরু-মূর্তিতেই। তিনি ভাস্বর তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কখনও নির্বিকল্প আত্মানন্দে বিভোর আবার ব্যুত্থানকালে দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর ন্যায় অলীক সংসারকে কৌতুকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—উহার সহিত যাবতীয় ব্যবহার করিতেছেন—ভ্রান্ত জীবকে করুণায় স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য। তাই তো এই পাবন দক্ষিণামূর্তির ধ্যান।

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।

যঃ সাক্ষীকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥

এই ধ্যান আমাদের অন্তরের কালিমা নিমেষে হরণ করিয়া বিমল তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত করে। মহাপুরুষজীকে কি ঐ দক্ষিণামূর্তির চেতন বিগ্রহরূপে পাওয়া যায় নাই? একদিন মঠে গঙ্গার ধারের উপরের বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে জনৈক সেবককে তিনি বলিয়াছিলেন, "এটা (নিজের শরীর দেখাইয়া) মুক্ত শরীর কিনা, তাই এটার চিন্তা করলে মুক্ত হয়ে যায়।"

প্রত্যহ সকালে একটু জলযোগ করিয়া যখন তিনি মঠের সকল সাধু-ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করিতেন, তখন বাস্তবিকই ভাবুকের মনে দক্ষিণামূর্তির স্তোত্রের এই ছবিটি ভাসিয়া উঠিত—

মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং

বর্ষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ।

আচার্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং

স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্তিমীড়ে॥

—এই তো মৌন আড়ম্বরহীন দুই-একটি ইঙ্গিতে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকটীকরণ; এই তো চতুষ্পার্শ্বে কামকাঞ্চনত্যাগী ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের সমাবেশ; এই তো অভয়জ্ঞানমুদ্রাহস্ত স্বাত্মারাম আনন্দময় আচার্যেন্দ্র-মূর্তি!

সন্ন্যাসীর নিকট তিনি ছিলেন কঠোর সন্ন্যাসী। জনৈক সাধু প্রণাম করিতে গিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে?" তিনি পূর্বাশ্রমের ডাকনাম বলিলেন। মহাপুরুষজী বলিলেন, "উঁহু—ঠিক বল্।" তখন সাধুটি বলিলেন, "—আনন্দ।" মহাপুরুষজী আনন্দে আটখানা

হইয়া বলিলেন, "হাঁ, ঠিক।" সন্ন্যাসীকে পূর্ব সংস্কার সম্পূর্ণ ভুলিতে হইবে—তাই এই ভাবে সন্ন্যাস-সংস্কারকে সুদৃঢ় করিয়া দেওয়া। সকালে সাধুরা প্রণাম করিতে আসিলে মাঝে মাঝে আনন্দ করিয়া সন্ন্যাসীদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সম্ভাষণ জানাইতেন, "ওঁ নমো নারায়ণায়"। আবার কখনও বা সংস্কৃতভাষায় জিজ্ঞাসা করিতেন, "সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বা? কা বার্তা?" ইত্যাদি। সন্ন্যাসী যে তাঁহার অন্তরঙ্গ—তাই সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সহজ আনন্দ। তিনি বৈরাগ্যশতকের "ভোগে রোগভয়ং···ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্" শ্লোকটি মাঝে মাঝে উচ্চারণ করিতেন। আবার কখনও কখনও হাতে হাত ঠুকিয়া দৃপ্তকণ্ঠে যখন বলিতেন, 'আমরা তো সন্ন্যাসী' তখন তাঁহার রক্তিম দীপ্ত মুখমণ্ডল যেন অন্তরের গৈরিকরাগকে দর্শকের চক্ষে তুলিয়া ধরিত।[১]

* * *

ঠাকুর কামারপুকুরের নিকট শ্যামবাজারে গিয়া যোগমায়ার আকর্ষণের প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। মানুষের আকর্ষণে মানুষ আসে বিচার করিয়া, রূপ-গুণ দেখিয়া, লাভ-লোকসান খতাইয়া। যোগমায়ার আকর্ষণে এ সকলের অবসর নাই। তিনি যখন 'ভেল্‌কি' লাগাইয়া দেন তখন যেন আসে মহাপ্লাবন—উহা দূরদূরান্তরে উদ্বেল বারিপ্রবাহ

১ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে প্রায় সকলকেই সুপুরুষ বলা যাইতে পারে। শরীর দেখিলেই ভিতরকার আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ বুঝা যাইত। মহাপুরুষজীও দীর্ঘদেহ (উচ্চতা আন্দাজ ৬ ফুট) গৌরবর্ণ সুপুরুষ ছিলেন—উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট ও বক্ষ, দৃঢ়সঙ্কল্পসূচক ওষ্ঠদ্বয়, আয়ত চক্ষু। তাঁহার কণ্ঠস্বরও অতি মধুর ছিল। ৮০ বৎসর বয়সেও তাঁহার কপালে একটি রেখাও দেখা যায় নাই—শরীর ক্ষীণ হইলেও চর্ম শিথিল ছিল না।

বিস্তার করিয়া অকস্মাৎ সকলকে ভাসাইয়া লইয়া চলে—ঘরের খুঁটি আঁকড়াইয়া কেহ যে বসিয়া থাকিবে তাহার আর উপায় থাকে না। তাই সেই জনবিরল পল্লীগ্রামে 'তাকুটি' 'তাকুটি' মৃদঙ্গ বাজাইয়া কোথা হইতে দলে দলে লোক কীর্তন গাহিয়া ঠাকুরকে ঘিরিয়া ফেলিতে লাগিল। দিন নাই, রাত নাই অবিশ্রান্ত জনসমাগম—স্ত্রী-পুরুষ, বালক-যুবা-বৃদ্ধ, অভিজাত আবার চাষাভুষা, তাঁতী-কামার, মুচী-মেথর। কেন আসিয়াছে তাহা জানে না; কিন্তু না আসিয়া পারে নাই। দুরতিক্রম্য আকর্ষণ!

যোগমায়া শ্রীরামকৃষ্ণদেহ আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রজাল লাগাইয়াছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ আবার তাঁহার অন্তরঙ্গ সন্তানগণের মধ্যে ঢুকিয়া কত বিচিত্র বিভূতি প্রকাশ করিলেন! ঠাকুরের স্থূলদেহের তিরোধানের পর পঁয়তাল্লিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার মহাসংঘে বিভিন্ন পার্ষদকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ কতকগুলি আকর্ষণের পরিবেশ আমরা লক্ষ্য করি। মহাপুরুষ মহারাজের জীবনের অন্তিম চারি বৎসর ঐ 'ভেল্‌কি'র শেষ অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে—আর শেষ বলিয়াই বোধ করি উহা অতি স্পষ্ট, অতিশয় সমৃদ্ধ ও অত্যদ্ভুত!

এই চারি বৎসরে তাঁহার ব্যাধিজর্জরিত স্থবির অথর্ব শরীরটা লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কী অপূর্ব আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যেরই না প্রকট করিয়াছিলেন! শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ আয়াসলভ্য আত্মসমাধানের দ্বারা বিরলে একা একা অনুভূতি নয়—জনকোলাহলের মধ্যে বসিয়া দিবারাত্র প্রতি বাক্যে, প্রতি আচরণে, প্রতি চিন্তায় সেই অনুভূতির সহস্র ধারায় জীবন্ত ভাবে প্রকাশ। তিনি আর এখন ব্রহ্মবিৎ নন—'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ'; প্রেমী নন—প্রেমোন্মাদ, যোগী নন—নিত্যযোগী। জ্ঞান-ভক্তি-বিশ্বাস-প্রেম-

করুণার উথল স্রোত সব কিছুকে প্লাবিত করিয়া লইয়া চলিয়াছে। ঘর-বাড়ী গাছ-পালা ভিন্ন করিয়া চিনিবার আর উপায় নাই। জল—জল—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাববন্যার জলে সব একাকার!

কৃষ্ণপ্রাণা গোপিনীরা কৃষ্ণচিন্তায় আপন সত্তা হারাইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, 'আমি কৃষ্ণ'। এই রামকৃষ্ণময় বৃদ্ধ তাপসের 'আমি'তেও শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া কখন কখন এরূপ ভর করিতেন যে তিনি নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলিতেন। ১৯৩০ সালে অক্টোবর মাসে একদিন অনেকক্ষণ ভাবে গর্গর মাতোয়ারা থাকিয়া একটু সামলাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "যেন একটা ডাকাত ঢুকেছিল। কালীকীর্তন হতেই ছেড়ে গেল; বাপ্‌রে বাপ—শরীরটা যেন তছনছ করে দিয়ে গেছে! • এ রকম ভাব ঠাকুরের হত। আমি তো তাঁরই সন্তান। 'কুছ্ নহী তো থোড়া থোড়া' তো আছে।" সেই সময়ে পূজনীয় খোকা মহারাজ কাছে আসিয়া পড়াতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমরা এ সব ব্যাপার তো একটু একটু বুঝি! বড় জোর আর তিন-চার বছর চলবে। ··· এখন শুধু খোলটা পড়ে আছে।" খোলটাই তো পড়িয়াছিল। সেই খোলের মধ্যে বাস করিতেছিল একটা জমাটবাঁধা চেতন-মাধুর্য—ত্রিগুণাতীত পরমহংস ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার একমাত্র কাজ ছিল—কৃপা; একমাত্র ব্রত ছিল—জগতের সর্বপ্রকার দুঃখমোচন।

আবার ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার প্রতি বাক্য ও আচরণে অদ্বৈতজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিত। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "হৃদে, সংসার যদি সত্য হত তোদের কামারপুকুরটাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতাম।" এই ঠাকুরের সন্তানও বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমার কাছে এ জগৎটার

কোন অস্তিত্বই নেই, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন; নেহাত মনটা নীচে নামিয়ে রাখবার জন্য কথাবার্তাও বলি আর পাঁচরকম খবরাখবরও নিই।" যাঁহাকে বলিয়াছিলেন তিনি মহাপুরুষজীরই আজ্ঞায় মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী, চাকরবাকর, গরু-বাছুর এবং অন্যান্য কাজকর্মের খবর লইয়া আসিয়া সবেমাত্র তাঁহাকে বলা শুরু করিয়াছিলেন। আর একদিন শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতঃ' – এই প্রথম শ্লোকটি শুনিতে শুনিতে তিনি বলিয়াছিলেন, "মাইরি বলছি, এ জগৎটা আছে কিনা, হয়েছে কিনা, সৃষ্টি আছে কিনা, হয়েছে কিনা—এখনও আমার বোধ হয় নি; কিসের আবার যাতায়াত!" একদিন সকালে খিদিরপুরের একটি ভক্ত প্রণামান্তে পায়ের ধূলা চাহিলে হাসিয়া বলিলেন, "পা-ই নেই তো পায়ের ধূলো!—'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।' সংস্কৃত জান?" ভক্তটি 'না' বলাতে একজন সন্ন্যাসীকে ব্যাখ্যা করিয়া দিতে বলিলেন। সন্ন্যাসী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সম্পূর্ণ মন্ত্রটি বাংলা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

সুর সর্বদা চড়িয়াই থাকিত—তারে অঙ্গুলি ঠেকিলেই যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। একটি ছেলে বি-এ পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে। প্রণাম করিতেই মহাপুরুষজী বলিতেছেন, "তুই কে? আমি কে জানিস্?" ছেলেটি এইরূপ প্রশ্নে ভড়কাইয়া গেল। তখন বলিলেন, "আমি হচ্ছি সেই আত্মা। আমি ঠিক জানি—আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। আর তোরা যখন ঠাকুরের কাছে এসে পড়েছিস—তোরাও ক্রমে এটা বুঝতে পারবি।" আর একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি তো এখন নির্বাণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে দেখছি সেই বিরাট অনন্তধাম। ঠাকুর কৃপা করে ক্রমে ক্রমে সব খুলে দিয়েছেন। নির্বাণের রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন—পরিপূর্ণ করে

দিয়েছেন। এখন আর কোন ভাবনা নেই। শরীর যাক আর থাক।" যখনই কেহ শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এক উত্তর—"শরীর? শরীরে কি আছে? আমি তো শরীর নই। এ শরীর ষড়্‌বিকারসম্পন্ন—জায়তে অস্তি বর্ধতে অপক্ষীয়তে এই সব। এ তো যাবেই—most natural thing (একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার)। শরীর যাক—জ্ঞান-ভক্তি ঠিক থাকলেই হল। এ শরীর গেলেও আমি ঠিক থাকবো। (বুকে হাত দিয়া) ঠিক।"

একদিন শরীরের কথায় বলিয়াছিলেন—"কিছু নেই, ঠাকুর খড়কে দিয়ে তাঁর কাজ চালাচ্ছেন—তা তাঁর যতদিন ইচ্ছে চলুক।" ঠাকুর দুরন্ত ব্যাধিযন্ত্রণার মধ্যে রামপ্রসাদের গান হইতে বলিতেন, "দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।" ঠাকুরের সন্তান মহাপুরুষজীকেও দেখিলে মনে হইত যেন ঐ গান তাঁহার প্রতি হৃৎস্পন্দনের সহিত ধ্বনিত হইতেছে। চব্বিশ ঘণ্টা হাঁপানির টান চলিয়াছে, ঘুম নাই, রক্তের চাপে শরীর টলমল করিতেছে, আহার নামমাত্র—পূর্বেকার সেই সুদীর্ঘ উন্নত বক্ষ ও দৃঢ় দেহকে জরা-ব্যাধি ক্ষীণ শিথিল ও উত্থানশক্তি-রহিত করিয়া ফেলিয়াছে—তাঁহার শারীরিক কষ্ট দেখিয়া অপর সকলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে; তিনি কিন্তু স্থির, নির্বিকার—আর ঝঙ্কার দিয়া বলিতেন, "শরীরের জন্য কোন চিন্তা নেই; যে সাধু শরীরের জন্য ব্যস্ত, মরতে ভয় করে, সে সাধুই নয়। I am always ready for His call (আমি তাঁর আহ্বানের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত)। গুরুকৃপায় এটা বেশ বুঝতে পেরেছি যে এ শরীরটা আমি নই—সে জ্ঞান দয়া করে খুব পাকা করে দিয়েছেন। We are ever ready to jump into Mother's lap (মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে আমরা সর্বক্ষণই তৈরী হয়ে

আছি)।" একদিন বলিলেন, "আজকাল একটা ভারী মজা দেখ্ছি; এটাকে অবলম্বন করে দুটো ব্যাপার চল্‌ছে—একটা শরীরের, আর একটা আত্মার। শরীরের দিক থেকে ব্যাধি ইত্যাদি কত কি, আর আত্মার দিক থেকে নির্ম্মল আনন্দ—বেশ আনন্দ হয় দেখে আর ভেবে।"

কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহার ভগবদ্‌বিলাসের দেহের কোন প্রকার অযত্ন করিতেন না। 'বৈদ্যনারায়ণের' সব নির্দেশই মানিয়া চলিতেন, অথচ ভিতরে তাঁহার পাকা জ্ঞান ছিল—'হরিই একমাত্র বৈদ্য'। একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার দেহ মন প্রাণ সবই তাঁর চরণে অর্পণ করে দিয়েছি। এখন তিনি যেমন ইচ্ছা করেন—এ শরীর আরও রাখার প্রয়োজন বোধ করেন তো রাখবেন, নইলে যখনই ডাকবেন চলে যাব। তা বলে এ শরীরের কোন অযত্ন করি নে। তোমরা সকলে যেমন বল, ডাক্তার যেমন বলে--সেই ভাবেই চলবার চেষ্টা করি। এই শরীরের জন্য (সেবকদের দিকে তাকাইয়া) এদেরই বা কত কষ্ট দিচ্ছি! এতটা করি কেন জান? এ দেহ তো সাধারণ দেহের মত নয়—এর একটা বিশেষত্ব আছে। এ শরীরে ভগবান-উপলব্ধি হয়েছে। এ শরীর ভগবানকে স্পর্শ করেছে, তাঁর সঙ্গে বাস করেছে, তাঁর সেবা করেছে। এই শরীরকে তিনি যুগধর্ম-প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ করেছেন—তাই এত। নইলে খালি শরীরটা রক্ত-মাংসের খাঁচা বইতো নয়!"

কূটস্থ আত্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া শারীরিক যন্ত্রণাকে তাঁহার এইরূপ ভাবে উপেক্ষা করিবার প্রভাব সংঘের সমগ্র সাধু ও ভক্তমণ্ডলীর উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। এই সময়ে সুদূর আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া আশ্রমে জনৈকা বৃদ্ধা ব্রতধারিণী সিষ্টার দেবমাতা উপাসনামন্দিরে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া গুরুতরভাবে আহতা হন এবং আরোগ্যলাভ

করিতে তাঁহার দীর্ঘ সময় লাগে। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি যখন মৃতপ্রায় তখন মহাপুরুষজীর 'সর্বংসহ' অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি প্রাণে ধৈর্য ও বল আনিতেন। রোগমুক্তির পর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া দেবমাতা এই কথা মহাপুরুষজীকে লিখিয়াছিলেন।

ঠাকুর দেখিয়াছিলেন কোশা-কুশী, পূজার উপচার, দালান সব চিন্ময়। তাঁহারই সন্তান মহাপুরুষজী একদিন গভীর রাত্রে খাটে বসিয়া আছেন—ধ্যানস্থ। কিয়ৎক্ষণ পরে আপনভাবে এক একবার চক্ষু মেলিয়া দেখেন, আবার চোখ বন্ধ করিয়া ধ্যান করেন। একটি বিড়াল মেঝের উপর মিউ মিউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। মহাপুরুষজী হাত জোড় করিয়া বিড়ালকে প্রণাম করিলেন এবং নিকটস্থ সেবককে বলিলেন, "দেখ্, ঠাকুর আমায় এখন এমন অবস্থায় রেখেছেন যে সবই দেখ্ছি চিন্ময়; ঘর-দোর, খাট-বিছানা এবং সব প্রাণীর ভেতরই সেই এক চৈতন্যের খেলা।"

এই 'চৈতন্যের খেলা' কিছুদিন তাঁহাকে খুব পাইয়া বসিয়াছিল। যেই প্রণাম করিতে যাইত তাহাকেই তিনি দুই হাত মাথায় তুলিয়া আগেই নমস্কার করিতেন, আর সেবককে ফল মিষ্টি দিতে বলিতেন। ভাবস্থ হইয়া একদিন বলিলেন, "সর্বভূতান্তরাত্মা দেব, জয় সর্বদেব। আহা, শাস্ত্রে কী সব কথা বলেছে! এতদিন এ সব এত বুঝি নি। প্রত্যেকের হৃদয়ে তিনি আছেন। প্রত্যেকের ভেতর তাঁকে নমস্কার অবশ্য আগেও করেছি মনে মনে, কিন্তু এখন বাইরে আনুষ্ঠানিক ভাবে করতে ইচ্ছে হচ্ছে।" ফলতঃ মঠের প্রবীণ বা নূতন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরনারী, বালকবালিকা সকলকেই দেখামাত্র যুক্তকরে প্রণাম জানাইয়া কিছু খাওয়াইয়া তবে তাঁহার শান্তি হইত।

একদিন তাঁহার ঝোঁক হইল বাগ্দীদের ইলিশ মাছ খাওয়াইবেন—

গঙ্গায় নৌকা হইতে অনেকগুলি মাছ কিনাইয়া বাগ্দীদের দিয়া তবে নিশ্চিন্ত। আর একদিন খেয়াল হইল সাধুদের বড় বড় বাতাসা খাওয়াইতে হইবে—কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনাইয়া থাবার পঙ্গতে পাঠাইয়া দিলেন।

তাঁহার ঘরে দর্শনার্থী সমবেত সাধু ও ভক্তদের সহিত তিনি কথা বলিতেছেন; সেই সময়ে শরীর খুব অসুস্থ বলিয়া সেবক সতর্ক করিতে গেলে বলিলেন, "আমি রামকৃষ্ণের চেলা। তাঁর অত ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও যখনই কেউ এসেছে, তার জন্য কত ভাবনা, কত আলাপ! আর আমি চুপ করে বসে থাকবো? শরীর খারাপ তা কি হবে? তোমরা এসে শুধু প্রণাম করে চলে যাও—তোমরাই বা কি ভাববে? ভাববে, রামকৃষ্ণের চেলা এই রকম?" ঐকালে তিনি যেন দেহ এবং বিদেহ অবস্থার মিলনভূমিতে স্থিত হইয়া জীবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণসাধনে তৎপর ছিলেন—সব কিছুই অবিচারে অকাতরে দান করিতেন।

উপনিষৎ বলিয়াছেন, "আত্মচৈতন্যকে ভূতে ভূতে যিনি পরিব্যাপ্ত দেখিতে পান তিনিই যথার্থ ধীর।" ঠাকুর গণিকার মধ্যেও জগন্মাতাকে দেখিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন—নৌকার মাঝির পৃষ্ঠের আঘাত নিজ শরীরে অনুভব করিয়াছিলেন। স্বামিজী জীবন ও বাণী দ্বারা ঘোষণা করিয়াছিলেন, "সর্বভূতে সেই প্রেমময়।" ঠাকুরের সন্তান, স্বামিজীর সঙ্গী শিবানন্দকেও আমরা ইতঃপূর্বে বাঙ্গালোরে অস্পৃশ্যদের গ্রামে উহাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গিরূপে পাইয়াছি; মাদ্রাজে ক্ষুধাতুর সর্বহারাদের জন্য কাঁদিতে লক্ষ্য করিয়াছি; উটকামণ্ডে, আলমোড়ায়, কাশীতে, দার্জিলিংএ ধ্যানের অবসরে দরিদ্র ও আতুরদের জন্য ভাবিতে ও করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু এখন জীবনের সন্ধ্যায় শেষ কয়েক বৎসরে সেই পরদুঃখকাতরতা, সহানুভূতি

রূপান্তরিত হইয়াছিল অনন্যসাধারণ সর্বভূতাত্মতায়। কাহারও দুঃখের কথা শুনিলে, কাহারও বেদনাভরা মুখ দেখিলে অক্ষমদেহ নির্বাণপথযাত্রী বৃদ্ধের সমস্ত দেহ মন প্রাণ যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। গঙ্গাবক্ষে মাছ-ধরা জেলে, উৎসবের কুলী-মজুর-মুটে, পাড়ার বাগ্দী-হাঁড়ী-সাঁওতাল, মঠের চাকর-গোয়ালা-মালী, আবার ভক্তদের গৃহের ভৃত্য-দরোয়ান-ড্রাইভার—সকলেরই তিনি ছিলেন 'বাবা'। 'বাবা'র তো নীচে নামিবার ক্ষমতা নাই—উঠানের দিকের জানালার নিকট দাঁড়াইয়া নীচে দণ্ডায়মান তাহাদের সহিত আলাপ করিতেছেন—সুখ-দুঃখের কথা শুনিতেছেন, কাপড়-টাকা-বকশিস দিতেছেন। আবার কাহারাও বা তাঁহার ঘরে আসিয়াই তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাইতেছে। 'বাবা'র কাছে সকলেরই সমান অধিকার। কেহ শূন্যহাতে ফিরিতেছে না। হয় নগদ টাকা নয় বস্ত্র; আর তাহা না হইলে ফলমিষ্টি প্রত্যেককেই দেওয়া চাই। "মহারাজ, অমুক জায়গায় অমুক মেয়েটির বড় অসুখ—কিছু দিতে হবে।" "কত?" "দশ টাকা"। "আচ্ছা, লে যাও।" "মহারাজ, চাকরী নেই—বড় কষ্ট।" "আচ্ছা, ভয় নেই—চাকরী হবে। আপাততঃ পঁচিশ টাকা নিয়ে যাও।" ইত্যাত্যাকার যাজ্ঞা এবং সহাস্যমুখে তাহার পরিপূরণ ছিল নিত্যকার ঘটনা। একবার ভোলানাথ বাবু নামে তাঁহার জনৈক দীক্ষিত ভক্ত কর্মহীন অবস্থায় অনেকগুলি অপোগণ্ড শিশু লইয়া খুব বিপন্ন হইয়া পড়েন। মহাপুরুষজী শুনিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভোলানাথ, তুমি ভেবো না—আমরা যতদিন দুমুঠো খেতে পাব, তোমরাও উপোসী থাকবে না। এই টাকাগুলি নিয়ে যাও—ফুরিয়ে গেলে আবার এসে নিয়ে যেও। মা তোমার একটা ব্যবস্থা করে দেবেনই।" ভক্তটিকে দীর্ঘকাল ঐভাবে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন।

জনৈক মন্ত্রশিষ্যা স্বামীর সদ্যোমৃত্যুতে শোকাতুরা হইয়া অনেক বিলাপ করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। পত্রটি মহাপুরুষজী স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছেন। খানিকটা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা! আর শুনতে পারছি নে!" পতিহারা দুঃখিনীর হৃদয়বেদনা নিজের প্রাণে অনুভব করিয়া তিনি যেন ছটফট করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে "আহা! আহা! সদ্য স্বামিশোক" বলিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ জেলে পূর্ণ হালদার একটি ভাঙ্গা ডিঙ্গিতে মঠের সামনে গঙ্গায় মাছ ধরিত। বেচারীর অন্নসংস্থানের অপর কোনও উপায় নাই। 'বাবা' দোতলার বারান্দা হইতে দেখিয়াছেন। সেবকদের উপর কায়েমী হুকুম হইল—ও যখনই মাছ লইয়া আসিবে, চুনো পুঁটিই হউক আর যাহাই হউক—তাহা যেন দর-দস্তুর না করিয়া রাখা হয়। তাহার আনীত আট আনার মাছ দু'টাকা এবং উপরন্তু একখানি নূতন কাপড় বকশিস দিয়া একাধিক বার মহাপুরুষজী রাখিতে বলিয়াছেন। বেচারী কিছুদিন পরে মারা যায়। মহাপুরুষজী শুনিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—তাহার বিধবা পত্নীকে টাকা ও বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিলেন।

নিজে তো চলচ্ছক্তিহীন—ব্যাধিতে দেহ জর্জরিত; কিন্তু মঠে কাহারও অসুখ হইয়াছে শুনিলে পীড়িতের জন্য ভাবনার অন্ত নাই। বার বার সেবকদের পাঠাইয়া খোঁজ লইতেছেন, ফল পাঠাইয়া দিতেছেন, অসুখ সারিয়া গেলে শরীরে তাড়াতাড়ি বল আনিবার জন্য দুধের ব্যবস্থা করিতেছেন। দীর্ঘকাল কেহ ভুগিতে থাকিলে সেবকদের বলিতেছেন, "চেয়ারে করে ধীরে ধীরে আমায় নিয়ে চল, ওকে একবার দেখে আসি।"

দুই জন সাধুর কঠিন অসুখ—মাথার অবস্থাও তত ভাল নয়। তাঁহার কি উৎকণ্ঠা, আর কত উদ্বেগ! আর বলিতেছেন, "মা, এরা বালক

—এদের উপর ঝড়ঝাপ্‌টা দিও না। এরা কি সইতে পারবে? আমি বরং এ সব সইতে পারি। এরা তো বালক!"

জনৈক আমেরিকাবাসী ভক্ত লিখিয়াছিলেন, "মহাপুরুষজীর প্রেমের ধারাই ছিল অত্যদ্ভুত। উহা সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হ'ত - সকলকে সমান করে দিত। উহা ক্ষুদ্রতমকে মহান, মহানকে মহত্তম ও পবিত্রতম করতো। তাঁর জার্মান, ইংরেজ, আমেরিকান, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও জরথুষ্ট্রীয় ভক্তশিষ্য-গোষ্ঠী হ'তেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ ও কৃষ্টির সংকীর্ণ গণ্ডীরেখা-বিবর্জিত হয়েছিলেন।"

অন্তরে বাহিরে চৈতন্যঘন ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি—বাধাহীন বিশ্বাত্মকতায় সেই অনুভূতির পদে পদে অভিব্যক্তি—ইহাই কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ কথা নয়। সমাধিস্থ হইয়া আত্মানন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য তো তিনি জগতে আসেন নাই আর কেবলমাত্র এই কথা শুনাইবার জন্যই তিনি আশী বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন না। না, তাহা কখনই নয়। অরূপ যদি রূপ ধরিয়া কাছে না রহিল তাহা হইলে শুদ্ধব্রহ্মাবস্থিতিতে কি প্রয়োজন? ঠাকুর শেষ পর্যন্ত তাই 'মা মা' করিয়া গেলেন। মহাপুরুষজীও ব্রহ্মজ্ঞানের সুরে 'ঠাকুর ঠাকুর' তান মিশাইয়া অনুপম রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন জায়গায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন যেখানে বরফ কখনও গলে না। নিত্যলীলা—নিত্যরামকৃষ্ণ। ঠাকুর—পঞ্চাশ বৎসর আগে দক্ষিণেশ্বরের সেই মিলনসন্ধ্যায় যিনি 'মা' হইয়া কোলে টানিয়া লইয়াছিলেন – তাঁহার স্মৃতি আজ জীবনের প্রান্তে এই বৃদ্ধশিশুর হৃদয়-মনের কতখানি জুড়িয়া থাকিয়া তাঁহার অন্তরকে নিশিদিন উদাস কান্নার সুরে ধ্বনিত করিয়া রাখিত তাহা বাহির হইতে সব সময়ে বুঝা যাইত না। কোন কোন সৌভাগ্যবান সন্তানের

নিকট তিনি হঠাৎ ধরা পড়িয়া যাইতেন। ঠাকুরঘরে তো যাইতে পারিতেন না। নিজের ঘরের জানালা দিয়া ঠাকুর-ঘরের দিকে চাহিতেন। সে দৃষ্টির ভিতর ফুটিয়া উঠিত এক গহন অনুরাগ! ঘরে ঠাকুরের একটি বড় ফটো ছিল। দুই কর জুড়িয়া যখন উহার দিকে তাকাইতেন তখন চক্ষু ছল ছল করিত। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণনাম সহিতে পারিতেন না—কাল রূপ দেখিতে পারিতেন না। এই অশীতিপর বৃদ্ধ যতির নিকটও বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণনাম অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল—শুনিলে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। একদিন সন্ধ্যায় ভবানীপুরের কয়েকজন গায়ক-ভক্ত তাঁহাকে কয়েকটি গান শুনাইয়া বিদায় লইবার সময় প্রার্থনা করিতেছেন, "মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যেন ভক্তি হয়।" মহাপুরুষজী স্থির হইয়া গান শুনিয়াছেন এবং খুব প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "ভক্তি হবে না? (ঠাকুরের ঘরের দিকে তাকাইয়া) ঠাকুরের কাছে এসেছ…।" ব্যস্—'ঠাকুর'-শব্দ-উচ্চারণই যথেষ্ট। ভক্তেরাও দরজার বাহিরে গিয়াছেন—মহাপুরুষ মহারাজও হাতে চোখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সে বিহ্বলতা কাটিয়া যাইতে অনেকক্ষণ লাগিয়াছিল।

শেষরাত্র হইতেই তিনি খোঁজ লইতে আরম্ভ করিতেন, ঠাকুরঘর খুলিতে পূজারী আসিল কিনা। সেবককে কৌশলে বুঝাইয়া শান্ত করিতে হইত। তাহার পর যথাসময়ে পূজারী ও ভাণ্ডারীকে গঙ্গার ঘাটে মুখ-হাত ধুইতে দেখা গেলে তাঁহাকে বলা হইত, "এইবার আসছে, মহারাজ।" মহারাজ আনন্দে বিভোর—এইবার ঠাকুরঘর খোলা হইবে। মঙ্গলারতির শঙ্খ বাজিয়া উঠিল—তাহার পর আরতির ঘণ্টা—করতালের ধ্বনি। মহারাজ ঘরে শয্যার উপর বসিয়া অনবরত 'জয় গুরু মহারাজ,

জয় ভগবান, জয় যুগাবতার, জয় প্রভু' শব্দে ঘরের মধ্যে কী এক গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টিই না করিতেন !

নিয়ম করিলেন—মঙ্গল-আরতির পর ঠাকুরঘরে ভজন করিতে হইবে। "তিনি যে সগুণ ব্রহ্ম, তিনি চান—ভক্তেরা আমার কাছে এসে বসুক, স্তবস্তোত্র গান করুক।" কি গান হইতেছে জানিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিতে হইত—তিনি আবার নিজে গুন গুন করিয়া সেগুলি গাহিতেন। কখনও কখনও তাঁহার কোন বিশেষ প্রিয় গান গাহিবার জন্য ফরমাস পাঠাইতেন।

প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ কি হইবে—ভাণ্ডারীকে আসিয়া উঁহার নির্দেশ লইয়া যাইতে হইত। সন্ধ্যারতির শঙ্খ বাজিয়া উঠিলে শ্রীভগবানের নাম উচ্চৈঃস্বরে হাততালি দিয়া উচ্চারণ করিতেন। অপর কোন কথা বা কাজ তখন আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি। সারাদিন অজস্র লোকসমাগম। মহাপুরুষজী শরীরের কথা, অসুখের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। যে আসিতেছে, দর্শন করিয়া কথা বলিয়া যাইতেছে। যে চাহিতেছে, তাহাকেই ঠাকুরের নাম দিতেছেন। আনন্দে গরগর মাতোয়ারা। রাত্রে সেবক শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "তুই তো আচ্ছা বোকা! আজ ভগবানের জন্মদিন। আজ শরীর-টরীর কি ?"

সকালে পূজারী প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুরের পূজারী, তাই তাহাকে দেখিয়াই ঠাকুরের উদ্দীপন। ভাবস্থ হইয়া বলিতেছেন, "জয় গুরু মহারাজ, জয় গুরু মহারাজ।" তাহার পর পূজারীর দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "ব—, বেশ তুমি ঠাকুরের পূজো করছো। খুব ভক্তি-বিশ্বাস হোক। পূজোর পর এই বলে প্রার্থনা করবে, 'ঠাকুর, তোমার পূজো

তুমি করিয়ে নাও। আমি তোমার পূজোর কি জানি?' যারা যারা এখানে ঠাকুরের সেবার কাজ করছে সকলেরই মহাকল্যাণ হবে। অনেকে বলে, ঠাকুর তো সব জায়গায় রয়েছেন। হাঁ, সত্য; কিন্তু এ মঠে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। স্বামিজী তাঁকে বসিয়ে গেছেন এখানে—সেই যে আত্মারামের কৌটা।"

আর একদিন বলিতেছিলেন, "সর্বদা ঠাকুরঘরে একটা ভাবধারা বজায় রাখতে হবে। ওখানে গেলে মনে হবে যেন সাক্ষাৎ ভগবানের কাছে এসেছি। তিনি ভক্তি-ভক্ত ভালবাসেন। শুধু একটু ধ্যান করলাম—ওতে চিড়ে ভিজে না। ভক্তি চাই, দুই-ই চাই।" পূজারীকে দেখিয়া একদিন অভয় দিতেছেন—"তেরা ডর্ নেহিঁ। তুই যে ভক্ত, তোর ভয় কি!"

কোন ভক্ত মঠে আসিয়া প্রাণের আবেগে হয়তো ঠাকুর প্রণাম না করিয়াই তাঁহার কাছে আসিয়াছে। মহাপুরুষজীর প্রথম প্রশ্নই ছিল—"ঠাকুরদর্শন করে এসেছ?" "না" বলিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ঠাকুরঘরে পাঠাইয়া দিতেন—বলিতেন, "ঠাকুরদর্শন করে, ওখানে বসে জপ-ধ্যান ও প্রার্থনা করে, তাঁর চরণামৃত খেয়ে তারপরে অন্য কাজ।" আবার বলিতেন, "ঠাকুরঘরকে আমরা কৈলাস করে রেখেছি—বৈকুণ্ঠ করে রেখেছি।"

যে-কেহ মঠে আসিলে তাহাকে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়াইবার আগ্রহ মহাপুরুষ মহারাজের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যাইত। নিজের ঘর হইতে জানালা দিয়া তিনি লক্ষ্য করিতেন, কেহ ঠাকুর-দর্শনান্তে প্রসাদ না লইয়া চলিয়া যাইতেছে কিনা। কেহ প্রসাদ না পাইলে তৎক্ষণাৎ সেবকদের পাঠাইয়া দিতেন, "যা যা, প্রসাদ নিয়ে যেতে বল্।"

ঠাকুর-ভাণ্ডারীদের সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইত, পাছে কেহ ঐরূপ বিনা প্রসাদে চলিয়া যায়।

ঠাকুর ছাড়া তাঁহার নিকট আর কিছুই ছিল না। "ঠাকুরই দুর্গা, ঠাকুরই কালী, ঠাকুরই রাম, শিব, কৃষ্ণ। আবার ঠাকুরই সেই নির্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্য। তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দিবার মালিক। জ্ঞান, মুক্তি এসব তাঁর কাছেই চাইতে হয়, তিনি দিলে তবে সেই জ্ঞান পাকা হয়। তাঁকে বাদ দিয়ে শুষ্ক জ্ঞান কোন কাজের নয়; তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে।" একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর ব্যাপক হয়ে রয়েছেন - সর্বদা শ্বাসে শ্বাসে তাঁর দর্শন পাচ্ছি।" দেশের যাবতীয় আন্দোলনের মধ্যেও তিনি ঠাকুরেরই প্রেরণা দেখিতেন। আইন-অমান্য-আন্দোলনে কংগ্রেসকর্মীদের উপর অত্যাচার-অনাচার-নির্যাতনের কথা শুনিতে শুনিতে কাতরকণ্ঠে করযোড়ে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, "প্রভু, এসব কি হচ্ছে? কল্যাণ কর; প্রভু, শান্তি কর।" ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন, দেশের অভাব-অভিযোগ নিশ্চিতই মিটিবে—বার বার তাঁহার মুখে এই ধ্রুব বিশ্বাসের কথা শোনা যাইত।

দেখিয়া শুনিয়া মনে হইত, তাঁহার সকল চেতনা এ জগতের অতীত কোন-এক প্রিয় বস্তুতে নিশিদিন ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। সেই প্রিয়ের সহবাসে তিনি অহরহঃ কী এক মাধুর্যরসে যেন ডুবিয়া আছেন! যাহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিত তাহারাও সেই মাধুর্যের খানিকটা আস্বাদ পাইয়া যাইত। তাঁহার একটিবার প্রসন্ন দৃষ্টিতে, একটু সাদর সম্ভাষণে কি যেন ছিল যাহা বিরস জীবনকে মুহূর্তে সরস করিয়া তুলিত—শোকাহত ক্লিষ্ট প্রাণে আনিয়া দিত অপার্থিব শান্তি ও আনন্দ!

এই সময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, "হাঁ, আমি ঠাকুরকে মা-ই বলতাম। এখনও তাই। তবে এখন সেই মা অনেক বড়—বিরাট হয়ে গেছেন। এ সবই তিনি। এখন 'ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী'—সবই তাঁর উদরের ভেতর।" শেষাশেষি তিনি 'মা মা' করিয়া পাগল হইয়াছিলেন। বাউল কবির গান—

'মা, তোর যে নাম জপে হৃদয়কূপে নিরজনে যোগী মুনি।

(সেই নাম) আজ জনসমাজে ফকির-সাজে গাইতে এলেম ও জননি ॥'

যেন রূপ লইয়া এই 'বৃদ্ধ আউলে' মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 'মা' আর হৃদয়ের অন্তরতম কক্ষে শুধু ধ্যানের বস্তু নন—তিনি তাঁহাকে প্রকাশ্যে, সকলের সামনে, সকল ব্যাপৃতিতি টানিয়া আনিয়াছেন। চলিতে ফিরিতে বসিতে শুইতে পদে পদে শিশুর মায়ের আঁচল ধরিয়া চলা চাই। 'মা মা মা'—সে কী আপনভোলা উচ্ছলিত মাতৃপ্রেম!

দুর্গাপূজা উপলক্ষে তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেল আনন্দ ও উদ্দীপনা দেখিবার মত ছিল। জন্মাষ্টমীর দিন 'কাঠাম-পূজার' পর হইতেই 'মা মা' করিয়া তিনি পাগল—প্রাণের আবেগে গুন-গুন করিয়া গাহিতেছেন, "যাও, যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা নাকি বড় কেঁদেছে।" আবার কখনও মঠের সাধুদিগকে কোন বিশেষ বিশেষ আগমনী গানের সুর বলিয়া দিতেছেন। ১৯৩০ সালে দুই জন প্রাচীন সাধু প্রত্যহ সকালে তাঁহার ঘরে বা উহার সামনে তখনকার আফিসঘরে খানিকক্ষণ আগমনী গান গাহিতেন। মহাপুরুষজী শুনিয়া খুব খুশী—ভাবে মাতোয়ারা হইয়া যাইতেন।

১৯৩১ সালে সপ্তমী পূজার দিন সকালে জনৈক সন্ন্যাসী খুব ভাবের সহিত মহাপুরুষজীর সামনে মায়ের গান গাহিতেছিলেন।

তিনি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না—কাঁদিতে কাঁদিতে গায়ককে বলিলেন, "যা যা—পালা পালা! হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলে! এ যেন শুকনো দেশলাইর কাঠি হয়ে রয়েছে। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'একটুতেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে'—তাই হয়েছে।" নিজের ভাব চাপিতে না পারায় যেন বিশেষ লজ্জিত হইয়াছেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—নিজে পূজা-মণ্ডপে যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অগত্যা সেবকগণ চেয়ারে বসাইয়া তাঁহাকে পূজামণ্ডপে লইয়া আসিল। মায়ের শিশু করযোড়ে কম্পিতকলেবরে মায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান! সে বিহ্বল তন্ময় ভাব বলিয়া বুঝাইবার নহে। পরে বলিয়াছিলেন, "দেখ্‌লাম সবই মা—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু'।"

রাত্রে কালীকীর্তন হইতেছে। আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছেন। পরে বলিয়াছিলেন, "দেখ, মঠে মায়ের পূজো যেমন হয় তেমনটি আর কোথাও হয় না। এখানকার পূজো ঠিক ঠিক ভক্তির পূজো। আমাদের কোন কামনা নেই। আমরা কেবল মায়ের প্রীতির জন্য পূজো করি। আমাদের একমাত্র প্রার্থনা—'মা, তুমি প্রসন্না হয়ে আমাদের ভক্তি বিশ্বাস দাও, আর সমগ্র জগতের কল্যাণ কর।' কি বল? এত সব শুদ্ধসত্ত্ব সাধু-ব্রহ্মচারী প্রাণপাত করে মায়ের আরাধনা করছে; মা কি প্রসন্ন না হয়ে থাকতে পারেন? তোমরা সর্বত্যাগী মুমুক্ষু, তোমাদের কাতর আহ্বানে মা সাড়া না দিয়ে পারেন? এখানে মায়ের যেমন প্রকাশ তেমনটি আর কোথাও পাবে না, বাবা, ঠিক বলছি। লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারে, কিন্তু এমন ভক্তি-বিশ্বাস পাবে কোথায়? আমাদের হ'ল সাত্ত্বিক পূজো। ··· এখন মা

এসেছেন, মাকে নিয়ে আনন্দ কর। আমাদের, বাবা, বিসর্জন নেই। মা আবার কোথায় যাবেন? মা এখানেই সদা বিরাজমানা। ··· আমরা জানি যে, মা সর্বদাই আমাদের হৃদয়মন্দিরে রয়েছেন।"

তাঁহার শয্যার সামনে ও পার্শ্বের দেওয়ালে শ্রীশ্রীকালী, গণেশ-জননী দুর্গা, চামুণ্ডাদেবী, কন্যাকুমারী প্রভৃতি নানা দেবীমূর্তির পট টাঙ্গানো থাকিত—আর থাকিত বংশবাটীর হংসেশ্বরী-মূর্তি। হংসেশ্বরী মাতাকে লইয়া তাঁহার আত্মহারা উন্মাদনা ভক্তের নিকট বাস্তবিকই উপভোগ্য ছিল। তিনি বলিতেন, "ঐ চতুর্ভুজা শান্তা কালীমূর্তি উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবের প্রতীক। শবাকার শিবের নাভিকমল হইতে উত্থিত সহস্রদল পদ্মের উপর দেবী আসীনা। লিঙ্গ-গুহ্য-নাভিতে যতদিন মন থাকে ততদিন ধর্মরাজ্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা হয় না নাভিচক্রের উপরে মন গেলে তখনই প্রকৃত ধর্মানুভূতির আরম্ভ। শিবের নাভিকমলে হাস্যময়ী মা বসিয়া আছেন ভক্তের মলিন কামনাবাসনা দূর করিয়া শুদ্ধ মাতৃভাবে তাহার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে।" মহাপুরুষজী আদর করিয়া বলিতেন, "গিন্নী ঠাকরুণ—জগতের গিন্নী ছেলেদের দেখছেন।" দেওয়ালে টাঙ্গানো হংসেশ্বরীমাতার বড় ছবি ছাড়া ছোট আকারের অনেকগুলি ফটোও তাঁহার আদেশক্রমে করানো হইয়াছিল। কোনটি তাঁহার টেবিলে থাকিত, কোনটি শয্যায় বালিশের পাশে—মাঝে মাঝে উহা লইয়া মাথায় ঠেকাইতেন বা বুকে করিয়া শুইয়া থাকিতেন, কখনও বা অপলকনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন, রাত্রে মাঝে মাঝে টর্চের আলোতে সেই ছবি দেখিয়া লইতেন। প্রতি অমাবস্যায় নানা পূজোপকরণসহ দুই জন সাধুকে বংশবাটীতে মায়ের পূজা দিতে পাঠাইতেন। যতক্ষণ না তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেন, বার বার

সেবকদের কাছে জিজ্ঞাসা করিতেন, "ওরা এল কি?" অবশেষে তাঁহারা যখন আসিতেন, তিনি আনন্দে মায়ের নির্মাল্য ও সিন্দুরের কৌটা লইয়া খুঁটিনাটি পূজার সব খবর জিজ্ঞাসা করিতেন। মায়ের ছোট ফটোটি মস্তকে স্পর্শ করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেন, "মা, মা জগদীশ্বরি, আমি তো তোমার কাছে যেতে পারছি না,[১] তুমি তো সব দেখছো, সব জান। সব ছেলেদের কল্যাণ কর।'

কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা প্রভৃতি বিভিন্ন দেবীপূজার সময়েও মহাপুরুষজীর আনন্দ ও আগ্রহের সীমা ছিল না। তিনি রটন্তী এবং ফলহারিণী কালিকাপূজাও খুব উৎসাহ প্রদান করিয়া মঠে সম্পন্ন করাইতেন। দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট এবং বরাহনগরে কালীমূর্তির নিকট

১ মহাপুরুষজী অনুমান ১৯১৫ সালে 'হংসেশ্বরী' দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। হরি মহারাজ সঙ্গে ছিলেন এবং মূর্তি দেখিয়া খুব বিহ্বলভাবে মহাপুরুষজীকে বলিয়াছিলেন, "মহাপুরুষ, এ যে মা বসে আছেন।" তাহার পর বহু বৎসর পরে ১৯৩০ সালে হঠাৎ একদিন মহাপুরুষজীর ৺হংসেশ্বরী মাতার উদ্দীপন হইল। তখন হইতে শেষ কয়েক বৎসর উক্ত দেবীর ভাবে তিনি একেবারে মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছিলেন। বাহিরের কেন্দ্র হইতে কোন সাধু আসিলে ৺হংসেশ্বরী দর্শন করিতে পাঠাইতেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ একবার মঠে আসিলে তাঁহাকেও ঐরূপে বংশবাটীতে পাঠাইয়াছিলেন।

২ ১৯৩১ সালে আষাঢ় মাসে হঠাৎ মহাপুরুষজীর আগ্রহ হইয়াছিল—৺জগদ্ধাত্রী মাতার পূজা করিতে হইবে। পটে ঐ পূজা করা হইয়াছিল। ১৯৩২ সালে তাঁহার ৺বাসন্তীপূজা করিবার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল; বলিয়াছিলেন, "আগামী বৎসর বাসন্তী পূজা করবো। তোমাদের বলছি, আমার দেহ না থাকে, তোমরা উহা করবে; ঘটে-পটে নয়—প্রতিমায়; যেমন দুর্গাপূজা হয় তেমনি

মাঝে মাঝে তাঁহার নির্দেশে পূজা প্রেরিত হইত। কন্যাকুমারী-মূর্তির কথাও তিনি খুব আবেগভরে বলিতেন এবং মায়ের ঐ কন্যারূপ স্মরণ করিয়া কুমারী-মাত্রকেই দেবীজ্ঞানে সমাদর দেখাইতেন। তাঁহার ঘরে কুমারীদের জন্য ছোট ছোট নূতন সাড়ী মজুত রাখিতে হইত। কোন কুমারী আসিলে ফল, মিষ্টি, কাপড় ও টাকা দ্বারা ঐ কন্যারূপিণী মহামায়ার পূজা দিতেন। তন্ত্রে আছে, অম্বিকা শিবারূপ ধারণ করিয়া পূজা গ্রহণ করেন। তাই কালীপূজার সময়ে শিবাবলি দিবার বিধি আছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিদিন জগন্মাতার পূজা করা তো সম্ভব নয়! সেইজন্য মহাপুরুষজী এই শিবাবলি দ্বারা মায়ের অর্চনা করিতেন। প্রতিদিন গভীর রাত্রে সেবক-দিগকে লুচি, মিষ্টি বা রন্ধিত আমিষ শিবাদের উদ্দেশ্যে দূরে বিল্ববৃক্ষমূলে রাখিয়া আসিতে হইত। নিস্তব্ধ নিশিতে হঠাৎ শিবাদের ডাক শুনা গেলে মহাপুরুষজী আনন্দে বলিয়া উঠিতেন, "ঐ ঐ ডাকছে, জয় মা—জয় মা।" এইভাবে জগন্মাতার আবাহন দিনের পর দিন তিন-চার বৎসর চলিয়াছিল।

রাত্রে তাঁহার ঘুম বড় একটা হইত না। তিনি 'যোগে যাগে' জাগিয়া থাকিতেন—একবার শুইতেন, আবার বসিতেন, বিছানায় বসিয়া হয়তো সেবকের সহিত 'মায়ের' কথা আরম্ভ করিতেন। জনৈক সেবক ঐ সময়ে শাস্ত্রাদি পড়িতেছিলেন; ঐরূপে একরাত্রে তিনি জিজ্ঞাসিত হইলেন, "তুই কি পড়ছিস্ আজকাল?" "মাণ্ডুক্যকারিকা।" শুনিয়া মহাপুরুষজী বলিয়া উঠিলেন, "দূর শালা, ওতে কি আমার মায়ের নাম আছে?"

একবার জন্মাষ্টমীর দিন জনৈক সাধু শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা তুলিলে

করতে হবে। টাকার জন্য ভেবো না।" মহাপুরুষজীর শরীরত্যাগের পর ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহার উক্ত ইচ্ছা অনুসারে মঠে মহাসমারোহে বাসন্তীপূজা করা হইয়াছিল।

মহাপুরুষজী ভাবস্থ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আজ আমার মায়ের জন্মদিন।" পুরাণে আছে মহামায়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত একই দিনে নন্দের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার কোলে রাখিয়া ঐ কন্যাকে লইয়া আসেন। পরদিন কংস আসিয়া ঐ কন্যাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি অন্তরীক্ষে দেবীমূর্তিধারণান্তে কংসকে সতর্ক করিয়া তিরোহিতা হন। জন্মাষ্টমীর দিন দেবীর এই জন্মবৃত্তান্তই মহাপুরুষজীর বেশী করিয়া মনে পড়িতেছিল।

রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি শক্তি-সাধকগণের গান তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। তিনি সাধু-ভক্তগণকে ঐসব গান গাহিতে উৎসাহ দিতেন এবং বলিতেন, "উহা ভাব-ভক্তির সহায়ক।" 'এবার আমি ভাল ভেবেছি' গানটি একদিন ভাবস্থ হইয়া গাহিয়া পরে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "আহা, রামপ্রসাদের ভাষা কি চমৎকার!" 'কালীনামের গণ্ডী দিয়ে আছিরে দাঁড়ায়ে'—রামপ্রসাদের এই গানটী একটি ব্রহ্মচারীকে অনেক দিন ধরিয়া নিজে গুন গুন করিয়া গাহিয়া শিখাইয়াছিলেন এবং পরে মাঝে মাঝে ব্রহ্মচারীর মুখে উহা শুনিতেন। 'ওমা, তোর কোলে লুকায়ে থাকি' এবং 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে'—এই গীতদ্বয়ও খাটে বসিয়া গুন গুন করিয়া অতি তদ্গতভাবে তাঁহাকে গাহিতে শুনা যাইত। শেষাশেষি 'শমন আসবার পথ ঘুচেছে'—এই গানটিও তিনি খুব গাহিতেন।

মায়ের ন্যায় জ্ঞানগুরু শিবকে লইয়াও তাঁহার বিবিধ প্রেমবিলাস চলিত। প্রতি সোমবারে তাঁহার সম্মুখে 'শিবমহিম্নঃস্তোত্র' পাঠ হইত, তিনি স্থির হইয়া শুনিতেন। 'অসিতগিরিসমং স্যাৎ' পড়া হইবার সময় নিজেকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না, প্রেমাবেশে 'আহা' আহা' করিয়া উঠিতেন। তাঁহার ঘরে বরাবর একটি ছোট শিবমূর্তি থাকিত। নিত্য উহাতে

পুষ্পাঞ্জলি দিতে তাঁহার আদেশ ছিল। 'অব শিব পার করো মেরী নৈয়া'— ভক্ত দেবীসহায়ের এই শিবভজনটি শুনিতে মহাপুরুষজী বড়ই ভালবাসিতেন। ঐ গানটি গীত হইবার সময় তাঁহার সেই আত্মস্থ বিভোর ভাব যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও তাহা ভুলিতে পারিবেন না। তিনি বালীতে ৺কল্যাণেশ্বর শিবের নিকট প্রতি সোমবার কোন সাধুকে দিয়া পূজা পাঠাইতেন, মাঝে মাঝে ৺কাশীবিশ্বনাথের বিভূতি কপালে ও মুখে মাখিয়া বসিয়া থাকিতেন।

একদিন তাঁহার শরীর বড়ই অসুস্থ—উঠিয়া বসিতে পারিতেছেন না। সেবককে বলিলেন, "তুলে বসা তো।" বসাইয়া দিলে তন্ময়ভাবে বার বার বলিতে লাগিলেন, "ওঁ নমঃ শিবায়।" সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে—চারিদিকে বার বার করযোড়ে প্রণাম করেন, আর বলেন, "ওঁ নমঃ শিবায়।" জ্যোৎস্না-রাত্রিতে পায়চারি করিতেছেন—চন্দ্রালোকে গঙ্গার ঢেউগুলির মাথা ঝিকমিক করিতেছে। দেখিয়া মাতিয়া উঠিলেন। হাততালি দিতে দিতে বলিতেছেন, "গঙ্গে, গঙ্গে, জয় মা গঙ্গে।" আবার একদিন ভোর তিনটা হইতে শুরু করিলেন, "নর্মদে, হর হর।" সকালে সাধুরা প্রণাম করিতে আসিলে বলিতেছেন, "খুব 'নর্মদে, হর হর' নাম করবি। ও দেশে নর্মদার মাহাত্ম্যে খুব বিশ্বাস করে। বলে গঙ্গার চেয়েও নাকি বেশী মাহাত্ম্য। আমরা অত বলি না। তবে সমান সমান বলি। আর খুব শুদ্ধ ভাব—শিব-শক্তি এক সাথে।" গভীর রাত্রে সেবক ডাকিয়া বলিতেছেন, "নাসদীয়সূক্ত বের কর—শুনাও।" সেবক জানিত না বইটি কোথায়। বলিলেন, "আমাকে ধরে নিয়ে চল্ টেবিলের কাছে।" তাহাই করা হইল—বই হইতে উহা বাহির করিয়া সেবককে দিলেন। সেবক পড়িয়া শুনাইল। কখনও ভাগবতের একটি বিশেষ শ্লোক মনে পড়িয়াছে। তখনই খুঁজিয়া

শুনাইতে হইবে। কখনও স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিয়াছে ছান্দোগ্য উপনিষদের —'তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত।' "নিয়ে এস ভাষ্য—অর্থ কর।" কখনও শুনিবেন তুলসীদাস[১]—স্বামিজীর 'বীরবাণী'—ব্রহ্মসঙ্গীত।[২] নিস্তব্ধ নিঃশব্দ যামিনীতে মৃদু মৃদু বসন্তপবন বহিতেছে—প্রেমোন্মাদনায় ভৌতিক ঘুম দূরে নিক্ষিপ্ত। শয্যার উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। সেবক নীচে বসিয়া। আদেশ হইল, "মেঘদূতের প্রকৃতির সেই বর্ণনাটা পড়্।" পড়া হইল। তিনি ভাবে বিভোর!

মহাপুরুষজীর দৈনন্দিন জীবনে 'গঙ্গাভক্তি' বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার ছিল। ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতেই তাঁহার শিক্ষা। পূর্বে যখন ঠাকুরঘরে যাইতে পারিতেন, ধ্যানান্তে সকালবেলা নিজের ঘরে ফিরিবার সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করিয়া করযোড়ে ৺মা ভবতারিণী ও দক্ষিণেশ্বরকে প্রণামানন্তর গঙ্গাকে প্রণাম করিতেন। গঙ্গাদর্শন হইলেই গঙ্গামাতাকে সভক্তি নমস্কার করা তাঁহার অভ্যাস ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই 'জয় গঙ্গামায়ীকী জয়' ধ্বনি করিয়া 'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন-

১ মাঝে মাঝে তুলসীদাসের এক-একটী দোঁহা মনে পড়িয়া যাইত আর কয়েক দিন ধরিয়া উহা আবৃত্তি করিতেন—ঐ দোঁহা লইয়া আলোচনা চলিত। একবার "গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সাত সমুদ্দর ভর্‌র। তুলসী চাতককে মতে সোঁয়াৎ বিনে সব ধুর" —এই দোঁহাটি লইয়া খুব আবেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে "তুলসী য্যায়সা ধ্যান করো জ্যায়সা বিয়ানকে গাই"—এই লাইনটিও ভাবের সহিত উচ্চারণ করিতেন এবং উহার উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেরণা সকলকে অনুধাবন করিতে বলিতেন।

২ "জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী"—গানটী সকালে ঠাকুরঘরে তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রায়ই গীত হইত। "সব দুঃখ দূর করিলে"—এই প্রভাতী ব্রহ্মসঙ্গীতটিও তিনি শুনিতে ভালবাসিতেন। "হে নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার"—গানটিও তাঁহার খুব প্রিয় ছিল।

তারিণি তরলতরঙ্গে' ইত্যাদি বা অন্যান্য গঙ্গাস্তব যুক্তকরে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে পাঠ করিতেন। তিনি বলিতেন, "গুরু-গঙ্গার মাঝে আমি বসে আছি।" যখন গঙ্গাজলে স্নান করিতে পারিতেন না, তখনও স্নানের জলে গঙ্গাজল মিশাইয়া ঐ শোধিত জলে স্নান করিতেন আর গঙ্গাজলে আচমন ও গঙ্গাজল-প্রোক্ষণ দ্বারা অন্তর্বহিঃ-শুদ্ধি করিতেন। বলিতেন, "গঙ্গার হাওয়া যতদুর যায় ততদুর পর্যন্ত পবিত্র হইয়া যায়,"···"গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী-সমতুল।" বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্বণের দিনে বা গ্রহণের সময় তাঁহার গঙ্গার প্রতি ভক্তি সমধিক প্রকাশ পাইত। ঘরের বিছানাপত্র আসবাব প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিতেন।

"বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ"—জ্ঞানগুরু শিবের বাসনাতীত অবস্থার অতি সুন্দর সঙ্কেত মহিম্নঃস্তোত্রের এই পংক্তিটিতে পাওয়া যায়। সমস্ত বাসনার অতীত—ইন্দ্রিয়গণের প্রভু—কোন বন্ধনেরই অধীন নন—ইচ্ছামত এটা ওটা লইয়া খেলা করিতেছেন! মহাপুরুষজীও শেষাশেষি যেন ঐরূপ সর্ববন্ধনহীন ক্রীড়াচঞ্চল শিশুটি হইয়া গিয়াছিলেন! ঝোঁক হইল রিষ্ট্ ওয়াচ্ চাই, উহা আসিল—দুই-এক বার পরিলেন, ব্যস্—বাক্সে উঠাইয়া রাখা হইল। মনে পড়িল 'হিতোপদেশে' অনেক সুন্দর সুন্দর নীতিকথা আছে, তখনই কলিকাতা হইতে উহা কিনিয়া আনিতে হইল। বইটি লইয়া বিছানায় বসিয়া বসিয়া পড়িতেছেন—পাশে একটি লাঠি আছে—সামনের ছাদে শালিকদের চাল খাইতে দিয়াছেন, কাক-তস্কর আসিলে তাড়াইবেন। মাঝে মাঝে আদর করিয়া শালিকদের ডাকিতেছেন, "ময়না, আয় আয়।" আবার আর এক পাশে রহিয়াছে একটি ক্ষুদ্র ডমরু—কখনও কখনও বাজাইতেছেন। বিছানার অন্যদিকে আছে 'কথামৃত', গীতা, চণ্ডী, আবার 'ঠাকুরমার ঝুলি', ছবির বই। তাঁহার ঘরটি ছিল যেন একটি ছোটখাট

দোকান। কখন খেয়ালী বালক কি চাহিবে ঠিক নাই! সব মজুদ রাখিতে হইবে। এটা চাই, ওটা চাই—কিন্তু কোনটাতেই আঁট নাই। মনে পড়িল, পাহাড়ে ডাণ্ডী করিয়া যেমন বৃদ্ধ এবং রুগ্নরা যায়, ঐরূপ একটি হইলে তো বেশ হয়! ডাণ্ডী আসিল। একদিন বা দুদিন উহাতে করিয়া সব মন্দির এবং মঠ ঘুরিয়া আসিলেন—ঐ পর্ব মিটিয়া গেল। তাহার পর আসিল একটি সুন্দর রবারের চাকা-দেওয়া ঠেলা-গাড়ী। উহাতে করিয়া কয়েক দিন মঠের সব জায়গায় বেড়াইলেন। গোয়ালে গিয়া কলা-ছাতু-গুড় নিজহাতে গরুদের খাওয়াইলেন। কি স্ফূর্তি!

ছাতে যেমন পাখীদের নিমন্ত্রণ, নীচে উঠানে তেমনি কুকুরদের। পুরাতন কুকুর 'কেলো' তো আছেই—পরে আরও দুটি আসিয়া জুটিল। উহাদিগকে কত আদর, কত স্নেহ, কত আপ্যায়ন! ছেলেবেলার কুকুরপ্রীতি এখন যেন আরও প্রবল আকারে দেখা দিয়াছিল। শিল্পবিদ্যালয়ে একটি সাদা কুকুরের বাচ্চা আনা হইয়াছে—নাম 'পপি'। মহাপুরুষজীকে একদিন দেখাইতে আনা হইল। দেখিয়া খুব খুশী। "আয়, আয় বোস্" বলিয়া বাচ্চাটিকে নিজের বিছানায় বসাইলেন, কোলে করিলেন, আর তাঁহার কি আনন্দ! "শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।" কেলোকে দেখাইয়া স্ফূর্তি করিয়া বলিতেন, "ও বেটা আমার কুকুর, আর আমি হচ্ছি ঠাকুরের কুকুর।" একবার কালীপূজার পরের দিন তাঁহার জন্য সব রকমের প্রসাদ আনা হইয়াছে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া একটু একটু জিহ্বায় ঠেকাইলেন। সেবককে বলিলেন, "দেখ, মহাপ্রসাদের বাটিটা কুকুরদের জন্য রেখে দেবে। ওদের তো আর কেউ দেবে না। আহা, ওরাও আশা করে আছে।"

ইনভ্যালিড্ চেয়ারে করিয়া আফিসঘরে গিয়া বসিয়াছেন। বালকের ন্যায় আনন্দিত। জানালা দিয়া দেখিলেন—গরুগুলি মাঠে ঘাস খাইতেছে।

জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এ বাছুরটা কার ?" দূরে একটি গাছ দেখিয়া—"ওটা কি গাছ ?" মাঠ দিয়া দর্শকগণ যাইতেছে। দেখিয়া বলিতেছেন—"এরা সব কে ? বড়দিনের যাত্রী ? বেশ বেশ" ইত্যাদি। ছোট শিশু যেমন মায়ের সহিত কথা বলিবে বলিয়া কথা বলিয়া যায়, যাহা দেখে তাহাতেই আনন্দ প্রকাশ করে, সেইরূপ।

আবার চকিতে স্বর চড়া 'সা' পর্দায় উঠিয়া যায়, কাহারও উপস্থিতি সহ্য করিতে পারেন না। সেবকদের বলিতেছেন, "যাও, যাও—এখান থেকে চলে যাও, সরে পড়।" একান্তে একাকী থাকিবেন। আপনার ভাবে আবৃত্তি চলিতেছে—"ওঁ তৎ সৎ—সচ্চিদানন্দময়ী—ওঁ তৎ সৎ।" একদিন বলিয়াছিলেন, "মা যেমন খেলনা দিয়ে ছেলেদের ভুলিয়ে রাখেন, আমিও তেমনি মনকে পাঁচ রকমে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করি। মনটা সব সময়ই নির্গুণের দিকে ছুটে যেতে চায়।"

স্বামিজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রেম কত গভীর ছিল তাহার ভূয়োভূয়ো অভিব্যক্তি বিশেষ করিয়া পাওয়া গিয়াছিল এই শেষের কয় বৎসরে। স্বামিজীর ঘরের সম্মুখে বারান্দায় পায়চারি করিতে গেলে তিনি ঐ ঘরের নিকটে আসিয়া স্বামিজীর পটের দিকে তাকাইয়া করযোড়ে বলিতেন, "জয় স্বামিজী মহারাজ, জয় স্বামিজী মহারাজ!" কেহ কোন ফুল বা ধূপ প্রভৃতি উপহার আনিলে সেবককে বলিতেন—"যা, আগে স্বামিজীর ঘরে দিয়ে আয়।" স্বামিজীর জন্মতিথির দিন সকালে তাঁহাকে নিবেদিত চা বিস্কুট প্রভৃতি মহাপুরুষজীর নিকট লইয়া গেলে তিনি অতিশয়ভক্তিভরে একটু একটু গ্রহণ করিতেন, আর মহানন্দে দিতেন সেই জয়ধ্বনি—"জয় স্বামিজী মহারাজ, জয় স্বামিজী মহারাজ।" একদিন সকালে স্বামিজীর ঘরের মধ্যে গিয়া তাঁহার বাবরি-চুলওয়ালা চেয়ারে-

বসা বড় ফটোটি দেখিয়া আবেগের সহিত বলিতে লাগিলেন, "আহা, কি চেহারা! যেন রাজা! ওদেশে বলতো 'Prince of men' (মানুষের মধ্যে যেন রাজা)।" ফটোটির কাচখানি একটু ফাটিয়া গিয়াছিল—উহা বদলাইতে বলিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, "আমি তো এই বুঝেছি—ঠাকুর হচ্ছেন ধর্মসংস্থাপক, স্বামিজী ব্যবস্থাপক; ঠাকুর যেন aphorism (সূত্র), স্বামিজী হলেন commentary (ভাষ্য)।" স্বামিজীর গান, স্বামিজীর পাখোয়াজ-বাজানোর কথা আবেগের সহিত বলিতেন। স্বামিজীর ঘরের সেবককে বার বার বলিতেন, "সাবধান বাবা, স্বয়ং শিবাবতার এখানে থাকতেন; এ ঘরে কত ধ্যান কত সমাধি কত ভাব হয়ে গেছে। খুব যত্ন করে এ ঘর দেখবে।" শেষাশেষি স্বামিজীর 'বীরবাণী' তিনি সর্বদা পড়িতেন। একদিন বলিলেন, "এমন লেখা, এমন কবিতা, এমন গান আর নেই! এ সব স্বামিজীর নিজের হাতের লেখা। কত লোকের লেখা ঠাকুরের কত তো স্তব আছে; কিন্তু স্বামিজীর 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ' —এ স্তবটির মত আর নেই। শংকরাচার্যের styleএ (ভঙ্গীতে) লেখা। 'সখার প্রতি'ও আমার খুব ভাল লাগে।"

রাখাল মহারাজ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের স্মরণ করিয়াও কতই না আবেগ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে দেখা যাইত! বিশেষ করিয়া গুরু-ভ্রাতাদের জন্মদিনে তাঁহাদের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করিত; বলিতেন, "সবাই চলে গেল, আমাকেই শুধু ঠাকুর এখনও রেখেছেন।" একবার রাখাল মহারাজের জন্মদিনে বলিতেছিলেন, "জয় মহারাজ, এই সব ছেলেদের তয়ের করে দাও। মহারাজেরই তো এই মঠ, আমরা তাঁর দাস—এইটি যেন সর্বদা মনে থাকে।"

১৯৩০ সালে শশী মহারাজের জন্মদিনে মঠে অভ্যাগতদের বাস-ঘরে তাঁহার জীবনী-আলোচনা হয়। পরের দিন এই কথা উঠিলে মহাপুরুষজী তদ্গতভাবে শশী মহারাজের প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "আহা, শশী মহারাজের জীবন যারা আলোচনা করবে তাদের মহাকল্যাণ হবে। কি জীবন! বড় খাঁটি, পরিষ্কার, কর্ম্মময় জীবন। অপর সবাই তপস্যায় গিয়েছেন—বেড়িয়েছেন, এঁর তা নয়।" আর একবার শশী মহারাজের জন্মদিনে জনৈক সেবককে বলিলেন, "নিয়ে আয় তো শশী মহারাজের ছবিখানা।" উহা আনা হইলে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। বাবুরাম মহারাজ, লাটু মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতিকেও স্মরণ করিয়া মাঝে মাঝে কত পুরাতন কথা বলিতেন, আনন্দ করিতেন।

স্বামী যোগানন্দ সম্বন্ধে একদিন বলিতেছিলেন, "যোগীন বল্‌ত যে আম খাব তো লেংড়া বোম্বাই খাব। বেশ চমৎকার এক-একটি কথা বলত যোগীন, আর খুব রসিক ছিল। এমন সব কথা বলত যে, হেসে হেসে পেটের নাড়িভূঁড়ি ছিঁড়ে যাবার যোগাড়! আহা, তার কী সুন্দর চোখ ছিল! ঠাকুর বলতেন, 'অর্জ্জুনের চোখের মত।' স্বামিজী বলতেন, 'যেন জগন্নাথের চোখ!' যোগীন খুব ধ্যান করত —চোখ সব সময়েই লাল হয়ে থাকত। ঠাকুর বলতেন, 'যোগীনের খুব উচ্চ আধার— ঈশ্বরকোটী।' খুব কঠোরী—মহাত্যাগী সাধুপুরুষ, আর শুকদেবের মতন পবিত্র। অতিরিক্ত কঠোরতা করেই শরীরটা পাত করেছিল। কাশীতে থাকত সীতারামের ছত্রের সামনে। একখানি রুটি জলে ভিজিয়ে তাই একটু-একটু খেত আর ভজন করত। আহা! মা ঠাকরুণের কী সেবাটাই করেছিল যোগীন! বৃন্দাবনে, ঘুস্থুরিতে,

বাগবাজারে—সব জায়গায়ই। প্রাণ দিয়ে মায়ের সেবা করে ধন্য হয়েছে। যোগীন আকাশের চন্দ্র ও তারা বড় ভালবাসত, বলত, 'আমি এ পৃথিবীর লোক নই—আমি চন্দ্রলোকের। মনে হয় যেন চন্দ্রলোকে তারার মালা পরে বসে আছি।' তাকে সবাই খুব ভালবাসত। যখন খুব বাড়াবাড়ি অসুখ তখন স্বামিজী বলেছিলেন,—'যোগীন, তুই বেঁচে উঠ্, আমি মরে যাই।' নিরঞ্জন বলত, 'যোগীন আমাদের মাথার মণি।' যোগীনের শেষ অসুখের সময় ওর শরীর যাতে থাকে তার জন্য স্বামিজী খুব ভেবেছিলেন। একদিন গঙ্গায় নৌকো করে স্বামিজী এই মঠ তাকে দেখিয়েছিলেন। যোগীন প্রথম থেকেই খুব দৃঢ়ভাবে বলত যে, ঠাকুর অবতার; আর বলত শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত, সাধুসন্ত তো চিরকাল আছে, তবু ভগবান অবতীর্ণ না হলে কি জীবের চৈতন্য হয়? কাশীপুরে ও বরাহনগরে আমরা একসঙ্গেই ছিলাম।" স্বামী যোগানন্দের সম্বন্ধে বলিতে বলিতে মহাপুরুষজী সেই দিন খুব বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। গুরুভ্রাতার প্রতি পুঞ্জীকৃত ভালবাসা যেন মনের দুই কূল উপপ্লাবিত করিয়া নিজের অলক্ষ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। মহাপুরুষজী বলিতেন, "যোগীন স্বামী মায়ের বীর সেবক।"

১৯৩২ সালে স্বামী সুবোধানন্দ (খোকা মহারাজ) দুরন্ত ক্ষয়রোগে গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। মহাপুরুষজীর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। ব্যাকুলভাবে খোঁজখবর লইতেন। বহু চিকিৎসা এবং অক্লান্ত সেবাযত্ন ব্যর্থ হইল। খোকা মহারাজ ১৯৩২ সালের ২রা ডিসেম্বর শ্রীগুরু-পাদপদ্মে মিলিত হইলেন। মহাপুরুষজী শুনিয়া প্রথমটা খুব অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে নিজেকে যেন সামলাইয়া লইলেন। কিন্তু

তাঁহার প্রাণের গভীর ব্যথার পরিচয় পাওয়া গেল পরের দিন সকালে যখন হঠাৎ এলাহাবাদ হইতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। "এস, বিজ্ঞান স্বামী!' বলিয়াই মহাপুরুষজী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

'কথামৃত'কার 'শ্রীম'র দেহত্যাগ-সংবাদ শুনিয়াও মহাপুরুষজী খুব মর্মাহত হইয়াছিলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আহা, মাষ্টার মশায় সারা কলকাতা যেন আলো ক'রে ছিলেন!...এ অভাব আর পূরণ হবে না। তাঁর কাছে ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গই ছিল না। ঠাকুরময় তাঁর জীবন।" মাষ্টার মহাশয় শেষবার যখন মঠে আসেন তখন পরম সমাদরে তাঁহাকে তিনি নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়াইয়াছিলেন—পুরাতন কথা বলিয়া কত আনন্দ করিয়াছিলেন।

সারগাছি হইতে গঙ্গাধর মহারাজ বা এলাহাবাদ হইতে বিজ্ঞান মহারাজ মঠে আসিলে মহাপুরুষজীর আনন্দের অবধি থাকিত না। তাঁহাদিগের প্রিয় বিশেষ মাছ এবং খাবার প্রভৃতি আনাইয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেন। ইঁহাদিগের সহিত তাঁহার হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার অতি মর্মস্পর্শী ছিল। ইঁহারাও মহাপুরুষজীর প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করিতেন[১]!

১ 'শিবানন্দ-বাণী' প্রথম ভাগে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-লিখিত ভূমিকায় মহাপুরুষজীর প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভালবাসা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি একস্থানে উহাতে লিখিয়াছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর, মাতাঠাকুরাণী ও স্বামিজী প্রভৃতি সকলেই যেন তাঁহার ভিতর বসিয়া বহু লোককে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর পৃথক সত্তাই ছিল না। তিনি যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপা পাইয়াছে।"

মঠ এবং সংঘের প্রতি মহাপুরুষজীর হৃদয়ের গভীর অনুরাগের পরিচয় আমরা পূর্বে নানা ক্ষেত্রে পাইয়াছি। তাঁহার জীবনের এই শেষ কয়েক বৎসরেও উহা নানা ভাবে প্রকাশ পাইত। একদিন বলিতেছিলেন, "শুক্ল গঙ্গা দু'দিকে, আর মাঝখানে আমি আনন্দে আছি। এ স্থান তো বৈকুণ্ঠ! স্বয়ং জগন্নাথ এখানে রয়েছেন জগতের কল্যাণের জন্য, আর স্বামিজীর মত সিদ্ধ মহাপুরুষ এখানে ছিলেন। কত ভাব, কত মহাভাব হয়েছে এখানে! আমাদের 'আত্মারাম' ঠাকুর রয়েছেন। আর ঠাকুরের পার্ষদরা সকলেই এস্থানে এখনও রয়েছেন—তাঁদের দেখাও পাওয়া যায়। এস্থানের প্রত্যেক ধূলিকণাও যে কত পবিত্র! ঠাকুর-স্বামিজী এঁরা যে কি ছিলেন তা লোকের বুঝতে ও জানতে এখনও ঢের দেরী। জগতের হিতের জন্য এত বড় আধ্যাত্মিক শক্তি সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্যেও জগতে আবির্ভূত হয় নি।··· এখানে ঠাকুর, মা, স্বামিজী এঁদের সকলের ভস্মাস্থি রয়েছে—এসব ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়! এই বেলুড় মঠের ধূলিতে গড়াগড়ি দেবার জন্য দেশদেশান্তর থেকে কত লোক ছুটে আসবে।" আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ভেবে দেখ দেখি, এ মঠ কী স্থান! স্বয়ং মা জগজ্জননী এখানে এসেছিলেন। শুনেছিলাম যে, এ মঠ-স্থাপনের আগে গঙ্গায় নৌকা করে যাবার সময় মা ঠাকুরকে এ স্থানে দর্শন করেছিলেন। এ মঠ হবার পরেও অবশ্য আমরা পাহাড়ে জঙ্গলে তপস্যা করতে গিয়েছিলাম; কিন্তু আমাদের প্রাণ পড়ে থাকতো মঠে—'আত্মারামের' কাছে।"

ভক্তেরা তাঁহার ব্যক্তিগত সেবার জন্য যাহা দিতেন,[১] তাহার সমস্তই

১ একদিন জনৈক ভক্ত মহাপুরুষজীর সেবার জন্য কিছু টাকা দিয়া প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "টাকা দিয়ে প্রণাম করলে কেন? আমার তো টাকার দরকার নেই—আমরা বাবা সাধু মানুষ; টাকা দিয়ে কি করব? ঠাকুরের কৃপায় আমার কোন অভাব

তিনি অকাতরে মঠের নানা কাজে ব্যয় করিতেন। বলিতেন, "সাধুর টাকা দশের সেবায় যাওয়া উচিত।" একটি পুরাতন ডোবা ভরাট করা একান্ত দরকার। কোথায় টাকা পাওয়া যাইবে? বলিলেন, "আমি এক্ষুণিই দিচ্ছি। যা দরকার নিয়ে যাও।" উৎসবের টিনের চালানির্মাণ এবং মঠের পার্শ্ববর্তী 'সোনার বাগান' (বর্তমান 'লেগেট হাউস')-ক্রয় তাঁহারই উৎসাহ, চেষ্টা ও আংশিক ব্যয়ানুকূল্যে সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি ঠাকুর এবং সাধুদের সেবার জন্য তরিতরকারী-মাছ প্রভৃতি প্রায়ই কিনিতে পাঠাইতেন। কোন সাধুর কাপড়-জামা ছিন্ন দেখিলে তৎক্ষণাৎ উহা তৈরী করাইবার ব্যবস্থা করিতেন।

তাঁহার নেতৃত্বকালে সংঘের আধ্যাত্মিক ভাবধারা যেমন প্রভূত পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তেমনি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যুগাবতারের বাণী দেশ-দেশান্তরে ব্যাপকভাবে। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "সংঘের জন্যই এখনও ঠাকুর রেখেছেন (আমাকে)—সংঘকে পাকা করে দেবার জন্যে। পাকা আছেই, তবে আরও দৃঢ় করে দেবার জন্যে। এই সংঘ স্বামিজী করে গেছেন। যে এর

নেই। আমি প্রভুর দাস, তিনি দয়া করে 'দো রোটী' দিয়েছেন।... তোমরা গৃহস্থ, তোমাদেরই টাকার দরকার।" ভক্তটি কাতরভাবে বিশেষ পীড়াপীড়ি করাতে ঐ টাকা ঠাকুরসেবায় দিতে আদেশ করিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে দান প্রত্যাখ্যান করিতেও দেখা গিয়াছে। আর "ঠাকুরই গুরু, তিনিই তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া ভক্তগণকে কৃপা করেন"—এই অনুভূতি তাঁহার এত পাকা ছিল যে 'গুরুদক্ষিণা' হিসাবে ভক্তেরা যাহা দিত—তা একটি হরীতকীই হউক আর সহস্র সহস্র মুদ্রাই হউক—সমস্তই তিনি ঠাকুরের সেবায় দিতেন।

বিরুদ্ধে যাবে—সে যেই হোক—তার মাথায় (নিজের মাথায় হাত দিয়া দেখাইয়া) মুগুর পড়বে।"

আর একদিন বলিয়াছিলেন, "একদিন আমরা উঠানে আম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছি, স্বামিজীর শরীর যাবার তুই-তিন সপ্তাহ পূর্বে। তিনি ঠাকুর-ঘর থেকে এসে হঠাৎ একটা prophetic vision (অলৌকিক দর্শন) দেখে বললেন, 'দেখ, এই যে স্রোত এসেছে তা সাত-আটশো বছর চলবে।' আমরা কিছু কিছু দেখছি, তোমরা অনেক দেখতে পাবে। আমাদের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস কর। ঠাকুর, মা-জগদম্বা, এঁরাই সব চালাচ্ছেন।" বৃদ্ধ অথর্ব দেহেও সংঘের প্রতি একটি গুরু দায়িত্ববোধ তাঁহার চিত্তকে সর্বদাই যেন অধিকার করিয়া থাকিত। কোথাও কোন তুর্বলতা, কোন ত্রুটি, কোন ভবিষ্যৎ অনিষ্টের বীজ দেখিলে তিনি সচকিত হইয়া উঠিতেন—সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রযত্নে সকলকে সাবধান করিয়া দিতেন। ১৯৩১ সালের একটি ঘটনা—একদিন জনৈকা অপরিচিতা স্ত্রী ভক্ত ঠাকুরের জন্য অনেকগুলি মূল্যবান রূপার বাসন লইয়া মহাপুরুষজীর নিকট আসেন। মহাপুরুষজী প্রথমে ঐ সকল জিনিষ ঠাকুরের সেবার জন্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমাদের ঠাকুর টাকাকড়ি এমন কি কোন ধাতুদ্রব্যই ছুঁতে পারতেন না—তাঁর এ-সব জিনিষের কিছু দরকার নেই ; আর আমরাও সাধু-সন্ন্যাসী—এসব ঐশ্বর্য দিয়ে আমাদের কি হবে ?" কিন্তু স্ত্রী-ভক্তটি অশ্রুপূর্ণলোচনে ঐ সকল জিনিস রাখিবার জন্য নানাভাবে খুব কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। অগত্যা মহাপুরুষজী দ্রব্যগুলি রাখিলেন। সমবেত সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ ঠাকুরের জন্য আনীত ঐ সকল রূপার জিনিস দেখিয়া অত্যন্ত খুশী ; কিন্তু মহাপুরুষজীর মনের উপর প্রতিক্রিয়া হইল অন্যরূপ। তিনি বলিলেন, "তা নিয়ে যাও—ঠাকুরের পূজায় ব্যবহার

করো। আমার কিন্তু ভেতর থেকে এ সব রাখতে আদৌ ইচ্ছা হচ্ছে না। কি করব ভক্তটি খুব কান্নাকাটি করতে লাগল—তাই রাখতে হল। আমাদের ঠাকুর হলেন ত্যাগীর বাদশা, তাঁর একমাত্র ঐশ্বর্য ছিল ত্যাগ। এ সব সোনা-রূপা-হীরা-জহরৎ তাঁর ঐশ্বর্য নয়। আবার এ সব যত জুটবে, ততই হাঙ্গামা— চোর-ডাকাতেরও ভয় আছে। এই করেই তো বড় বড় মন্দিরে কোটি কোটি টাকার ধন-রত্ন জমা হয়েছে। ঠাকুরের ভাব আলাদা—আমাদের মঠও কি ঐ রকম গড্ডলিকাপ্রবাহে মত্ত হয়ে যাবে? এ সব যত জুটবে, ততই আসল জিনিস—ত্যাগ-বৈরাগ্য ভজন-সাধন কমে যায়। তখন ঐ বিষয়সম্পত্তি সামলাতেই ব্যস্ত—দারোয়ান রাখ রে, পাহারাওয়ালা রাখ রে! ও সব কি কম ঝামেলা?" মহাপুরুষজীর মন সেদিন খুব ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার আশঙ্কা কিছুদিন পরে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। ঠাকুরের ঘরে রাত্রে চোর ঢুকিয়া ঐ সমুদয় রূপার বাসনপত্র তো লইয়া গিয়াছিলই আবার সেই সঙ্গে মঠে নিত্যপূজিত ঠাকুরের ইষ্টকবচটিও চুরি করিয়াছিল।[১] তখন মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, "আমি তো আগেই বলেছিলাম—এসব ঠাকুরের সইবে না। এখন বানের জল এসে সাঁকোর জল সমেত বেরিয়ে গেল—ঠাকুরের ইষ্ট-কবচটিও চুরি হয়ে গেল!"

জ্ঞান-ভক্তির সহায়ক সাধন হিসাবে মহাপুরুষজী তান্ত্রিক পূজাদির প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করিতেন; কিন্তু পাছে ভবিষ্যতে উহা কোন বিকৃত রূপ লইয়া সন্ন্যাসিসংঘকে মলিন করে, এই আশঙ্কায় মহাপুরুষজী তান্ত্রিক

১ ১৯৩১ সালের ১২ মার্চ বেলুড় মঠে ঠাকুরের রূপার বাসন প্রভৃতি চুরি হইয়াছিল।

ক্রিয়াদির বিপদ সম্বন্ধে বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেন, "দেখ, তোমাদের সকলকে বলছি, আমাদের ঠাকুরের অতি শুদ্ধ ভাব—পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা। এই আদর্শ হতে কখনো যেন স্খলন না হয়।"

স্ত্রী-ভক্তদিগের সহিত মেলামেশা সম্বন্ধেও তিনি সাধুদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন, "ঠাকুর করুন, তোমাদের যেন কখনো দেহবুদ্ধি না আসে। কুদৃষ্টিতে মেয়েদের দেখা—তা এখানে নেই।"

সংঘের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে কাহাকেও কঠোর শাসন করিতে মহাপুরুষজী পশ্চাৎপদ হইতেন না। একদিন বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী বলতেন, 'আমার ভিতর যদি কোন দোষ দেখতে পাস্, তক্ষুণি আমাকে ত্যাগ করবি।' ঠাকুরের কাজ কারুর জন্য আটকাবে না। তিনি কুটোর ভেতর দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিতে পারেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাসংঘের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি মহাপুরুষজীর মর্মবাণী যেন এই কথা কয়টির মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে: "তোমরা যদি আমার কথা শোন তো এই রামকৃষ্ণরূপ জ্ঞানাগ্নি জ্বেলে মনে মনে ঠাকুরকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ কর। প্রাণের কথা বলছি—জীবনের আসল উদ্দেশ্যটি হারিয়োনা। গড্ডলিকা-প্রবাহে জীবন কাটালে চলবে না।"

শেষের কয়েক বৎসর মহাপুরুষ মহারাজ যেন আশীর্বাদময় হইয়া গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার আবছায়া-অন্ধকারে বারান্দায় বসিয়া আছেন—তদ্গতভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন, "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং···।" একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী আসিয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষজী বলিলেন, "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং—সব ব্রহ্ম।" সন্ন্যাসী প্রার্থনা করিলেন, "মহারাজ, আশীর্বাদ করুন আমরাও যেন তা বুঝতে পারি।" মহাপুরুষ

মহারাজ তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয় নিশ্চয়—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি তোমাদেরও ভিতর এই 'ব্রহ্মজ্ঞান' আসুক।" একটি ভক্ত আশীর্বাদ চাহিতেছেন। বলিয়া উঠিলেন, "আশীর্বাদ ? আশীর্বাদ ছাড়া আমাদের আর কি আছে ?"

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে স্বামী অ— স্যান ফ্রান্সিস্‌কো কেন্দ্রের কর্মভার লইয়া আমেরিকা যাত্রা করিবেন—বিদায় লইতে আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী বলিলেন, "দাও রাম বলে লাফ। কিছু ভয় নেই। তুমি যে খুব ভাল কাজ করবে তাতে আমার কোন doubt (সন্দেহ) নেই। এখন মা শরীরটি ভাল রাখলে হয়। ঠাকুর তাঁর কাজ করিয়ে নেন। দেখ না এই ভাঙ্গা শরীর দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আর বিদ্যা, এখানে (নিজের দিকে দেখাইয়া) ঢোঁ ঢোঁ — কিছু নেই (হাস্য)। এক জানি ঠাকুর আছেন। সব করিয়ে নেবেন—ব্যস্, আর কিছু জানি নে, আর কিছু জানতেও চাই নে।" পূর্বের দিন উক্ত স্বামীর জন্য লোক পাঠাইয়া দূর হইতে মাগুর মাছ আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। উহা খাওয়াইলেন—আর কত স্ফূর্তি।

ইহার চার মাস পরে স্বামী নি— নিউইয়র্ক কেন্দ্রের কর্মিরূপে আমেরিকা যাইবেন। মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষজী উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন, "যেখানে যাবে সেখানেই আমরা আছি। ঠাকুর আছেন, মা আছেন, স্বামিজী আছেন। জয় গুরু মহারাজকী জয় (করজোড়ে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছেন)। যাও, কিছু ভয় নেই (পিঠ চাপড়াইলেন)। যাও, বাবা, যাও।" কী স্নেহ ও করুণাপূর্ণ দৃষ্টি! শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ-ভস্মাস্থির সামান্য অংশ উক্ত সন্ন্যাসীর সহিত আমেরিকা পাঠান হইতেছে। সেই প্রসঙ্গে মহাপুরুজী বলিলেন, "আত্মারাম সর্বত্র

ছড়িয়ে পড়েছেন, বাবা। সেই বৌদ্ধযুগে হয়েছিল। ঠাকুর এসেছেন—আবার তাই হচ্ছে। জয় গুরু মহারাজ, জয় গুরু মহারাজ।"

১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে স্বামী বি— দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচার কার্যে যাইবার প্রাক্‌কালে মহাপুরুষজীর কাছে সজলনয়নে বিদায় লইতে আসিলে মহাপুরুষজী খুব আশ্বাস এবং সাহস দিয়া অনেকক্ষণ তাঁহার মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহারও চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। বলিলেন, "জয় শ্রীগুরু মহারাজজীকী জয়—কোন ভাবনা নেই। যেখানেই যাও না কেন—ঝোপে-জঙ্গলে, অনলে-অনিলে-পর্বতে, যেখানেই হোক না কেন—ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে আছেন।" উক্ত স্বামী পরে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে মহাপুরুষজীকে লিখিয়াছিলেন, "এত দূরে থাকিয়াও আমার সকল কার্যের প্রেরণার মূলে যে আপনার স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ রহিয়াছে তাহা আমি এতদিন ভাল করিয়া বুঝি নাই। আজ মর্মে মর্মে বুঝিতেছি। আগে বুদ্ধি দিয়া যাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি।"

সে সকল সন্ন্যাসী[১] বিদেশে প্রচারকার্যের জন্য ছিলেন তাঁহাদের খবরাখবরের জন্য মহাপুরুষজী সর্বদা উন্মুখ থাকিতেন। তাঁহারাও মহাপুরুষজীর অমোঘ আশীর্বাদ ও স্নেহ বহুদূরে থাকিয়াও হৃদয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করিতেন এবং চিঠিতে উহা ব্যক্ত করিতেন। যেদিন বিদেশের ডাক আসিত মহাপুরুষজী সাগ্রহে বলিতেন, "দেখ্ তো অমুকের চিঠি এল কিনা,"…"ও, এটা বুঝি অমুখের চিঠি—দেখ্ দেখ্ কিলিখেছে" ইত্যাদি। একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন বিদেশের কোন

১। মহাপুরুষজীর সঙ্ঘনেতৃত্বকালে প্রচারকার্যের জন্য দশ জন সন্ন্যাসী আমেরিকা যুক্তরাজ্যে, একজন দক্ষিণ আমেরিকায় এবং একজন জার্মানীতে প্রেরিত হইয়াছিল।

চিঠি আসে নাই, সেবককে বলিলেন, “Why can't you create letters ?” (তুমি চিঠি সৃষ্টি করতে পার না কেন ?)।

* * *

ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “ন[illegible]ক্ষা দেবে।” নরেন্দ্র শুনিয়া আপত্তি জানাইয়াছিলেন, “আমি পারবো না।” ঠাকুর হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “তোর হাড় পারবে।” তাঁহার বাণী সত্য হইয়াছিল। শুধু নরেন্দ্রকে নয়—নরেন্দ্রের সঙ্গে অপরদেরও ঘাড়ে ধরিয়া ঠাকুর ‘মায়ের’ কাজ করাইয়াছিলেন। তারকনাথও নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহাকে বরং অন্যান্যের তুলনায় অনেক দীর্ঘ দিন পৃথিবীতে থাকিয়া ঠাকুরের আদেশ পালন করিতে হইয়াছিল। উদ্বেল বৈরাগ্য, তদ্গত ঈশ্বরমুখিতা এবং নিঃসঙ্গ তপস্যা—এইগুলিই তাঁহার জীবনের প্রথম আটষট্টি বৎসরের মুখ্য কথা। শেষ বারো বৎসরে বিশাল রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসিসংঘ এবং ভক্তগোষ্ঠীর সর্বনায়করূপে তাঁহার মধ্যে যে জীবন্ত বহুমুখী আধ্যাত্মিক ভাব, কর্মশক্তি, আনন্দ ও করুণা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহা সত্যই নিরুপম। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের এই দুইটি বিভাগই ভাস্বর সৌন্দর্যে ভরপুর। দুইটি সম্মিলিত হইয়া অপূর্ব মাধুরীমণ্ডিত এক দিব্য চরিত্রের আবির্ভাব আমরা দেখিতে পাই—চন্দন-সৌরভের ন্যায় যাহা দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিয়া রাখিয়াছিল।

সাধারণভাবে আমরা যাহাকে ঘটনাবৈচিত্র্য বলি ভাগবত জনের জীবনে উহা একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান নয়। অখিল জগৎবৈচিত্র্য যে সমরস গূঢ় সত্যে বিধৃত সেই সত্যের সন্ধান, অনুশীলন এবং ভূয়িষ্ঠ অনুভূতিতে তাঁহাদের সমগ্র মনঃপ্রাণ সর্বদা মাতিয়া থাকে—বহির্দৃষ্টিতে তাঁহাদের জীবন বৈচিত্র্যসম্ভারহীন হইলেও অন্তর্লোকের অতুল সমৃদ্ধিতে

পরিপূর্ণ। মহাপুরুষ মহারাজের জীবনকেও তাই যেন আমরা ঘটনার পরিব্যাপ্তি দিয়া বিচার করিতে না যাই। তিনি নিজেই তো একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "আমার জীবনে এমন কোন ঘটনা নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে —তাহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণদর্শন ও তাঁহার কৃপা।····· যিনি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন—এইমাত্র ঘটনা এই জীবনে।"

এই 'একটিমাত্র ঘটনা' দ্বারাই কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণসংঘে এক গৌরবময় স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে-সকল সৌভাগ্যবান সেই যুগটির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে উহার স্মৃতি চিরদেদীপ্যমান থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্মসংঘের গুরুপারম্পর্যে সেই যুগটিকে একটি সন্ধিযুগ বলাও বোধ করি অন্যায় নয়। প্রাচীন—অল্প-পরিধিযুক্ত কিন্তু অগাধস্পর্শ বিদায় লইতেছে, পরবর্তী—বৃহৎ কিন্তু অগভীর বিস্তার লাভ করিতেছে। মহাপুরুষজী যেন প্রাচীনকে তাঁহার ভিতর বহুভাবে দেখিবার শেষ সুযোগ দিয়া গেলেন, আর আগামীকেও ভগবদ্-বিধানে অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সানন্দে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন।

শেষ

বিদায়ের পূরবী করুণ সুরে বাজিতেছিল। শুনিয়া শুনিয়া তাঁহারও প্রাণ উতলা হইয়া উঠিতেছিল। একদিন বলিলেন, "ওঃ, আজকাল রাতগুলো যে কি আনন্দে কাটছে! মহারাজ, হরি মহারাজ এঁদের সব vision (দর্শন) দেখছি। সন্ধ্যার পরই মন আনন্দে ভরে উঠতে থাকে।" আর একদিন বলিলেন, "(রাত্রে) খুব গভীর ধ্যান হয়েছিল। এই সব রাজ্য ছেড়ে, দেহজ্ঞান ছেড়ে মন চলে গিয়েছিল অতি ঊর্ধ্বে; স্বামিজীকে দেখলাম। একটি জ্যোতির্ময় string-এর (সুতো) মতন আছে—সেটিকে ছেড়ে দিয়ে স্বামিজী নীচে এসেছিলেন, তাই জন্ম বলে। মহারাজকেও দেখেছি—তিনিও রয়েছেন। বেশ আনন্দে ছিলাম।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরের আরাত্রিকের কিয়ৎক্ষণ পূর্বে মহাপুরুষজী ঠাকুরের দিকে মুখ করিয়া চুপচাপ বসিয়া আছেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দে দে, আমায় বিশ্বনাথের বিভূতি দে। আর বিছানার উপর একখানি গরদের চাদর তাড়াতাড়ি পেতে দে। আহা! এই যে ঠাকুর এসেছেন, মহাদেব এসেছেন।" বলিতে বলিতে ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ ঐ ভাবে ছিলেন।

আর একদিন বৈকালবেলা বলিয়াছিলেন, "এইমাত্র স্বামিজী ও মহারাজ এসেছিলেন আর বললেন, 'চল, তারকদা'। তোরা দেখতে পেলি নি? এই যে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।"

১৯৩৩ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসবের পূর্বদিন ডাণ্ডী করিয়া

মহাপুরুষজী উৎসবের আয়োজন দেখিতে গিয়াছিলেন। কিছুদিন আগে মঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উৎসবের রন্ধন ও ভাঁড়ারের জন্য অনেকগুলি গৃহযুক্ত সুবৃহৎ টিনের চালা নির্মাণ শেষ হইয়াছিল। এই বারই প্রথম ওখানে উৎসবের কাজ হইতেছে। লুচি ও বোঁদে ভাজা হইতেছে, তরকারী কাটা চলিতেছে; চালার পশ্চিম দিককার বিস্তৃত জমিতে যেখানে খাবার জায়গার ব্যবস্থা হয় সেখানে শামিয়ানা খাটাইতেছে, সর্বত্রই কর্মচাঞ্চল্য ও জয়ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত। মহাপুরুষজী সব দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন।

ইহার পরে ২৪শে এপ্রিল সকালে আবার তাঁহার খুব ইচ্ছা হইল নীচে নামিয়া সব জায়গায় ঘুরিবেন। ডাণ্ডীতে করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলা হইল। মঠের বহু সাধু ও উপস্থিত ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। সমস্ত মন্দিরে প্রণাম করিলেন। স্বামিজীর মন্দির-সংলগ্ন বেলতলা পর্যন্ত গেলেন—গোয়াল, প্রাঙ্গণ, বাগান, ভাঁড়ার প্রভৃতি সব পরিদর্শন করিলেন। যাহা দেখেন তাহাতেই আনন্দ। এটা ওটা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—সকলের সহিত হাসিয়া আলাপ করিতেছেন। ৺গঙ্গামায়ীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। স্বামিজীর হাতে গড়া মঠ—নিজেদের প্রত্যেকের জীবনের বিন্দু বিন্দু শোণিত দ্বারা যাহার অঙ্গ বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে সেই 'আত্মারামের' জাগ্রত লীলা-নিকেতন, বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ মঠের সব কিছুর সঙ্গে এই তাঁহার শেষ দেখাশুনা।

২৫শে এপ্রিল সকালে তিনটি ভক্তকে দীক্ষা দিলেন। অন্য দিনের তুলনায় সেদিন যেন মহাপুরুষজীর শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ হইতেছিল। সকাল এগারটার পরে মধ্যাহ্ন-আহারে বসিয়াছেন। সামান্য ঝোলভাত আহার। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে। আহারান্তে একটু

ঘোল খাইতেন—পেয়ালা হাতে করিয়া উহাই পান করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ দক্ষিণ অঙ্গ অবশ হইয়া গেল। হাত কাঁপিতে লাগিল—পেয়ালা থালায় রাখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাক্-শক্তি বন্ধ হইয়া গেল। সেবকের দিকে তাকাইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না। মৃদু হাসিয়া উৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তখনও বসিয়া আছেন। সঙ্গে সঙ্গে জনৈক সন্ন্যাসী ডাক্তার আসিয়া নাড়ী-পরীক্ষান্তে অবিলম্বে শোয়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কলিকাতা হইতে ডাক্তারগণ আসিয়া পৌঁছিলেন। সকলেই সন্ন্যাস-রোগ বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন।[১] বৈকাল নাগাদ মঠ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। চতুর্দিকে তার পাঠান হইল—কয়েক দিনের মধ্যেই বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মঠে সমবেত হইলেন। খবর পাইয়া বহু দূর দূর স্থান হইতে অনেক ভক্তও আসিলেন। বাহ্যতঃ মহাপুরুষ মহারাজ অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং আরও কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ডাক্তার সরকার একদিন মন্তব্য করিয়াছিলেন, "বলুন দেখি, এঁর মত মহাপুরুষ চলে গেলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে?" বাংলার সুসন্তান স্বনামধন্য এই উদার চিকিৎসক নিজের বহু কাজের ক্ষতি করিয়া কলিকাতা হইতে একাদিক্রমে প্রায় বিশ দিন প্রত্যহ সন্ধ্যায় মহাপুরুষজীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

এদিকে মহাপুরুষজীর আরোগ্যকামনায় নানা প্রকার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া—বিভিন্ন দেবালয়ে বিশেষ পূজা হোম পাঠ প্রভৃতিও হইতেছিল।

---

১ ১৯৩২ সালের শেষভাগে একবার মহাপুরুষজীর রক্তের চাপ খুব বাড়িয়াছিল এবং তাহার ফলে কয়েক দিন ধরিয়া নাক দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব হইয়াছিল।

প্রায় একমাস ব্যাপী চিকিৎসকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রাণপাতী সেবা যত্ন ও ঐকান্তিক ব্যাকুল প্রার্থনার ফলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা গেল। ডাক্তার সরকার অবস্থা নিরাপদ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ক্রমে বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিলেও তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ সমানই অবশ রহিল—বাক্‌শক্তিও ফিরিল না। ধীরে ধীরে বাম অঙ্গ কতকটা সবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তিনি বাম হাত একটু তুলিতে এবং বাম পাও সামান্য নাড়াচাড়া করিতে পারিতেন এবং অস্ফুট ধ্বনি করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন।

এই সময়ে সারগাছি আশ্রম হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহাপুরুষজীকে দেখিবার জন্য বেলুড় মঠে আসিলেন। সকালবেলা—তখন মহাপুরুষজীর মুখ ধোয়ান হইতেছিল—গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া 'দাদা দাদা' বলিয়া সম্মুখে আসিলেন। গঙ্গাধর মহারাজকে দেখিয়াই তিনি প্রথমে কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন। ওঁ—আঁ—প্রভৃতি সামান্য অস্ফুট ধ্বনি মাত্র বাহির হইল; কথা বলিতে না পারায় তিনি ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘন্টা কাটিয়া গেল—কান্না কিছুতেই আর থামে না। সকলেই শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। গঙ্গাধর মহারাজ তখন তাঁহার পাশে বিছানার উপর বসিয়া পুরুষসূক্ত দেবীসূক্ত প্রভৃতি আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ উপনিষদের বিভিন্ন স্থান হইতে আবৃত্তি এবং ঠাকুর-স্বামিজীর প্রসঙ্গ প্রভৃতি করিবার পরে মহাপুরুষজী কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ মঠে কিছুদিন ছিলেন এবং প্রতিদিনই মহাপুরুষজীর কাছে বসিয়া উপনিষদ্, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি আবৃত্তি করিতেন এবং পুরাতন প্রসঙ্গাদি করিয়া তাঁহাকে নানাভাবে আনন্দ দিতেন।

ইহার দুই-তিন মাস পর হইতে পূর্বের অভ্যাস মত সকল ব্যাপারই করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন—ইঙ্গিতে। শেষরাত্রে তিনটার সময় সব জানালা দরজা খুলিয়া দিতে হইত; তিনি ঠাকুরঘর দর্শন এবং ঠাকুর প্রণাম করিতেন। ঘরে ধূপ-ধূনা জ্বালা হইলে ঠাকুরের ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। ঠাকুরঘর খোলা ও মঙ্গলারতি হইল কি না এবং ঠাকুরঘরে কি কি ভজন-গান হইতেছে—সব শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন; সকল খবরই বিস্তারিতভাবে বলিতে হইত। চারিদিক একটু পরিষ্কার হইলে ছাদে পায়রা ও শালিকদের পূর্বের মত খাবার দেওয়াইতেন—কুকুরদেরও খাবার দেওয়া হইত।

সকালে যথারীতি মঠের সাধুগণ তাঁহার ঘরে সমবেত হইলে তিনি স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাস্যে বাম হাতখানি তুলিয়া ইঙ্গিত ও অস্ফুট ধ্বনিতে সকলের কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা ও আশীর্বাদ করিতেন। তাঁহার প্রশান্ত মুখশ্রী দেখিয়া মনে হইত তিনি পরমানন্দে রহিয়াছেন—শুধু ভাষার অভিব্যক্তি নাই।

দুরন্ত পক্ষাঘাতের ফলে বাক্‌শক্তি নষ্ট হইলেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি যে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা এক দিনের ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছিল। ঐ সময়ে আফগানিস্থানে গৃহযুদ্ধের একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। মহাপুরুষজীর সেক্রেটারী সেই কাগজখানি হাতে করিয়া ঐ ঘটনাটি তাঁহাকে বলিলেন। তিনি খুব অভিনিবেশ সহকারে উহা শুনিয়া বাম হাত নাড়িয়া হাসিমুখে এমন অস্ফুট ধ্বনি করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে স্পষ্ট যেন শুনা যাইতেছিল তিনি বলিতেছেন, "বেশ হয়েছে"। ঐ ঘটনায় সকলেই বিশেষ আশ্চর্য হইলেন। পক্ষাঘাত-আক্রমণের পর তাঁহার মস্তিষ্ক যে এতটা পরিষ্কার এবং পূর্বস্মৃতি

এতটা অব্যাহত ছিল তাহা কাহারও ধারণা ছিল না। ঐ ঘটনায় সকলেই বুঝিলেন যে মহাপুরুষজীর মানসিক শক্তির বিন্দুমাত্র হানি হয় নাই। সেই সময় হইতে তাঁহার নিকট নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রের বিশেষ বিশেষ খবরাদি বলা হইত। মঠ-মিশনের কাজকর্ম সম্বন্ধেও তাঁহাকে জানান হইলে তিনি মনোযোগ সহকারে সব শুনিতেন এবং আকারে-ইঙ্গিতে মতামত প্রকাশ করিতেন।

অবশদেহে বাক্‌শক্তিহীন অবস্থায় ঐ ভাবে শয়ান থাকিলেও মহাপুরুষজীর চক্ষু দুটিতে এমন একটা করুণা ও কৃপার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। বহু সাধু ও ভক্তের মুখে শোনা গিয়াছে যে, তিনি তাঁহার মৌন প্রশান্ত দৃষ্টিদ্বারা তাঁহাদের নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ মিটাইয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হইত; পূর্বের মত মহাপুরুষজী চোখ বুঁজিয়া ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন, বাম হাত তুলিয়া উৎসাহ ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেন।

কথা বলিতে না পারিলেও তিনি যে স্থূল দেহে আছেন ইহাতেই সকলের মনপ্রাণ পরিপূর্ণ থাকিত। তাঁহার দর্শনই মনে এতটা আনন্দের স্পন্দন আনিয়া দিত যে, তাঁহার কথা শুনিতে না পাইবার অভাব কেহ ততটা বোধ করিতেন না।

মহাপুরুষজী সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইবার প্রায় চারি-পাঁচ মাস পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী একদিন এলাহাবাদ হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতে মঠে আসেন। পূর্বে কোনও খবর দেন নাই—মহাপুরুষজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রবল প্রেরণাতেই হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছিলেন। তিন দিন মঠে থাকিয়া এলাহাবাদে ফিরিবার দিন মহাপুরুষজীকে প্রণাম

করিয়া বিদায় লইতে গেলে, মহাপুরুষজী বাম হস্তখানি তাঁহার মাথায় কিছুক্ষণ রাখিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞান মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, "যে দিন মহাপুরুষ মহারাজ আমার মাথায় হাত দিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই মনের ভাব একেবারে বদলে গেল। তাঁর ভাবটা যেন আমার ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, যে পর্যন্ত আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকবে সে পর্যন্ত যে আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাব।"[১]

গদাধর আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ একদিন বৈকাল বেলা পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণকে মঠ দর্শন করাইবার জন্য আনিয়াছিলেন। ঠাকুর-ঘর ও স্বামিজীর ঘর দেখাইবার পর কথায় কথায় তাঁহাকে মহাপুরুষজীর কথা বলা হয়। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে দর্শন করিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে তাঁহাকে মহাপুরুষজীর নিকট আনিয়া পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। মহাপুরুষজী একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন আর তর্কভূষণ মহাশয় করযোড়ে দণ্ডায়মান—এই ভাবে প্রায় পনর মিনিট কাটিয়া গেল ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। পণ্ডিত মহাশয়ের দুই নয়নে ধারা বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে—তিনি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সতৃষ্ণ নয়নে মহাপুরুষজীকে দর্শন করিতেছেন। মহাপুরুষজীর সপ্রেম দৃষ্টিতেও প্রসন্ন শুভেচ্ছা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে আসিয়া তর্কভূষণ মহাশয় খুব আবেগভরে বলিয়াছিলেন,—"শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থা পড়েছি মাত্র, আজ তা প্রত্যক্ষ করলাম। উনি তো সমাধিস্থ হয়ে আছেন! কখনও সামান্য বাহ্যদশা প্রাপ্ত হন মাত্র। এ যোগিবরকে দর্শন করে

১ ঐ ঘটনার পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মন্ত্র-দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, পূর্বে তিনি কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না।

আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। অনেক শাস্ত্র পড়েছি, সমাধি সম্বন্ধেও অনেক পড়েছি, আলোচনাদিও করেছি ; কিন্তু জীবনে সমাধিবান পুরুষ দর্শন করবার সৌভাগ্য হয় নি—আজ আমার জীবন সার্থক।”

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় তাঁহার সম্মতিক্রমে সেই বৎসরও প্রতিমায় শারদীয়া পূজার আয়োজন হইল। সেবারেও আগমনী গানে তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত, মুখে চোখে সেই অব্যক্ত আনন্দের অভিব্যক্তি। কি গান হইতেছে তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইত—হাত নাড়িয়া অস্ফুট ধ্বনি করিয়া আনন্দ করিতেন। একদিন গায়ক ব্রহ্মচারী প্রণাম করিতে আসিয়া বলিল, “মহারাজ, এই গানটি (আগমনী) আজ গেয়েছিলাম।” মহাপুরুষ মহারাজ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ভাব সম্বরণ করিতে অনেকক্ষণ লাগিয়াছিল।

অষ্টমী পূজার দিন সকাল হইতেই মহাপুরুষজী ভাবে ও ইঙ্গিতে নীচে পূজামণ্ডপে যাইবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার শরীরের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে তাঁহাকে নীচে নামাইবার কথা কেহ ভাবিতেই পারেন নাই ; চিকিৎসকগণ তো নয়ই। যাহা হউক মহাপুরুষজীর ঐরূপ ব্যাকুলতা ও অস্বস্তিভাব দেখিয়া তাঁহাকে অবশেষে অতি সাবধানে ইজি চেয়ারে করিয়া পূজামণ্ডপে লইয়া যাওয়া হইল। ইহাতে তিনি খুব প্রসন্ন হইয়াছিলেন। পূজামণ্ডপে গিয়া স্থির ও তদ্গতভাবে দেবীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। দুই চক্ষে প্রেমাশ্রুর ধারা বহিয়া যাইতেছিল।

পূজার কয় দিন নহবতের বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর আলাপ শুনিয়াও খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সকালে দেবীর মহাস্নানের সময় বিখ্যাত মৃদঙ্গ-বাদক ভগবান সেন পাখোয়াজ বাজাইতেন—মহাপুরুষজী

উপর হইতে শুনিয়া বাম হাত দোলাইয়া দোলাইয়া সঙ্গে সঙ্গে তাল দিতেন আর আনন্দ করিতেন। মায়ের পূজার ভোগাদির বিবরণ ভাঁড়ারী তাঁহাকে শুনাইয়া যাইতেন। মায়ের পূজা নির্বিঘ্নে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। সমাগত শত শত ভক্ত অন্যান্য বারের ন্যায় যথারীতি প্রত্যহ এবং ৺বিজয়ার দিন তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসবের চারি দিন পরে মহাপুরুষজীর জন্মদিন। সে সম্বন্ধে ঐ দিনকার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইলে তিনি কোন প্রকার উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু যখন বলা হইল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি হইবে আর গরীবদের ভাল করিয়া খাওয়ান এবং কম্বল দেওয়া হইবে, তখন উৎসাহের সহিত সম্মতি দিলেন। উৎসব সুসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। সেদিন বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। তাঁহাকে দর্শন, প্রণাম এবং তাঁহার স্নিগ্ধ আশীর্বাদলাভ করিয়া সকলেই পরিপূর্ণ প্রাণে ফিরিয়া গেলেন।

ঐ অসুস্থ অবস্থাতেও মহাপুরুষজী একাধিক ভক্তকে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন। আর তাঁহার মৌন আশীর্বাদ বহু ধর্মপিপাসুর প্রাণে আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পাদন করিয়া তাহাদের জীবন মধুময় করিয়া দিয়াছিল।

মহাপুরুষজীর অবস্থিতিমাত্রই সকলের প্রাণ ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিল। সবই বেশ চলিয়া যাইতেছিল—হঠাৎ ১৯৩৪ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে তাঁহার খুব সর্দি, জ্বর ও কাশি হইল। সঙ্গে সঙ্গে হাঁপানি এবং শ্বাসকষ্টের উপসর্গও ছিল। চিকিৎসাদি সত্ত্বেও অসুখ ধীরে ধীরে বাড়িয়াই চলিল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন তিনি কতকটা সুস্থ হইলেন —জ্বর ৯৮° ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। পরবর্তী রবিবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী

সাধারণ উৎসব—উহার পূর্বদিন সকাল হইতে মহাপুরুষজীর জ্বর আবার বৃদ্ধি পাইয়া ১০৫° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিল এবং অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িল। চিকিৎসকগণ বলিলেন—রাত্রি পার হওয়া কঠিন। সকলেই প্রমাদ গণিলেন। এদিকে বিরাট উৎসবের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ—লক্ষাধিক লোকের বিপুল জনতা পরের দিন ঐ উৎসবে যোগদান করিবে। দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে সেই রাত্রি কাটিয়া গেল। কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় উৎসবের দিন মহাপুরুষজীর অবস্থা কতকটা ভাল মনে হওয়াতে সকলের প্রাণে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। বৈকাল পর্যন্ত উৎসব নিরাপদে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। কেবলমাত্র বেলা ৪ টার পরে একটি অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল। শুধু বেলুড় গ্রামটির উপর এবং মঠের সামনে গঙ্গার খানিক দূর পর্যন্ত অকস্মাৎ প্রায় আধঘন্টাব্যাপী প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল। এই ঘটনাটিকে মহাপুরুষজীর আসন্ন তিরোধানের পূর্বাভাস মনে করিয়া মঠ-বাসীদের অনেকেরই চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। উৎসবের পর দিন সকালে তাঁহার অবস্থা সামান্য একটু ভাল দেখা গেল, কিন্তু বৈকাল হইতেই জ্বর পুনরায় বাড়িয়া ১০৫° ডিগ্রি উঠিল। ডাঃ অজিতনাথ রায় চৌধুরী এবং ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি চিকিৎসকগণ এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও এইবার যেন হতাশ হইয়া পড়িলেন। ডাঃ নীলরতন সরকার অসুস্থতা-নিবন্ধন আসিতে পারেন নাই। তিনি মহাপুরুষজীর শারীরিক অবস্থার খবর শুনিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিয়াছিলেন,—"যে ক'রে পারেন তাঁকে এবার আট্‌কে রাখুন।"

২০শে মঙ্গলবার প্রাতে জ্বর ১০০° ডিগ্রিতে নামিয়াছিল ; কিন্তু বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা ক্রমেই অধিকতর খারাপের দিকে চলিল। ঠাকুরের মধ্যাহ্ন ভোগরাগাদি সকাল সকাল শেষ করিয়া লওয়া হইল।

দ্বিপ্রহরের পর হইতে ক্রমেই তাঁহার শ্বাসকষ্ট বাড়িতে লাগিল; তিনি কিন্তু প্রশান্ত ও স্থিরভাবে শুইয়া আছেন—শারীরিক কোন কষ্টই যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না! মঠবাড়ীর উঠান, উপরের বারান্দা, ছাদ সব স্থান সাধু এবং ব্যাকুলপ্রাণ ভক্ত নরনারীতে পরিপূর্ণ। বেলা প্রায় আড়াইটার পর হইতে তাঁহার অঙ্গে মুহুর্মুহু পুলক সঞ্চার হইতে দেখা গেল। তাহার কিছু পরেই ডাক্তারগণ শেষ পরীক্ষা করিয়া "আশা নাই" বলিয়া চলিয়া গেলেন। তখন সমবেত সাধুগণ 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি করিয়া ঠাকুরের নাম শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। শতসাধুকণ্ঠে নামগান চলিতেছে—এদিকে মহাপুরুষজীর সমস্ত দেহ থাকিয়া থাকিয়া রোমাঞ্চিত হইতেছে আর মুখে চোখে দিব্য আনন্দের স্ফূর্তি! মহাযোগী স্থির শয়নে দেহাতীত পরমসত্তার সহিত একীভূত হইয়া জীবন-দীপশিখা-নির্বাণের অপেক্ষা করিতেছেন।

প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপে কাটিয়া যাইবার পর ভজনগান আরম্ভ হইল। মহাপুরুষজী নিজে গাহিয়া যে ব্রহ্মচারীকে 'কালী নামের গণ্ডি দিয়ে' গানটি শিখাইয়াছিলেন সে তাঁহার ঐ অতিপ্রিয় ভজনটি অশ্রুপূর্ণ নয়নে গাহিল—

কালীনামের গণ্ডি দিয়ে আছিরে দাঁড়ায়ে।
শোনরে শমন তোরে কই, আমিত আটাশে নই;
তোর কথা কেন রব সয়ে?
এ যে ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, খাবে ভোগা দিয়ে॥
কটু বলবি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে;
সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্যামা, বড় ক্ষ্যাপা মেয়ে॥
রামপ্রসাদ কয়, ওরে শমন, (আমি) শ্যামানাম গেয়ে
ফাঁকি দিয়ে চলে যাব, (তোর) চোখে ধূলো দিয়ে॥

এই গানটি গীত হইবার সময় সকলেরই মনপ্রাণ এককালে যেন উহার ভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া গেল। যেন প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছিল, মায়ের শিশু মহাপুরুষজী মায়ের নিরাপদ কোলে বসিয়া কৌতুকভরে মৃত্যুকে শাসন করিতেছেন। অন্যান্য যে-সকল ভজন তিনি ভালবাসিতেন তাহাও একে একে গীত হইল।

শেষ মুহূর্ত যতই নিকটবর্তী হইতেছিল, তাঁহার অঙ্গে পুলক আরও ঘন ঘন হইতে লাগিল। মুখ স্মিত প্রশান্ত! অপরাহ্ণ ৫টা ৩৬ মিনিটের সময় হঠাৎ মহাপুরুষজীর বদনমণ্ডল এক অপূর্ব আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুল এবং সর্ব শরীরের লোম কদম্বফুলের মতন খাড়া হইয়া উঠিল এবং একটু পরেই মুখ দিয়া অন্তিম নিঃশ্বাস নির্গত হইল। সেই পুলকিত অবস্থা অনেকক্ষণ ছিল।

মহাপুরুষ মহারাজের মহাসমাধিলাভের সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যেই টেলিফোনযোগে সমস্ত কলিকাতায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দলে দলে ভক্তগণ মঠে সমবেত হইতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় সাধুগণ-কর্তৃক বাহিত তাঁহার দেবদেহ গঙ্গার ঘাটে স্নান করান হইল। তখনও তাঁহার বক্ষদেশ বেশ গরম। পরে নব বস্ত্র এবং পুষ্পমাল্য-চন্দন ও বিভূতি-ভূষিত করিয়া ঐ পবিত্র শরীর মঠের বাঁধানো প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে ঠাকুরঘরে উঠিবার সিঁড়ির পার্শ্বে রক্ষিত হয়। যথারীতি পূজা ও আরাত্রিকের পর একে একে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং স্ত্রী-পুরুষ ভক্তগণ তাঁহার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসিগণ পূজা শেষ করিতেছেন এমন সময় কলিকাতা হইতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পুষ্পাদি লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মহাপুরুষজীকে মালা পরাইয়া পার্শ্বে ফুলের তোড়া সাজাইয়া দিলেন এবং হস্তে পুষ্প লইয়া

ভাগবতের 'বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্' শ্লোকাংশ তিন বার উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলেন।

সকলের প্রণাম এবং পূজা শেষ হইলে মহাসমাধিলীন সেই ভাগবত দেহ গঙ্গাতীরে স্বামিজীর মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে[1] চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা রচিত হোমকুণ্ডে স্থাপিত হইল। ত্যাগী সন্তানগণ অগ্নি-হস্তে প্রদক্ষিণান্তে অশ্রুপূর্ণনয়নে হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন; তখন রাত্রি প্রায় ১২টা অতীত হইয়াছে। সপ্তজ্যোতিঃশিখা বিস্তার করিয়া ভগবান বৈশ্বানর সুপবিত্র আহুতিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বেদ উপনিষদ্ এবং গীতাদি শাস্ত্র হইতে সন্ন্যাসিগণ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভজন-কীর্তনাদিও চলিতে লাগিল, অনেক ভক্ত চন্দন ঘৃত যব গুগ্গুল তিল প্রভৃতি সেই ভাস্বর অগ্নিতে অর্পণ করিলেন। কার্য শেষ হইতে রাত্রি প্রায় সাড়ে চারিটা বাজিয়া গেল। আশী বৎসর পূর্বে দেবোদ্দেশ্যসাধনে যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল তাহার পরি-সমাপ্তি হইল। এইরূপে যজ্ঞসমাপ্তির পর তাঁহার অস্থি মঠে সংরক্ষিত হয়।

মহাপুরুষ মহারাজের তিরোধানের পর বেলুড় মঠের সর্বত্র একটি গভীর শূন্যতা যেন সকলকে এককালে আচ্ছন্ন করিল। তের দিন সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিগণ তীব্রভাবে জপ ধ্যান প্রার্থনা শাস্ত্র-আবৃত্তি ভজন প্রভৃতি দ্বারা আচার্যশ্রেষ্ঠের স্মৃতিপূজা করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ

১ ঐ স্থানেই পূর্বে ঠাকুরের অপর পাঁচ জন অন্তরঙ্গ পার্ষদের (স্বামী অদ্বৈতানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ ও সুবোধানন্দ) দেহসংকার করা হইয়াছিল। পরে ১৯৩৭ সালে স্বামী অখণ্ডানন্দের শরীরও তথায় দাহ করা হয়।

দিবসে সন্ন্যাসিসংঘের প্রার্থনানুযায়ী একটি বৃহৎ ভাণ্ডারার আয়োজন হইল। সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী ঐ দিন মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। দরিদ্র-নারায়ণগণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন এবং বস্ত্রদান ঐ অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ ছিল।

মহাপুরুষজীর ব্যবহৃত খাট শয্যা এবং অন্যান্য জিনিষ তিনি যে ঘরে থাকিতেন সেখানেই প্রায় সাড়ে চারি বৎসর পূর্ববৎ রক্ষিত ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বর্তমান মন্দির হইবার পর এই সকল দ্রব্য পুরাতন ঠাকুরঘরের সংলগ্ন ঠাকুরের পূর্বেকার শয়নঘরে স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার অতি আদরের মাতা হংসেশ্বরী, চামুণ্ডী প্রভৃতি দেবীর ফটোগুলি দেওয়ালে টাঙ্গানো আছে। ছোট শিবমূর্তিটিও একটি কুলুঙ্গিতে রহিয়াছে। খাটের উপর মহাপুরুষজীর আসন-করিয়া-বসা সহাস্য-বদন একটি বৃহৎ ত্রিবর্ণ ফটো। চেয়ারে ১৯১২ সালে কাশীতে তোলা সেই গভীর ধ্যানমূর্তির ফটোটি রক্ষিত আছে। ঐ ঘরটিতে গেলে মনে হয়, আজিও যেন তিনি তাঁহার অভয় আশীর্বাদ ও দিব্য করুণা লইয়া জীবন্ত বসিয়া আছেন তাঁহার 'বৈকুণ্ঠ', 'কৈলাস'—বেলুড়ের মহাতীর্থে তাঁহার ঠাকুর, তাঁহার মায়ের জাগ্রত অস্তিত্ব আগামী শত শত বৎসর ধরিয়া ঘোষণা করিবার জন্য।

ওঁ তৎ সৎ

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA